মেঘে ঢাকা তারা

শক্তিপদ রাজগুরু

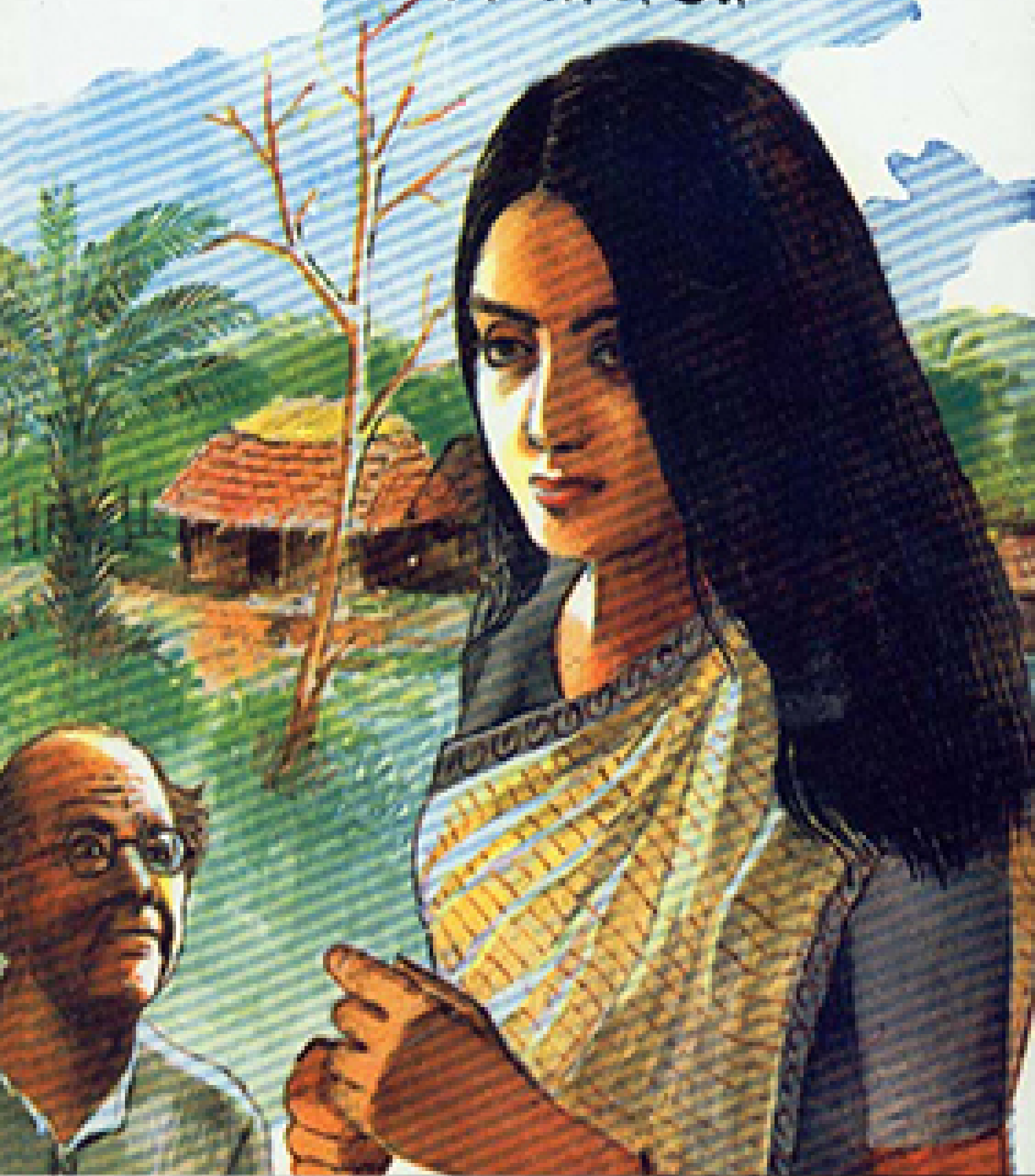

মেঘে ঢাকা তারা

শক্তিপদ রাজগুরু

অমৃতধারা
৮, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ২০শে আষাঢ়, ১৩৬৯। জুলাই, ১৯৬২

প্রকাশক : নিতাই দাস। অমৃতধারা। ৮, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯

মুদ্রাকর : তারক পাল।
দি সরস্বতী প্রেস। ১৪, চণ্ডীবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

মাধববাবু তক্তপোশে বসে বেশ ছোটখাট লেকচার দিয়ে চলেছেন; তক্তপোশে মেজেতে এদিক ওদিক বসে কয়েকজন ছেলে। স্কুল ফাইনাল দিতে চলেছে তারা।

—তাহলে বুঝতে পারলে, এই পরীক্ষাই জীবনের প্রথম বৃহত্তর জগতে প্রবেশের পথ। কি রে পরশা?

পরেশ মাথা চুলকোচ্ছে।

—আজ্ঞে ইংরাজীটারেই ভয়!

মাধববাবু আশ্বাস দেন—ভয় কি রে! টেস্টে তো ভাল নম্বর ছিল। আমার হাতে ফার্স্ট পেপারে পঞ্চাশ পেয়েছিস! কইরে তামাকটা!

একজন ছেলে ফুঁ দিয়ে কলকেটা তুলে দেয় হুঁকোতে বসিয়ে। দুবার টান দিয়ে একটু ধাতস্থ হন মাধববাবু।

—হ্যাঁ, বলছিলাম দেশের কথা। নৌকায় করে মাদারীপুর সদরে যেতাম, পথে আঠারোবাঁকির ধারে গঞ্জের হাট থেকে উঠতো তরমুজ, ফুটি।

ও হ্যাঁ! ......

হঠাৎ কি মনে পড়তেই উঠে পড়েন।

—একটু বসো তোমরা, আসছি' ওগো—

ছিটে বেড়ার ঘরের ফংবঙে দরজাটা দিয়ে হাঁকতে হাঁকতে ভিতরে ঢুকেই রান্নাঘরের দাওয়ায় স্ত্রীকে দেখে চমক ভাঙে মাধব মাস্টারের।

—কই, হল তোমাদের?

কাদম্বিনী যেন আকাশ থেকে পড়ে—কি হবে?

মাধববাবু আমতা আমতা করেন।

—মানে ওরা চলে যাচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে, এতকাল প্রতি বৎসরই যাবার আগে ওদের তো কিছু জলযোগ করাতে-বলি, তাই এবারও—

কাদম্বিনী অবাক হয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে।

এতকাল আর আজকাল!

এই দুটোর মধ্যে যে একটা আকাশ জমিন পার্থক্য গড়ে উঠেছে, এত চেষ্টা করেও ওই খেয়ালী আপন ভোলা লোকটিকে তারা তা বোঝাতে পারে নি।

সেদিন ছিল নিজের দেশ, নিজের কিছু জমিজারাত, একটু আশ্রয় ছিল। সাতপুরুষের গ্রামে একটু মানসম্মান পরিচিতিও না থাকা ছিল না। আজ সব কোন দিকে হারিয়ে বানেভাস। খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে এই অচেনা অজানা ঠাইএ, সামান্য ওই স্কুলমাস্টারির চাকরিতে ভরসা করে, তা ওই আপনভোলা লোকটিকে বোঝাতে পারে না কাদম্বিনী। একার রোজগার আর ওই এতগুলি পোষ্য। অভাব আর অনটনের নগ্নছায়া এ সংসারের সর্বত্র।

মাধববাবু স্ত্রীর দিকে চেয়ে শিউরে ওঠেন।

—মানে তাড়াহুড়োয় তোমাকে বলতে বোধ হয় ভুলে গেছি!

কাদম্বিনীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। অসময়ে এত ঝামেলা! শুধু মেহন্নতই নয় বেশ কিছু খরচাও। বেশ চড়াস্বরেই জবাব দেয় কাদম্বিনী।

—কেতাত্ব করেছো! এখন পাই কোথা?

—এতদিনের রীতি উলটে যাবে? মানে যা হয় কিছু মিষ্টিমুখ—

নীতা বাবার অবস্থা দেখে এগিয়ে আসে, মাকে সামলাবার চেষ্টা করে।

—আঃ, কি করছো মা! বছরের একটা দিন বই তো নয়?

মাধববাবু সাহস পান—দেখ দিকি মা!

নীতাই দায়িত্ব নেয়—তুমি বাইরের ঘরে গল্প করো বাবা। আমি দেখছি।

মাধববাবু নীতাকে দেখে ভরসা পান।

—বেশ, বেশ! সত্যি আমারই ভুল হয়ে গেছে। মনেই ছিল না যে তোদের ও কথাটা জানানো দরকার। তা বসুক ওরা একটু, ইংরাজীটাই আলোচনা করি। কাজ হবে ওদের, তুই এদিকে যোগাড় কর।

মাধববাবু চলে যেতেই কাদম্বিনী মেয়ের দিকে মুখ তুলে চাইল, বজ্রের দীপ্তি ভরা সেই চাহনি, যে কোন মুহূর্তেই বর্ষণ শুরু হবে। নীতা মাকে চেনে, চুপ করে কি ভাবছে। প্রশ্ন করে কাদম্বিনী।

—কি করা হবে যোগাড়ের? খুব তো বলা হল!

—তুমি উনুনে আঁচ দিয়ে দাও।

নীতা এগিয়ে গেল দরজার কাছে—এই পরেশ?

পরেশ পাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসে, নীতা তার হাতে কয়েকটা টাকা তুলে দিয়ে বলে—দুসের ময়দা, পোয়াদেড় ঘি, আর চিনি একসের নিয়ে আয়।

পরেশ কিছু বলবার চেষ্টা করে, নীতা ধমক দিয়ে ওঠে।

—যাও। বের হয়ে গেল সে।

কাদম্বিনী গজগজ করে উনুনে আগুন দিতে থাকে।

—এক দিনের সংসার খরচা। গেল তো!

—যাক মা। আমার টাকা থেকে দিলাম।

—তাও তো সংসারেই থাকতো। এসব নবাবী আমার ভাল লাগে না নীতা। গজগজ করে আপন মনে কাদম্বিনী।

—ছাত্রদের নেমতন্ন! যত্তোসব—

ও ঘর থেকে হাসির শব্দ শোনা যায়। নীতাও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, মাধববাবু গল্প ফেঁদেছেন। বেশ উৎসাহভরে

—সনৎ ছিল সেবার ফার্স্ট বয়, ফ্রী তো পাবেই, স্কলারশিপও নেবে। পাশের গাঁ মদনপুর স্কুল থেকে ওকে বললো ফ্রীশিপ দোব, বোর্ডিংও ফ্রী দোব। ওকে লুফে নেবার জন্য কত ঝুলোঝুলি। সনৎ গেল না শুধু আমার ইংরাজী পড়ানো দেখে।

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেন।

—পীরগঞ্জ স্কুলকে জেলাস্কুলও ভয় করতো, বুঝলি। সেবার ইনস্পেক্টার এসে কি বেকুব।

খুব কড়াকড়ি পরীক্ষা করেছেন ক্লাসে গিয়ে। তারপর নিজেই ঠাণ্ডা। স্রেফ ইনভার্টেড কমা'র হরফে ওই সনৎ ঠাণ্ডা করেছিল তাকে। ও ছিল জুয়েল।

নীতার ময়দা মাখা যেন বন্ধ হয়ে যায়। বিকালের ম্লান আলো পড়েছে ঝিঙেলতার ফুলে, কোথায় পাখি ডাকছে। শনশন হাওয়া হাঁকে নারকেলগাছের মাথায়, মনটা কেমন কোন সুদূরে উধাও হয়ে যায় দূর আকাশে মেঘের ভেলায়। হঠাৎ বাবার ডাকে চমক ভাঙে।

—হল রে?

—হচ্ছে বাবা।

ময়দার লেচিগুলো বেলতে থাকে নীতা। লুচি ভাজছে কাদম্বিনী। মুখের মেঘ তখনও কাটেনি। বলে ওঠে—

—কিছু সরিয়ে রাখ নীতা, গীতা মন্টু আছে। যা ধরে দিবি ওই ধুন্দুর দলের সামনে, সব যাবে। রাতে আজ রান্না হবে না। বুঝলি?

তবু যাহোক একটু সাশ্রয় করতে চায় মা! নীতা মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। উনুনের একঝলক আভা পড়েছে মায়ের শীর্ণ গালে। এককালে সুন্দরী ছিল। আজ সংসারের কঠিন চাপে, অভাব আর হতাশার তাড়নায় মায়ের দেহমন সব বদলে গেছে। একটা কাঠিন্য ফুটে উঠেছে, জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত একটি নারীর ছবি—জীবন্ত ছবি।

বাইরের ঘরে হাসির শব্দ উঠেছে। মাধব মাস্টার হাসছেন, অট্টহাসি। জীবনকে তুচ্ছ করে তোলার প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে ওই হাসির ছন্দে—শব্দে।

ঘরছাড়া দেশছাড়া হয়ে পরমাটিতে উঠে এসেছে তারা। চারিদিকে শুধু অভাব আর অনটন, তারই সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে উঠেছে কাদম্বিনী।

হাড়মাস ভাজা-ভাজা হয়ে গেছে। ওই হাসির শব্দ শুনে গা জ্বলে ওঠে। নীতার দিকে চেয়ে থাকে, নীতার চোখেও ওই হাসির সংক্রমণ।

—বাবা যেন কি!

—ওর নিয়ে ও আছে। নইলে হাসি আসে? মরন! মেয়ের দিকে চাইল কাদম্বিনী।

হঠাৎ মায়ের কঠিন দৃষ্টির সামনে কি যেন দুর্বলতা ধরা পড়ে যেতেই অপ্রস্তুত হয় নীতা, মাথা নীচু করে ময়দা বেলতে থাকে।

ওরা খাওয়ার পর চলে গেছে।

মা মেয়ের এই মতদ্বৈততার মাঝে চটির শব্দ তুলে ঢোকেন মাধববাবু। ছোট ছেলে মণ্টু একটা পিঁড়ির ওপর বসে লুচি খাচ্ছে। ছোট ছেলের দিকে চেয়ে মাধববাবু বলে ওঠেন,—

—তোর আর ওদিন আসবে না মণ্টু। এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উঠতেই যা মাড়ন পাড়ন চলেছে, ফাইনালে যাবার ধকল তাতে সইবে না।

মণ্টু যখন তখন কথা বলা নিরাপদ মনে করে না। চুপ করে খেয়ে যায়। মাধববাবু স্ত্রীর দিকে না চেয়েই বলে ওঠেন নীতাকে।

—ওরা খুব খুশি, বুঝলি নীতা। এ ব্যাচে দু'চারটে ভাল ছেলে আছে। তবে তেমন কিছু নয়।

কাদম্বিনী ঝাঁঝিয়ে ওঠে—ওরা বি. এ, এম. এ পাশ করলে চারটে হাত গজাবে?

—করুক না, তোমার মেয়েও বি. এ. পাশ করবে বড়বৌ। কি বল নীতা? ওর যা বুদ্ধিশুদ্ধি। এত ছেলে-মেয়ে দেখলাম ওর মত কচিৎ নজরে পড়েছে। অনার্স নিয়ে পাশ করে যাবে ও।

মাধববাবু হুঁকো টানতে থাকেন; যুৎকরে পিঁড়ি টেনে বসে।

কাদম্বিনী স্বামীর দিকে চেয়ে আছে; সদ্য অপব্যয়ের দুঃখ তখনও সামলাতে পারেনি। তার উপর আবার সেই পুরোনো ঘায়ে আঘাত করেছেন মাধববাবু। পীরগঞ্জের প্রাচুর্যের দিনগুলো তখনও মনে রয়েছে স্মৃতির মত।

ওই আপনভোলা লোকটিকে নিয়ে পদে পদে কি নাকাল না হতে হয়েছে তাকে। স্বামীকে দেখেছে দিনরাত ডুবে রয়েছে মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে, না হয় স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে গল্প গুজবে। যে সময় অন্য মাস্টাররা টুইশানি করেছে একটার পর আর একটা, সেই সময় তিনি নিজে পড়ে পড়ে সময় নষ্ট করেছেন। না হয় গরিব ছেলেদেরকে বিনা মাইনেতে পড়িয়েছেন। পীরগঞ্জে তাই করেছেন আজও তেমনিই চলেছে। এর আর হের ফের হয় নি।

কাদম্বিনী বাধা দিয়েছে—কি হবে ঘরের খেয়ে বনে মোষ তাড়িয়ে। টাকাকড়ি দেয় কিছু ওরা? বিনি মাইনেতে কেন পড়াবে?

—দেবে কোত্থেকে? কিন্তু সারা জীবনে ওরা মাধব মাস্টারকে ভুলবে না বড়বৌ!

—ছাই! তাতে কার কি এল গেল?

নিজের কথা কোন দিনই ভাবেন নি। অন্য জগতের চিন্তায় মশগুল। সংসারের দিকে ফিরেও চাননি। দেশের ছেলেকে মানুষ করতেই দিন গেছে। নিজের ছেলেদের পর্যন্ত মানুষ করতে পারেন নি। বড় ছেলে শঙ্কর বার কয়েক ম্যাট্রিক দিয়ে ফেল করার পর হাল ছেড়ে দিয়েছে। মণ্টু পড়ছে, তবে সেদিকে বিশেষ মন নেই তার। তাকেও খরচার খাতাতেই লিখে রেখেছেন তিনি।

বলেন—গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না বড়বৌ।

পড়েছেন এইবার নীতাকে নিয়ে। মেয়েকে পাশ করাবেন। নিজেই আবার রীতিমত পড়ছেন মেয়েকে পড়াবার জন্য। বই আর পড়াশোনা আর ছাত্রদের গল্প, এই নিয়েই জীবন কেটেছে, দিন কাটছে এখনও।

কিন্তু সংসারের সেই দৈন্য কোন দিনই ঘোচে নি। উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। একটা কালো ছায়া ঘিরে আসছে এই ছোট্ট বাড়িটাকে।

সেদিনও সংসারের টাকা থেকে কয়েক টাকা সরিয়ে পুরোনো বই একরাশ কিনে এনেছেন ফুটপাথ থেকে। ছেলেমেয়েদের ভাতের উপর তরকারি দিতে পারেনি, পরনের পোশাকও জোটেনি। এই তো এত দিনের বিদ্যাসাধনার মূরোদ।

আজ আবার মেয়েকে নিজের পথে নিয়ে যাবার জন্য স্বপ্ন দেখেন মাধববাবু। কাদম্বিনী সহ্য করতে পারে না। এত দিনের সঞ্চিত জ্বালা ফেটে পড়ে দুর্বার প্রতিরোধে নীতাকে পড়াবার কথায়। কাদম্বিনী বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, তা আবার নয়। এত লেখাপড়া শিখে নিজে তো দুহাত বের করে খাচ্ছো, ভাতের ওপর তরকারি জোটে না, দুটো পয়সার মুখ দেখলাম না জীবনে। মেয়েকেও আবার সেইপথে নিয়ে যাবার শখ।

মাধববাবু নীতার দিকে আশ্বাস ভরে চাইলেন, মেয়েকে ভরসা স্থল বলে মনে হয়। কিন্তু নীতা নেই, কি আনতে রান্নাঘরের ওদিকে গেছে।

মাধববাবু স্ত্রীর সামনে অসহায়। বাইরের সেই আনন্দমুখর লোকটি স্ত্রীর দিকে চাইলেন—তবে?

সমস্যা সমাধানের পথ তাঁর সামনে নেই।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—ও মেয়েকে বিয়ে-থা দেবার চেষ্টা করো। পড়িয়ে কাজ নেই; ঢের হয়েছে।

—বিয়ে? সে যে অনেক টাকার ব্যাপার।

মন্টু বাবার সামনে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। কোন রকমে গো-গ্রাসে গিলে উঠে পড়ে। নীতাও এরকম প্রসঙ্গ উঠবে মনে করেই সরে গেছে। মাকে চেনে সে। ওর কণ্ঠে শুধু অভাবের জ্বালাই ফুটে ওঠে।

মাধববাবু বলেন—তা ছাড়া ওই কালো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বলো? তাও বিনা পণে?

ঢুকতে গিয়ে নীতা দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। তার রূপ নেই, সারা দেহ ঘিরে যৌবনের ব্যর্থ গুঞ্জন, সেই কথাটাই পুরুষের কাছ থেকে শুনে চমকে ওঠে নীতা। সব আলো যেন নিভে আসে। সরে গেল ওদিকে।

মাধববাবু ভাবছেন।

লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে খরচ যা আছে তা কিস্তিবন্দী, নীতা নিজেই তা রোজগার করে নেয় টুইশানি থেকে। মাধববাবু বলে কয়ে স্কুলে গার্লস সেকশনে একটা চাকরির ব্যবস্থাও করেছেন তাতে সংসারের সুরাহা হবে, নীতাও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

কিন্তু বিয়ে? তার মত বিত্তহীন দরিদ্রের ওই কুশ্রী মেয়ের জন্য কোন রাজপুত্র বসে নেই! কাদম্বিনী বলে ওঠে।

—কেন নেতাজী কলোনির যতীন মুখুজ্জের ছেলে?

—যতীন মুখুজ্জে? চমকে ওঠেন মাধববাবু।

মদনপুরের সেই মোক্তার, একটা ইতর চশমখোর লোক। তার ছেলে নাকি শিয়ালদহে কাটাপোশাকের দোকান দিয়ে দুপয়সা আয় করে।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—হ্যাগো, যতীনের ছেলে গোপাল।

এবার অবাক হবার পালা মাধববাবুর। হাতের হুকোটা মুখ থেকে সরিয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকেন। দেখছেন আর নিরীক্ষণ করছেন ওকে। গোপালের সব ইতিহাস ওর নখদর্পণে। বলে ওঠেন—সে তো তিনবার ক্লাস এইটে ফেল করে পড়াশোনা ছেড়েছে, কাঠগোঁয়ার বাঁদর ছেলে। অবষ্টিনেট বয়।

কাদম্বিনী গর্জে ওঠে—তবে কি এম. এ. পাশ গেজেটেড অফিসার পাবে?

মাধববাবু সায় দিতে পারেন না, গোপালের মতো অপাত্রে নীতাকে তুলে দিতে পারবেন না! তার বিদ্যাবুদ্ধি, রুচি শিক্ষা কোনটাকেই মেনে নিতে পারবে না গোপাল। সারা জীবন তিলে তিলে জ্বলে মরার চেয়েও বিয়ে না হওয়াই ভালো। মাধববাবু শেষ জবাব দেন। কণ্ঠস্বর অজ্ঞাতেই কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর।

—হাত পা বেঁধে জেনে শুনে ওকে জলে ফেলতে পারবো না বড়বৌ। না—না!

খ্যাঁক করে ওঠে বড়বৌ—তবে রাজপুত্র খোঁজগে?

—উঁহুঁ, ও পড়বে।

একটা জায়গায় মাধববাবু স্ত্রীর মতবাদকে অগ্রাহ্য করতে পারেন কঠিন ভাবে।

কিছুদিন আগেও ফাঁকা মাঠ জলা পড়ে ছিল এখানে। বাঁশবন জলকচুর ঝোপের নীচে দিয়ে খালটা বয়ে গেছে। জনহীন সেই উপকণ্ঠের মাঠে আজ শত শত গৃহহারা পরিবার বাসা

বেঁধেছে পাকিস্তান থেকে সব হারিয়ে এসে। লাইনের ধারে আমবাগানের গাছের পাতায় আবছা আলো, শিরশিরিয়ে ওঠে নারকেলপাতায় চাঁদের আলোমাখা বাতাস। দূরে দূরে দু-একটা আলো জ্বলছে। ভেসে আসে কীর্তনের সমবেত তান। কলোনির মাঝে কীর্তন-খোলা গড়ে তুলেছে তারা।

জানলার ধারে বসে আছে নীতা, বাবার কথাগুলো তখনও কানে ভাসে—কালো মেয়ে, কুৎসিত সে। তার জন্য কোন রাজপুত্র কোনদিনই আসবে না।

রাজপুত্র!

মনে পড়ে একখানি মুখ। সনৎকে আজও ভোলে নি! নিবিড় আঁধারের মধ্যে একটু ম্লান শিখা বলে মনে হয়। দূর আকাশের তারার মত ঝিকিমিকি তোলে আশার আনন্দে! সব দুঃখ গ্লানি হালকা হয়ে যায়।

ঝড়ো বাতাস বইছে; হু হু বাতাস। গাছগাছালির মাথা কাঁপানো বাতাস। ...মনের সব দুর্বলতা তার ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়।

একটা ট্রেন সার্চলাইট জ্বেলে হু হু শব্দে বের হয়ে গেল আঁধার ফাটিয়ে, তীক্ষ্ণস্বরে বাঁশিটা বাজছে প্রাণের সাড়ায়। ওই বাঁশিটাও যেন নীতার মনে সুর এনেছে, অজানা আনন্দ এনেছে।

সন্ধ্যার পর বারান্দায় পড়তে বসেছে মণ্টু আর গীতা।

ফরসা সুন্দরী মেয়ে। ঠিক নীতার উল্টো। রূপে কথায় চাল চলনেও। দু'চোখে তার যৌবনের সদ্যজাগর বাণী, ছন্দ। চুলগুলো পিঠের উপর মেলা; নীতাকে বলে ওঠে—

—কই দিদি, ইংরাজীটা বলে দেনা ভাই, খটমট ঠেকছে।

—না পড়লে সবই খটমট ঠেকে। নীতা জবাব দেয়।

গীতা বলে—কি করি বল, মাথায় যে কিছু ঢোকে না।

মণ্টু পড়ছিল, পড়ার চেয়ে দুষ্টুমিটাই তার বেশি; মাঝে মাঝে থামে আবার চীৎকার করে পাড়ার সবাইকে পড়ার সংবাদটা জানান দেয়,

উমরাটিপুরে সুবেদারগৃহে
সেদিন বাজিছে বাঁশি। ....

গীতার কথাতে মুখ ভেংচে ওঠে। —তা ঢুকবে কেন? মাথায় কি পোরা আছে জানিস? কাউ ডাং—স্রেফ গোবর।

—অ্যাই—গীতা ফোঁস করে ওঠে।

মণ্টুও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—কাম অন, ফাইট।

—মণ্টু! নীতা ধমক দিয়ে ওঠে।

মণ্টু আবার পড়তে বসে; গীতাও মাথা দুলিয়ে পড়ে। These lines have been taken from Wordsworth's 'Solitary Reaper'. Here the poet......

কলরব! নীতা এই বিচিত্র জগতের মাঝে পথ হারিয়ে এসে পড়েছে অন্যমনে। মাঝে মাঝে কেমন যেন দূরে চলে যায় এদের হাসিসুরভরা জগৎ ছেড়ে। সেই দূর পথ ছেয়ে আছে নিবিড় অন্ধকার। সে জগতের উর্ধ্বাকাশে তারার স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে চেয়ে থাকে সনৎ! নীতার ওইটুকুই যেন ধ্রুবতারা। চিন্তার ক্ষীণ আলো সেখানে পথ খুঁজে পায় না।

—অ্যাই দিদি! গীতার ডাকে নীতা ফিরে এল আবার নিজের জগতে। কেমন যেন সনৎকে মনে পড়ে বার বার। আকাশের উঠোনে অসংখ্য তারা ফুল ফুটেছে।

একটা সুর উঠেছে। ওপাশের টিনের বেড়া দেওয়া ছোট ঘরে গলা সাধছে শঙ্কর। ক্ষীণ একটা সুরের রেশ রাতের বাতাসে মিশে রয়েছে, মিষ্টি একটা আমেজ আনে।

নীতাও পড়ায় মন দেয়।

গীতা এ বাড়ির চালচলনের সম্পূর্ণ বিরোধী, বাবার এই গলাবন্ধ কোট, তালতলার চটি আর দিদির সাদামাটা পোশাকগুলোকে সহ্য করতে পারে না সে। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে হয়ে যায় দু-এক পশলা প্রায়ই।

ক্লাসে সব মেয়েই যেন তার চেয়ে অনেক ভাল পোশাক পরে আসে। নিজে পড়াশোনাও পারে না, তার উপর পোশাক আশাকের দৈন্যটাও বড় করে ঠেকে। সাবানকাচা কাপড় আর একই ব্লাউজ গায়ে, দিনের পর দিন একই স্যান্ডেল পরে স্কুলে যেতে বিশ্রী ঠেকে। নিজের অপরিসীম দৈন্যে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সেদিন কথাটা মাকে জানিয়ে দেয় গীতা।

—যাবো না ক্লাশে, এই ছিরি করে বের হতে পারে মানুষ?

কাদম্বিনী তরকারি কুটতে কুটতে মেয়ের কথায় মুখ তুলে চাইল। রূপ' এতরূপ দেখে সেও বিস্মিত হয়, গীতাও জেনে ফেলেছে সেই কথাটা। কাদম্বিনী বলে ওঠে।

—ওই তো রঙীন শাড়িটা পরে যা।

—ছাই শাড়ি।

- নবাবনন্দিনীর ওতে মন ভরে না। এখন থেকেই সাজগোজের বাহার। বলগে না বাপকে, সেও তো দিতে পারে।

ওখানে বলে কিছু হবে না, মাও জানে— জানে গীতাও। তাই আপনমনেই গজগজ করে গীতা।

—ওই ক্যাটকেটে শাড়ি পরে যেতে পারবো না।

—যাস নে।

গীতা মুখ গোমরা করে মায়ের দিকে চাইল।

বাবার সুপারিশে বিনা মাইনেতে স্কুলে পড়ে, তার উপর ওই পোশাক, সর্বদাই যেন মাথা নীচু হয়ে থাকে তার। স্কুলে মানসীকে দেখেছে চমৎকার একটা গোয়ালিনী ছাপা কটকী শাড়ি পড়ে এসেছিল, হাতে নতুন ডিজাইনের গহনা। ক্লাসের মেয়েরা ভেঙে পড়ে তার দিকে। রাতারাতি দাম বেড়ে যায় মানসীর।

তাও মানসীর না আছে রূপ, না আছে স্বাস্থ্য। কাঠির মত সরু দেহ, নরম কোমল কিছুই নেই।

গীতা গুম হয়ে বসে থাকে। বইপত্তর ছিটানো, স্কুলে যেতে মন সরে না। একটা মালিন্য তার সারা মনে কালো জমাট দাগ কেটে রেখেছে।

মাধববাবু ছাতা হাতে বেরুচ্ছেন, কাদম্বিনীর ডাকে ফিরে চাইলেন।

—গীতার দুখানা শাড়ি নাহলে চলবে কি করে? আর পাঁচজন শাড়ি গয়না পরে স্কুলে আসে। তাদের দেখাদেখি—

স্ত্রীর কথা শেষ হল না, মাধববাবু বলে ওঠেন—স্কুলে পড়তে যায়, না শাড়ি গয়নার ডিজাইন দেখতে যায় তোমার মেয়ে?

—তাই বলে সাধ আহ্লাদ নেই? তোমার সংসারের এই অভাব কোন দিনই মিটবেনা, ওরা কি অপরাধ করেছে?

আচ্ছা কিনে দোব। দুখানা শাড়ি বই তো নয়? দিও। মাধববাবু ব্যাপারটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন।

স্ত্রী প্রশ্ন করে।—কোত্থেকে দেবো! কত টাকা দিয়েছো এ মাসে চাল-ডাল হাটবাজার করতে?

মাধববাবু ট্রেনের শব্দ শুনে চমকে ওঠেন। এই নটা বাইশের ট্রেন চলে গেল! হন্তদন্ত হয়ে যেন পালাতে পারলে বাঁচেন। এই সময় বাড়িতে না থাকাই নিরাপদ। নীতাও নেই যে মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবে। কাদম্বিনী তাই বকে চলবে বিনা বাধায়।

—ইস্ ফের দেরী হয়ে গেল স্কুলে।

মাধববাবু বের হয়ে পড়েন ছাতা বগলে বাড়ি থেকে।

কলকাতার রাস্তায় দশটার ভিড় শুরু হয়েছে। গিজগিজ করে মাথা; হন্তদন্ত হয়ে সবাই দৌড়চ্ছে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে। কেরানীকুল মহাতীর্থের পানে চলেছে দলবেঁধে! যেন বর্ষার নদী-নালা দুকূল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে বড় নদীর দিকে।

তারই ভিড়ে হারিয়ে গেছে নীতা। সকালে কলেজ সেরে এগিয়ে চলে কলেজ স্কোয়ারের পাশ দিয়ে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের পানে। অপেক্ষাকৃত জনহীন এই গলির এ মোড় ও মোড় ঘুরে চুন বালি খসা হলদে তেতলা বাড়িটায় ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

কেরানীকুলের মেস, ছাত্র-ফাত্র রাখে না তারা, বছরে চারমাস তাদের কামাই। মেসকমিটির লোকসান। তবু সনৎ এইখানে রয়েছে—তার কামাই নেই। ঘরবাড়ি চালচুলোহীন একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র। ওবা নেহাৎ দয়া করেই ঠাঁই দিয়েছে তাকে। দশটার বাবুরা সবে বের হচ্ছেন অপিসে। বয়স্করা কেউ কেউ গলির ফাঁক দিয়ে চিলতে আকাশ কোলে সূর্যের ইসারার পানে চেয়ে নমস্কার করেছে অপিস বের হবার আগে; অপেক্ষাকৃত ছোকরা কেরানীর দল ধোপদুরস্ত কাপড় পরে চুলে শেষ বারের মত চিরুনি বুলিয়ে বের হচ্ছে।

—সনৎবাবু আছেন?

এমন সময় হঠাৎ নীতাকে ঢুকতে দেখে ছোকরা ফিরে চাইল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখেও বিরক্তির রেখা, সূর্যপ্রণামে বাধা পড়ল কে জানে অপিসে কি হবে! যা হাজিরাব কড়াকড়ি, পড়ল বোধ হয় লাল দাগ।

অন্য ভদ্রলোক পাশ কাটিয়ে ছাতা বগলে ছুটলেন রেশনের থলি হাতে। মেসের ঠাকুরকে শোনায়—

আজ ওবেলায় বাড়ি যাবো ঠাকুর। সোমবার সকালে মিল নোবে।

নীতার দিকে চেয়ে দেখবার জবাব দেবার সময় কারোও নেই। অন্য জগতের লোক ওরা; ঘড়ির কাঁটাকে ধরবার জন্য ছোটে।

ছোটার বিরাম নেই। ছুটতে ছুটতে একদিন হুমড়ি খেয়ে পড়ে—ছোট্ট জগতের সীমা সীমিত হয়ে যায়। আর ওঠে না। জীবনযন্ত্রণার শেষ হয়ে যায়।

দুড়দাড় বাবুরা বের হয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুর জবাব দেয় নীতার কথায়।—সনৎবাবু? অছি পাড়া। সে নীচের ঘরকু যিও।

নীচেরতলায় এঁধো ঘর, একপাশে ইটের তাকমত করে তাতে মেসের কাদের চটের বিছানা গাদাকরা, ম্যানেজারের আমকাঠের হাতবাক্স। অন্যদিকের তাকে বই খাতাপত্র, সস্তা দামের আয়না। মেঝেতে সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা, পাশে একটা মাদুরে বসে সনৎ পড়ছে। হঠাৎ

নীতাকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে যায়। কাঁধে একটা ব্যাগ, হাতে কলেজের বইপত্র। জুতোটা খুলে ভেতরে ঢোকে।

—তুমি এ সময়?

হাসে নীতা—কেন আসতে নেই?

সনৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ দুপুর বেলায় আসে সে। বাবুরা মেসের নৈতিক চরিত্র বজায় রাখবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। পুরুষের মেসে মেয়েছেলের আনাগোনা নাকি পাড়ার লোকেরা সহ্য করবে না। সনৎ যে একরকম এদের দয়াতেই আছে, তার এই জুলুম বেশি করেই ঠেকবে ওদের।

নীতা বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বলে ওঠে—রাখো।

—এমনি করে কতো নেবো বলতে পারো নীতা?

সনতের কণ্ঠস্বরে একটা সঙ্কোচ। হাসে নীতা।

—কেন, হঠাৎ সুমতি হচ্ছে নাকি? কথাটার মোড় বদলাবার জন্যই বলে ওঠে নীতা।

—বাবা কালই ছেলেদের তোমার কথা বলছিলেন। স্কলারশিপ পেতে হবে তোদের সনতের মতো। তারপর এম-এ পাশ করে রিসার্চ করবি। কত দিন যাওনি ওদিকে! কি ভাবছো সনৎ?

জবাব দেয় সনৎ।—এম. এ পাশ করে মাস্টার মশায়কে এবার প্রণাম করে আসবো। নাই বা গেলাম কদিন, খবর তো পাই। আর যার জন্য যাওয়া সে তো আসে—mountain comes to Mohammad.

নীতা হাসে।—থাক, আর রসিকতা করতে হবে না। হ্যাঁ Jather Berry-র বই বলছিলে না?

—এদিকে যে আসছে মাসেই পরীক্ষা! নীতা প্রশ্ন করে।

—কি করা যাবে! সনৎ জবাব দেয়।

নির্জন মেস। কলরব কোলাহল, বাবুদের স্নান করার হুল্লোড়, খাওয়ার হাঁকডাক, খড়মের পটাপট শব্দ থেমে গেছে। . চা আর বিস্কুট আনে চাকরটা।

নীতা হাসে—বাজে খরচ করছো কিন্তু!

—অনেক সময় বাজে খরচ করেও আনন্দ পাই নীতা।

নীতা কথা বললো না, একবার চোখ তুলে চাইতে কেমন যেন দুর্বার লজ্জা এসে বাধা দেয়! ঘামছে অকারণেই। সনৎ ওর এই ক্ষণিকের সচেতন মধুর একটি অনুনয়ভরা মুখের দিকে চেয়ে আছে। নীতা অনুভব করে ওর দৃষ্টির স্পর্শ।

বাবার কথাটা মনে পড়ে : রূপ নেই, কালো মেয়েকে কে নেবে বল?

হাসছে সনৎ—কি হল হঠাৎ?

—কিছু নয়! নীতা নিজেকে সামলে নিয়েছে। মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কর্তব্যপরায়ণ কর্মঠ মেয়েটি।

—এম. এ. পাশ করে কি করবে?

—আগে পাশই করি!

নীতা ধমকে ওঠে—মানে? ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে। তারপর রিসার্চ করবে। বুঝলে?

—হুকুম? সনতের কণ্ঠস্বর হালকা হয়ে আসে।

—হ্যাঁ মশাই!

উঠে পড়ে নীতা। ওদিকে স্কুলে চাকরির সময় হয়ে গেছে। নিজের পড়াশোনা, তারপর কাজকর্ম—তবু আনন্দ পায় নীতা আর পাঁচজনের মুখে হাসি ফুটুক। মনের কোনে একটা সুর জাগে; গুনগুনানি সুর।

সনৎ তাকে এগিয়ে দিতে আসে রাস্তা পর্যন্ত।

সুরের হালকা রেশটা তখনও মনে রয়েছে। সব কিছু যেন সুন্দর। ওই রোদমাখা গাছগাছালি লাইনের উপর বসে ল্যাজঝোলা পাখিটাকে কেমন ভালো লাগে। খালের বুকে ছোটনৌকার মাঝি ওকে কোন জগতে হারিয়ে যাবার ডাক আনে।

সবকিছু নিয়ে তার জগৎ—সুন্দর-সুরময়-বর্ণময়।

নীতা বাড়িতে পা দিয়েই একটু বিস্মিত হয়। গীতা গুম হয়ে বসে আছে। বইপত্র চারিপাশে ছিটানো; মা গজগজ করছে।

—পড়াবে মেয়েকে? দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছি। দোব ধরে এক-একটা কানা খোঁড়ার ঘাড়ে চাপিয়ে, হাঁড়ি ঠেলবে দুবেলা—আর শাশুড়ি ননদের খোঁটা-ঝাঁটা খাবে তবেই টিট হয়ে যাবে। তেড় মারবো এইবার।

নীতা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না; তবে একটা কিছু ঘটেছে তা বেশ অনুমান করতে পারে।

মণ্টু ওদিকে দাঁড়িয়ে, মা ফেটে পড়ে তাকে দেখে।

—পড়াশোনা গোল্লায় গেছে! এ বাড়ির সবই ওই ছন্ন! হবে না? বাপ কেমন!

নীতা ঘরের ভিতর সরে গেল। জানে একবার মায়ের মেজাজ চড়লে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে চড়ার দিকেই যাবে। বাবা এইটুকু জানেন, তাই এড়িয়ে যান সুযোগ পেলেই।

সব ধকল মায়ের উপর দিয়েই যায়। শত অভাব অভিযোগে জ্বলছে, ছেলেমেয়েদের কিছু আব্দারের কথা সেই তাতের উপর ঘি-এর মত ছিটিয়ে পড়ে; ধোঁয়া থেকে আগুন লকলকিয়ে ওঠে।

বড়দা শঙ্কর বাড়িতে পা দিয়ে মায়ের ওই বকাবকি শুনে বলে ওঠে—

—চুপ করবে তুমি? কাক চিলও বসতে দেবে না বাড়িতে?

শঙ্করের নেশা এখন গান শেখা—রেওয়াজ করা। পেশা বর্তমানে কিছুই নেই। ভবিষ্যতে কি করবে তাও অজানা, তা নিয়ে ভাবনাও করে না। বেপরোয়া। দিনরাত রেওয়াজ করা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বাঁ হাতে রঙীন সুতো বাঁধা, কোন খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বেঁধে সাকরেদ হয়েছে। পরনে ঢোলা পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙ্গারে টাঙ্গিয়ে রাখে যেন গিলের ভাঁজটুকুও নষ্ট না হয়। সবে ধন নীলমণি, এইটি সম্বল। পায়ের চটিটা পালিশ করতে বসে।

কাদম্বিনী জবাব দেয়—আমার কথাগুলোই শুনতে পাস না?

শঙ্কর জোরে জোরে পালিশ বুলোতে থাকে। বলে ওঠে—

—উহুঁ, বাবা শুনবো না? সাধা গলা। উদারা মুদারা ছেড়ে তারায় গিটকিরি—সপাট তান করছো। এইবার খেয়ালের রেওয়াজ করো মাদার। দিনে চারটি ঘণ্টা ব্যাস! .... গঙ্গুবাঈ হাংগল।

জ্বলে ওঠে কাদম্বিনী ছেলের কথায়, কি উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। ডালটা উনুনে পুড়ছে বোধ হয়, গন্ধ ছাড়ছে। শশব্যস্তে ঝগড়াটা আপাতত মুলতুবী রেখে রান্নাচালার দিকে ছুটলো।

হাসতে থাকে শঙ্কর—দেখলি তো! বাব্বা! কি বলেছিলি রে তোরা দাদারকে? একেবারে ফায়ার!

বাড়িতে একটু শান্তি ফিরে আসে, পরিবেশটা বদলে যায় শঙ্কর আসার পর থেকেই। নীতা খোপাটা খুলে স্নান করবার আয়োজন করছে। ওর দিকে এগিয়ে যায় শঙ্কর; দুটো আঙুল ঠোঁটের কাছে ধূম-পানের ভঙ্গীতে রেখে বলে ওঠে—

—কিসসু নেই। গোটাকতক পয়সা ছাড় না!

কি ভেবে নীতা ব্যাগ থেকে একটা সিকি বের করে দেয়।

শঙ্কর ব্যাগটার দিকে উঁকি মেরে বলে ওঠে।

—ইস্ এত টাকা পেলি কোথায় রে? স্কুলের মাইনে বুঝি? তা দে এক পাত্তিই দে না? উহুঁ, একটা চাকরি বাকরির চেষ্টা দেখো। বুঝলে?

সিকিটাকে হাতে এপিঠ ওপিঠ দেখতে থাকে শঙ্কর। জবাব দেয় কি ভেবে—

—চাকরি! ক'টা মাস যেতে দে। ওস্তাদ রেডিওতে চান্স করে দেবেন বলেছেন। শিল্পীর চাকরি করা সাজে না। একবার নাম বেরুলে হয়। জানিস আমীর খাঁ এক সিটিং-এ কত পান? বারোশ টাকা! দুঘণ্টায় বাবার একবছরের রোজগার তুলে নেন। একবার ঠেলে উঠতে দে, দেখবি তারপর। পয়সা আশমানে উড়ে বেড়াচ্ছে। ধরে নিতে পারলেই বাস!

হাতের সিকিটা নখের টোকা দিয়ে আশমানে তুলে খপ করে ধরে ফেলে শঙ্কর পকেটস্থ করে।

সত্যি? নীতা বলে ওঠে, কি যেন স্বপ্ন দেখছে শঙ্কর। গীতা মণ্টুও!

নীতা ওদের দিকে চেয়ে আছে। গীতার পরনের শাড়িটা ছেঁড়া, মুখে চোখে কি একটা আশার দূরাগত আলোর আভা।

নীতা বলে ওঠে—কাল শহরে যাবি গীতা? কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

গীতা লাফিয়ে ওঠে—তাই চল দিদি!

মণ্টু চেয়ে থাকে দিদির দিকে, ওকে কাছে টেনে বলে ওঠে নীতা- কিরে, তোর কি চাই?

মণ্টু দিদির কানে কানে কি বলে।

হাসছে নীতা। এই তার জগৎ!

কাদম্বিনীর গলা শোনা যায়—চান-টান করবি, না হেঁসেল আগলে সারাদিন বসে থাকবো?

—যাই মা!

বাড়ির সেই কঠিন কঠোর পরিবেশটা বদলে গেছে। আবার সকলের মনে সুর জাগে, মুখে হাসি ফোটে।

শঙ্কর চটি পালিশ করতে করতে বলে ওঠে—

—ওই যে পাত্তির কথাটা বললাম, মনে রাখিস কিন্তু! আবার গুনগুন সুরে শঙ্কর চটি পালিশ করতে বসেছে।

জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে। মানুষের ভিড়।

হাজারো মানুষের মনে হাজারো চিন্তার জট; মহাসমুদ্রে সবাই যেন-একটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। নিজের চারিপাশে স্তব্ধ নির্জন ঢেউভাঙা সমুদ্র। কোথাও প্রবালের রঙ, কোথাও মেঘঢাকা বৃষ্টিভরা আকাশ। কোথাও সিন্ধুপারের উর্মি, তার ঢেউভাঙা গুঞ্জরণ।

হাজারো মানুষ চলেছে তবু তারা স্বতন্ত্র, সবাকার অস্তিত্ব মিলে একটি স্রোতমুখর মহাজীবনধারা।

মণ্টু গীতা আর নীতা একগাদা জিনিসপত্র কিনে কলেজস্কোয়ারে ঢুকেছে। একচিলতে সবুজের নিশানা—পুকুরের জলে দামাল ছেলেদের ঝাঁপাঝাঁপি। বাইরের কর্মব্যস্ত জীবন এই চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে যেন বদলে গেছে। পোশাকী নয়—কেমন ঢিলে-ঢালা চলন। বৌ-ঝিরা ছেলেপুলেদের নিয়ে এসেছে, কোথাও বসেছে কথকতার আসর। অলস মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে এখানের স্রোত।

দুটো বেঞ্চে পাকামাথা টেকো কজন ভদ্রলোক লাঠি রেখে বসে খোসগল্প করছে। অবসর জীবন! .... কয়েকটা কলেজের ছেলে হাসি-গল্প করতে করতে চলেছে। কে যেন মালকোঁচা মেরে ওই ভিড়ের মধ্যেই হারানো যৌবনকে ধরবার জন্য হন্তদন্ত হয়ে ঘুরপাক দিচ্ছে।

—কি হে, বসবে না সামন্ত?

সামন্ত চলতে চলতে জবাব দেয়—উহুঁ, মোটে তিন পাক হয়েছে গোলদীঘির পাঁচ পাক না দিয়ে বসবো না।

—তাহলে সাতপাকে বাধা কি হে? রসিকতা করে প্রৌঢ় সঙ্গী বেঞ্চে বসে বসেই।

মণ্টুর হাসি আর ধরে না, গীতাও খুব খুশি। উপছে পড়ছে যেন নীতা।

—ডালমুট খাবি?

নীতার কথায় গীতাই বলে ওঠে—উহুঁ, আলুকাবলি বেশ খাট্টা দিয়ে।

মণ্টু পয়সা নিয়ে আলুকাবলিওয়ালা খুঁজতে যায় পুকুরের ধারের চাতালের রেলিং টপকে।

আজ নীতা একটা দুঃসাহসিক কাজ করছে। প্রথম মাইনে টুইশানি আর বৃত্তির টাকা পেয়ে বেশ একটু খরচ করে ফেলেছে ওদের-কাপড়-চোপড়, বইপত্র আরও কিছু কিনে। মণ্টু, গীতা আর দাদার কথা ভোলেনি সে। মা আর গীতার জন্য ভালো শাড়ি কিনেছে। জমকালো রঙে গীতাকে মানায় চমৎকার। নতুন ডিজাইনের কটকী শাড়িটা পছন্দ করে কিনেছে সে। রুচিজ্ঞান আছে গীতার।

আলুকাবলি খাচ্ছে তিনজনে বসে। নীতাও যেন ওদের হাসি আর আনন্দের মাঝে নিজে ওদের দলে ভিড়ে গেছে।

আবছা আলো পড়েছে পুকুরের জলে, সেই আলোর বিচ্ছুরণ গীতার ফরসা পুরুন্ত দেহে ও কোঁকড়ানো একরাশ চুলে। মণ্টুর বগলে সদাকেনা বুটের জোড়াটা। মাকে বলেছিল কাল কিনে দিতে, মা বাঁঝিয়ে ওঠে।

—এমনি জুতো জোটেনা, তায় জুতো পরে বল খেলবেন?

হাসছে মণ্টু মায়ের কথাটা স্মরণ করে।

—জানিস বড়দি, মা বলে জম্বুরা লইয়া খেলস্। সামনের বছর ডিভিশনে খেলবই দেখবি।

হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে—অ্যাই বড়দি, সনৎদা যাচ্ছে, ওই যে।

মণ্টু আলুকাবলির ঠোঙা সমেত উঠে দাঁড়িয়েছে—ডাকবো?

সনৎ চলেছে, একটা সাদা পাঞ্জাবি গায়ে, পায়ে পুরোনো স্যাণ্ডেল। বগলে কতকগুলো বই নিয়ে আনমনে যাচ্ছে সে।

নীতা যেন চমকে ওঠে—না! থাম তুই।

কিন্তু আর উপায় নেই। মণ্টুর গলা শুনে এদিক ওদিক চাইছে সে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জলের পাশে একঝাঁক ফুটন্ত লাল ক্যানা ফুলের কেয়ারির পাশে ওদের দেখে এগিয়ে আসে।

—তোমরা?

হঠাৎ চোখ থেমে যায় গীতার দিকে চেয়ে। এক ঝিলিক আলো ওর চোখের তারায়।

কি যেন একটা মাধুর্য ঝরে পড়ে। ওর দেহ ঘিরে প্রথম যৌবনের জাগরণী সুর, দেহ-মনে ওর শ্যাম উপবনের নিশানা, পাখির ডাকা কোন্ সুরের রেশ।

একটি মুহূর্ত! চমকে ওঠে সনৎ!

সামলে নিয়ে এগিয়ে যায় সে।

—হ্যালো, লেডি অব দি লেক উইথ আলুকাবলি, কতদিন পর দেখলাম তোমাকে!

গীতা কৃত্রিম কোপে যেন ফেটে পড়ে—থাক থাক, আর বাজে বকতে হবে না। যেতেই মনে থাকে না, আবার কথা?

নীতা সনতের দিকে চাইল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, সনৎ রেলিং টপকে এসে ওদের পাশে বসলো।

—সদলবলে মার্কেটিংএ বুঝি?

নীতা কিছু বলবার আগেই মণ্টু জবাব দেয়—হ্যাঁ বুটজোড়াটা দেখবেন? গ্রাণ্ড, স্মুথ রানিং পাইক।

সনৎ হাসে—থাক, থাক, ওসবের কিছু বুঝি না।

নীতা মাথা নামালো সনতের দিকে চেয়ে, কেমন যেন একটা লজ্জার আভাস জেগে ওঠে। এতদিন পরে ওদের সামনে সনতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে বাধে তার।

গীতাই বলে ওঠে,—আপনার মেস কতদূর এখান থেকে?

—কাছেই, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে।

—চলুন দেখে যাই, গীতার সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে একটু যেন লজ্জায় পড়ে সনৎ। নীতার দিকে চাইল অসহায় দৃষ্টিতে।

নীতা জানে ওর অবস্থার কথা। এঁদো ঘর—এক পাশে মেসের ঠাকুর তার সঙ্গী। কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিল, আর মেসের বাবুদের সেই তীব্র কটাক্ষ, এসবের মাঝে সনৎ খুবই বিব্রত বোধ করে। তারপর তিনজন গেলে নিদেন তিন কাপ চাও আনাতে হবে। এক দিনের জলখাবারের খরচা।

তবু বলে ওঠে সনৎ,—বেশতো, চল!

নীতা বাধা দেয়—সন্ধ্যা হয়ে গেছে গীতা, সামনে পরীক্ষার পড়া। আপনার মেসে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট হবে। পরে আসা যাবে একদিন, আজ থাক।

গীতা দিদির দিকে চেয়ে থাকে। দিদিটা যেন কি। একটা দিন ছাড়া পেয়েছে গীতা। টই টই করে শহরময় চষে ঘুরে বেড়াবে, তা নয় সন্ধ্যাবেলা থেকেই বাড়ি ঢুকতে হবে। খুশি হতে পারে না গীতা।

উঠে পড়ে। রাস্তা দিয়ে চলেছে তারা।

মণ্টু আর গীতা আগে আগে চলেছে।

সনৎ বলে ওঠে নীতাকে—ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেলে আজ।

কালো মেয়েটি ডাগর চোখ মেলে বলে ওঠে—ঠিকই করেছি হয়তো।

কথা কইলনা সনৎ, নীতার কাছে তার খবর নিবিড় ভাবেই জানা। হঠাৎ নীতা প্রশ্ন করে—

—বইগুলো কিনেছো? জেথার বেরির বই?

সনৎ জবাব দেয়।—লাইব্রেরি থেকে নিয়ে চালাতে হবে।

—থাক! নীতা বই-এর মোড়কটা এগিয়ে দেয় তার দিকে।

—দেখা না হলে আসতে হতো অন্যদিন। এটা রাখো!

—নীতা!

অবাক হয়ে যায় সনৎ, কোন্ টাকা থেকে এ বই কেনা তা জানে সনৎ, কি বলতে যায়, মণ্টু আর গীতার দিকে ইসারা করে দেখিয়ে দেয় নীতা।

—চুপ করো, ওরা শুনতে পাবে।

সনৎ বই কখানা নিল ওর হাত থেকে, একটু স্পর্শ লাগে হাতে!

কালো কালো গড়ন, কপালে এসে পড়েছে দু-একগাছি ঘামে ভেজা পাতলা চুল। দুচোখে আবছা আলোর দীপ্তি, পুষ্ট হাতে একগাছি পাতলা কঙ্কণ। নিরাভরণা, কিন্তু মনের শ্রী শুচিতা বুদ্ধির দীপ্তি ওর সব কালো ছাপিয়ে নিটোল কামনার রূপবতী কন্যায় পরিণত করেছে।

মাঝে মাঝে এই জনতার মাঝে অতি পরিচিত এই মেয়েটিকে মনে হয় দূরের মানুষ। নীল আকাশের তারার মতই অধরা সে।

রাত্রির ট্রেন শহরের উপকণ্ঠের হাজারো বাসিন্দার ভিড়ে ভরে উঠেছে। সারাদিন সেই দশটা ছটার বোঝাটানা কাজ সেরে ফিরছে কেরানী, দোকানদার টাট বন্ধ করে চলেছে। মেয়েদেরও অনেকেই রয়েছে ট্রেনে। তাদের কেউ অপিসে চাকরি করে, রাত্রে কলেজ সেরে, না হয় টুইশানি সেরে সারা দিন পর ফিরছে কর্মক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে। কেউ এসেছিল চাকরির উমেদারি করতে, হতাশ হয়ে ফিরছে। তাদের টুকরো কথার আলোচনা কানে আসে। ট্রেনেই জীবন সংগ্রামের ইতিহাসটা বোঝা যায়। সেই ভিড়ের মধ্যেই ওরা বিকিকিনিও করছে।

হাতকাটা তেল, সার্জিক্যাল অয়েল আর আছে কবিরাজ কালিপদ দের আশ্চর্য মলম। কাটা ঘা, পোড়া ঘা, নালী ঘা, খোস, যাবতীয় বিযাক্ত ক্ষতে—গড়গড় করে আবৃত্তি করে চলেছে।

নীতা অবাক হয়ে যায়—পরেশ!

পরেশ সুটকেশ হাতে ভীড় ঠেলে এইদিকে এসেছে।

বাবার অন্যতম ছাত্র, পরেশ গলা নামিয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে।

মুখে হাসি ফুটে ওঠে তার—হ্যাঁ, পরীক্ষা দিয়ে কিইবা করি? লেগে গেলাম একটা কাজে—যা হয়।

পড়তে পারবে না আর, এখন থেকেই ক্যানভাসারি শুরু করেছে। পরেশ সহজ ভাবেই প্রশ্ন করে নীতাকে।

—কলকাতা গিয়েছিলে? মাস্টার মশায়ের শরীর ভালো?

ট্রেনটা ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলেছে হাস বোঝাই যাত্রী নিয়ে।

পরেশের দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা কইবার ফুরসতও নেই, বলে ওঠে—যাই নীতাদি, দেখি গে দুটো কামরা।

কঠিন কঠোর জীবনের দুর্বার ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে চলেছে সবাই। বাঁচবার, দুমুঠো খাবার সমস্যাই বড়। চাকায় চাকায় শব্দ ওঠে ট্রেনের গতিবেগের। আঁধার ফুঁড়ে গাড়িখানা চলেছে। চলতি গাড়ির পা-দানিতে ভর করে এ কামরা থেকে ও কামরায় চলে গেল পরেশ, একটু অসতর্কতা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

তবু সাবলীল গতিতে সে চলেছে—বেপরোয়া। দুর্দম গতিশীল একটা পদার্থ অভাব আর

ধ্বংস। তারই ওপর ভর দিয়ে টপ্‌কে চলেছে ওদের বাঁচবার সংগ্রাম। পরেশের কথা ভাবছে নীতা।

বাড়িতে পা দিয়েই দেখে এক পশলা হয়ে গেছে বোধ হয়। বাবা চুপ করে বসে রয়েছেন, সামনে একগাদা পরীক্ষার খাতা ছড়ানো, দেখবার মত মানসিক প্রস্তুতি তাঁর নেই। বাড়িতে ইতিমধ্যে বাবার সঙ্গে মায়ের রীতিমত একচোট বচসা হয়ে গেছে, যদিও সবটা একতরফাই তবু গুম হয়ে আছেন মাস্টারমশাই, কাদম্বিনী অপেক্ষা করছে ওদের ফেরার, পরের অধ্যায় তখনও মুলতুবী রয়েছে। কাদম্বিনী ওদের দেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে নীতা সরে গেল, বেশ বুঝতে পেরেছে ওর মুখ দেখে।

গীতা-মণ্টুর ওদিকে খেয়াল নেই। গীতা মায়ের সামনে শাড়ির পাট ভেঙে দেখাতে থাকে।

—কেমন চমৎকার হয়েছে দেখ দিকি মা? দিদির টেস্ট আছে বলতে হবে। এই বড়দার পাঞ্জাবি আর পায়জামার কাপড়।

মণ্টু মায়ের সামনে বুটের ফিতে ধরে দোলাতে থাকে; তুমি তো দাওনি তবু জুটে গেছে—ভাবখানা এমনি আর কি!

কাদম্বিনীর মন-মেজাজ এমনিতে ভাল ছিল না। মুদীর দোকানের বাকি টাকা মাসকাবার না হলে শোধ হবে না, এদিকে চাল কিছু চাই; আনতে গিয়ে নবীন মুদী যা তা বলেছে তাদের তাই নিয়েই বচসার সূত্রপাত হয়েছে এতক্ষণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

তার মধ্যে হঠাৎ এতগুলো টাকা অপব্যয় করে আসতেই যেন ফেটে পড়ে কাদম্বিনী। ছেলেমেয়ে সবাই আলাদা ধাতে গড়া। হাত কামড়ে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করে। তারা জানে না—এই বিলাসিতার এই সাধারণ স্বাভাবিক দাবিটুকু মেটানোর অধিকার তাদের কাছে দুরাশামাত্র। সমস্যা তাদের একটাই। দুবেলা দুমুঠো ভাত আর পরণে কোনমতে একখানা কাপড়, এর বাইরে কিছুর আশা করা ওদের অপরাধ।

নীতা ঘরের ভিতর জামাকাপড় ছাড়ছে; গরমে ট্রেনের ধকলে হাঁপিয়ে উঠেছে। ভিজে গেছে ঘামে জাবজেবে হয়ে ব্লাউজ পর্যন্ত, নীচের জামাটা খুলে যেন স্বস্তি পায়। আজ মনে মনে একটা স্বস্তি পেয়েছে—সংসারে তারও ঠাঁই আছে। দাম আছে। দাদা, ভাই, বোন, সনৎ, সকলের জন্যই তার ভাবনা। সুখী হোক তারা! সনতের দুচোখে সেই কৃতজ্ঞতার ছাপ ভোলেনি, তার দুর্বার একক সংগ্রামে সেও সঙ্গী হতে পেরেছে—এ এক নিবিড় তৃপ্তির স্পর্শ আনে তার সারা মনে।

হঠাৎ বাইরের আনন্দধ্বনি থেমে গেছে।

মায়ের কঠিন স্বর শোনা যায়—পেটে ভাত নেই ভূলে কল্পুর। এমনি করে মুঠো মুঠো টাকা ছিটিয়ে আসবে অকারণে তোমার ওই সোহাগী মেয়ে?

অন্ধকারে মায়ের কঠিন স্বর শুনে ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়াল নীতা। ব্যাপারটা যে এতদূর অবধি গড়াবে তা সে কল্পনাও করেনি।

মাধববাবু পরীক্ষার খাতা থেকে মুখ তুললেন। একটা জায়গাতে মাঝে মাঝে মাধববাবু কঠিন হয়ে যান; সেটা তাঁর জীবনের আদর্শবাদের ক্ষেত্রে। পরিষ্কার বোঝাপড়া করতে পারেন সেই জায়গায়, কঠিন হতে পারেন। অন্যত্র তা পারেন না।

নীতার বেলাতে তাঁর একটা বক্তব্য আছে। আশপাশে আরও মেয়েদের দেখেছেন, আগেকার নিশ্চিন্ত জীবনের কথাও মনে পড়ে। নিজে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন নি উপযুক্ত

পাত্রে; তার শখসাধও মেটাতে অক্ষম তিনি। পড়াশোনা করছে নীতা—তবুও সে-ই নিজের খরচ যোগাচ্ছে নিজের পরিশ্রমেই। সংসারের কাছে তার কোন ঋণ নেই, সংসারের দাবিই বা থাকবে কোত্থেকে?

কাদম্বিনীর কথাতে স্থির কণ্ঠে জবাব দেন—তোমার টাকা নয়, তার নিজের টাকা খরচ করেছে সে?

—তুমি কিছু বলবে না?

—কি করে কিছু বলি বলো? নিজেরই দেওয়া কর্তব্য। সেগুলো করতে পারি না; ও যদি করে, বাধা দেবার আমি কে?

মাধববাবুর কণ্ঠে অসহায় ভাব; স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।—কোন অন্যায় তো সে করে নি। তবে বলতে পারো একটু বেশি খরচ করে ফেলেছে।

কাদম্বিনী কোন যুক্তি তর্ক মানতে চায় না। তাই বলে ওঠে।—সোহাগ দিয়ে ওই মেয়ের মাথা তুমিই খাচ্ছো বলে রাখলাম। তাও যদি রূপ থাকতো? পরের ঘরে পাঠাতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। তাও কি যাবে আপদ? হাড়মাস জ্বালিয়ে খাবে। যেমন রূপ বাড়ছে—তেমনি গুণও। মরি মরি!

বাড়িতে একটা স্তব্ধতা ফুটে ওঠে; গীতা পড়তে বসে নি। মণ্টুও।

..মা ঘর থেকে বের হয়ে এসে হেঁকে ওঠে, গীতা গা মুছতে ব্যস্ত। মায়ের কথাগুলো কানে আসে।

—নে, খুব হয়েছে। এইবার পড়তে বসে কেতাত্থ করো! দিনরাত রূপ আর তারই লেপাপোছা চলেছে। কালে কালে কত আর দেখবো।

বাবার প্রতিবাদ শোনা যায় —আঃ, কি বলছ যা তা!

—ঠিক কথাই বলছি।

কাদম্বিনী রান্নাচালায় গিয়ে ঢোকে।

ভাঙা সুর তবু জোড়া লাগে না। ওবা পড়ছে। নীতা বই খুলে বসে আছে—মন বসে না। মা এর চেয়ে মুখোমুখি তাকে কিছু বললে হয়তো ভাল করতো—বাবাকে বলবার, দুঃখ দেবার জন্যই মনটা ভার হয়ে রয়েছে নীতার।

স্তব্ধ বুকচাপা পরিবেশে, আঁধার আর হতাশার মাঝেও কেমন একটা মিষ্টি স্পর্শ জেগে আছে।

একটা সুর ওঠে! আঁধারের মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে সুরটা।

বাড়ির আবহাওয়া বদলে যায় শঙ্করের আসার সঙ্গে সঙ্গেই। কাপড়গুলো দেখে বলে ওঠে— নাইস!

নাইস কাপড় এনেছিস যে নীতা! না, তোর পছন্দ আছে। মেনি থ্যাঙ্কস্! কি রে, চুপ করে আছিস যে?

নীতা জবাব দেয়—এমনিই!

—উহুঁ, মাদার কিছু বলেছে নির্ঘাত।

পরক্ষণেই শঙ্কর সব কিছু যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

—আরে ধ্যুৎ, মা যা বলবার বলুক, তুই যা করবি করে যা। চল, খাবি না?

দাদার কথায় উঠে পড়ে ওরা সবাই. নীতার খাবার ইচ্ছে নেই। সামান্য কথা কাটাকাটির পর না খেতে বসলে দাদা এখুনি বাড়ি মাথায় তুলবে। আশেপাশের বাড়িতে আলোচনাও

শুরু হবে। বয়স্থা মেয়েকে মা কি নিয়ে যেন বকেছে—মেয়ে না খেয়ে রইল। যদি কলকাতার আরও কোন কথা বের হয়ে পড়ে কলোনিতে, বেশ রসালো আলোচনার খোরাক হয়ে উঠবে সকলের কাছে।

সাত-পাঁচ ভেবেই নীতা উঠে বসলো।

—চলো!

বাড়িটা স্তব্ধ। বাবার ঘরে আলো নিভে গেছে। চারিদিক কেমন নিঝুম। কোথায় রাতের ট্রেনখানা একটা শব্দ তুলে বের হয়ে গেল।

খেতে বসে ওরা, শঙ্কর বকবক করছে।

—ওস্তাদ দরবারী কানাড়া দিয়েছেন, বুঝলি? ভারি মিঠে রাগ, রেওয়াজ করবো শুনবি তখন।

গলা খাটো করে বলে ওঠে শঙ্কর—হ্যাঁরে? কাল দিবি তো একপাত্তি?

ভাত মাখতে মাখতে জবাব দেয় নীতা।

—মাকে সব দিয়ে দিইছি, আমার হাতে আর কিছুই রাখি নি।

শঙ্কর একবার বোনের দিকে চাইল, না ওর চোখ দেখে বুঝতে পারে মিছে কথা বলেনি। হতাশ হয় সে।

—যাঃ, তুই একটা আস্ত ইডিয়ট, টাকা হাতছাড়া যে করে সে একটা ফুলস্কেল ইডিয়ট।

নীতা কথা বলে না, ভাতগুলো নাড়াচাড়া করে অন্য মনে।

গভীর রাতে নীতা চুপ করে বসে আছে। আলোটা জ্বালে নি, কেমন মাঝে মাঝে এই আবহাওয়াটা অসহ্য ঠেকে। পালাতে ইচ্ছে করে এই পরিবেশ থেকে। এড়িয়ে গিয়ে বাঁচাতে চায়।

বাবাকে দেখেছে কোন কিছুতে যেন হুঁশ নেই। একান দিয়ে মায়ের কথা শোনে, ও কান দিয়ে বের হয়ে যায়। মন তাঁর অন্য চিন্তায় ব্যস্ত বই কাগজপত্র না হয় অতীতের গল্প-স্মৃতিতেই মন ভরপুর! এই জগতে বাঁচার পথ করে নিয়েছেন। হয় একে এড়িয়ে ভুলে গিয়ে বাঁচার না হয় একে জয় করার চেষ্টা করবে সে। এই দুঃখের অভাবের কালো ছায়া থেকে—আলোর দিকে নিয়ে যেতে হবে সবাইকে। কল্পনা করে একটি সংসারের; দাদা রোজগার করছে, মন্টুও বড় হয়ে চাকরি করবে। সার্থক একটি সংসারের কল্পনা।

.... কার পায়ের শব্দ! মাধববাবু এগিয়ে আসেন অন্ধকারে।—শুয়ে আছিস নীতা? শরীর খারাপ?

নীতা বিছানায় উঠে বসে—না, এমনিই।

বাবা কি যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করছেন।

—যা, উঠে গিয়ে পড়াশোনা করগে' সামনে পরীক্ষা।

...সংযত স্বল্পবাক ওই আত্মাভোলা লোকটির মনেও নীতার জন্য ব্যথা বেজেছে।

স্ত্রীর সম্বন্ধেও কিছু বলতে চান না তিনি। বলে ওঠেন—পীরগঞ্জের দিনগুলো ভালই ছিল নারে?

নীতার মনে পড়ে, বাবার সম্মান, প্রাচুর্য সেখানে ছিল। মাধববাবুই বলে চলেন—সে সব আর ভেবে কি হবে বল?

মুহূর্তের সেই অতীত সত্তার সমস্ত চিন্তাটুকুও দূর করে ফেলতে চান তিনি।

—যা, পড়তে বসগে। আমিও খাতাগুলো দেখে নিই। আজ খালধার থেকে টাটকা পুঁটি কিনে এনেছি, খেয়েছিলি তো? এখানে পুঁটিগুলোও যেন শুকিয়ে গেছে!

কাদম্বিনী নিজেও বুঝতে পারে নিজের পরিবর্তনটা। ক্রমশ বদলাচ্ছে সে। পীরগঞ্জের সেই লক্ষ্মী-শ্রী হারিয়ে— আজ একটা ধ্বংস-স্তূপের মত বসে আছে অতীতের স্মৃতি-শ্মশানে। নইলে একদিন কিছু হয়তো খরচ করে এসেছে নীতা ভাইবোনদের জন্য, এমনি ভাবে তাকে কথা না শোনালেও পারতো।

মাঝে মাঝে জ্বলে পুড়ে মনটাও বিষিয়ে ওঠে, এই ছাই-এর অতল থেকে সেই চির জাগর মাতৃহৃদয় ঠেলে ওঠে মাঝে মাঝে। কিন্তু অসহায় সে, দৈনন্দিন বাঁচবার চেষ্টা তাকে সব ভুলিয়ে অন্য মানুষ, অমানুষ করে তুলেছে।

রাত নেমেছে নীরব কলোনীতে, ঘুমের আবেশে মগ্ন চারিদিক। আবছা চাঁদের আলোয় জোনাকজ্বলা আমবাগানের আঁধারে হাওয়া ছোটে—হু-হু হাওয়া, জেগে আছে কাদম্বিনী। সমস্ত ভাবনা তার মাথায় চেপেছে।

শঙ্কর তো সংসারের একটা বাড়তি খরচ। আয়ের বেলায় নেই, দিনরাত নিজের খেয়াল নিয়েই আছে। ওই গান আর গান। মাধববাবুর বয়স হচ্ছে, স্কুল থেকে রিটায়ার করতে হবে। ভরসা নিজের দু চারটে টুইশানি আর নীতার চাকরি, টুইশানির টাকা। গীতাকে দিয়ে কি হবে জানেন না।

এখন থেকেই ও মেয়ে মাথাঠাড়ো, একবগগা। কারোও কথা শুনবে না। সে নিজের বেশবাস আর প্রসাধন, কলোনি বেড়ানো নিয়েই মত্ত। মন্টু, সেও ছোট!

কাদম্বিনীর চোখের সামনে যেন জমাট অন্ধকার, আতঙ্কের অন্ধকার। তার মাঝেই পথ হারিয়ে সব স্নেহ ভালবাসা বিসর্জন দিতে বসেছে সে।

তারাগুলো চিকিমিকি করছে আকাশে। নীতার ঘুম আসছিল মাত্র। হঠাৎ কার স্পর্শে চমকে ওঠে। অবাক হয়ে যায়—মা!

ডাকতে গিয়ে থেমে গেল নীতা। মাকে এইভাবে দেখে খুশি হয়, ভালো লাগে। মা মাথার দিককার জানলাটা খুলে দিয়ে বালিশটাকে ঠিক করে মাথাটা তুলে দিচ্ছে তার। একটু শ্যাম স্নেহস্পর্শ মায়ের! নীতা এই দুর্বলতটুকু যেন টেরই পায় নি। চুপ করেই থাকে নীতা।

নিজের মনেই বলে চলেছে কাদম্বিনী —সারাদিন ভূতের খাটুনি খেটে বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা।

আলো নিভিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে যায় মা।

নীতা বাইরের দিকে চেয়ে থাকে খুশি মনে; জানলার বাইরে চাঁদের আলো ঢাকা সবুজ নির্জনের দিকে চেয়ে থাকে। একটা সুর উঠছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে সুরটা, মধুর একটা অনুভূতি!

শঙ্কর রেওয়াজ করছে, নীতা উঠে বসে বিছানায়।

পথহারানো একটি ভ্রমর খুঁজে নিয়েছে পথ। অসীম শূন্যে জাগে তার ক্লান্ত পাখার গুঞ্জরণ। বাতাসে জাগে রজনীগন্ধার সৌরভ। সনতের মুখখানা মনে পড়ে। হাসিমাখা সুন্দর একটি মুখ। ওই সুরে মিশিয়ে আছে বসন্তের পুষ্পসৌরভ, আশার আলো আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গ্লানির মাঝেও মানুষের অন্তরের মাধুর্য সন্ধান।

মুগ্ধ হয়ে যায় নীতা। শঙ্কর জানে না তার সুরের পরিধি, সীমানা। নিজে এর ওর কাছে

হাত পাতে; দুঃখ সহ্য করে ও জানে না কতজনের দুঃখ জয়ের সাধনায় ওর সুর যোগায় অনুপ্রেরণা। কস্তুরীমৃগ সৌরভের সন্ধান জানে না—উৎস খুঁজে পাগল হয়ে বনে বনে ফেরে।

.... রাতের হাওয়া বইছে। .... শন শন, একটা শব্দ। দূরাগত আশা আর আনন্দের বাণী। শরীরের কোষে কোষে রোমাঞ্চ জাগে। মনে আসে দুর্বার সাহস, শান্তির স্তিমিত গাঢ়তা!

ঘুম ছেয়ে আসে দু'চোখে। নিবিড় ঘুম।

বিনিদ্র রজনীর মাঝে একক জেগে আছে শঙ্করের এই সুর—নিটোল মধুর একটি সুর। দরবারী রেওয়াজ করছে শঙ্কর। রাত্রির মধ্যযাম ঘনিয়ে আসে।

মাধববাবুর রিটায়ার করবার আদেশ হয়ে গেছে। স্কুল থেকে একদিন সমারোহ করে মীটিং ডাকা হয়েছে বিদায়-সংবর্ধনা জানাবার জন্য। অবসর গ্রহণ, মাস্টারের অবসর গ্রহণ মানে—শেষ জীবনের দিন কটা অনিশ্চিত উপবাসের মধ্যে কাটানোর প্রস্তুতি!

নবীন মুদী বাকি বকেয়া সব মিটিয়ে নিতে এসেছে। হাসেন মাধববাবু—পালাচ্ছি না নবীন! তোমার টাকা তুমি সবই পাবে।

নবীন আমতা আমতা করে—না না, সিডা কি কন? কইতে আছিলাম এমনিই। তলাস নিতে এলাম কেমন আছেন।

প্রাইভেট ছাত্ররাও কেমন যেন কমছে। হাসেন মাধববাবু।

—ওরা স্কুলের মাস্টার মশায় না হলে পড়বে না; প্রমোশনের জন্য হেডমাস্টার মশায়কে রেকমেণ্ড করবে, পরীক্ষায় কোশ্চেন দাগ মেরে দেবে—এই না হলে মাস্টার? কি-রে মদনা?

মদনের দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে। বার কয়েক ফেল করার পর সে এখন কলোনীর নবারুণ সংঘের সেক্রেটারিগিরি করছে আর প্রাইভেটে স্কুলফাইনাল পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করছে।

মদনের এসব বালাই নেই, সেই বলে ওঠে—

—ওদের কথা ছাড়ান দেন স্যার। পরীক্ষায় পাশ করাডাই কি বড়? দম নিয়ে শুরু করে মদন বিজ্ঞের মত—আসল ব্যাপারটা হইতে আছে শিক্ষার কথা, জ্ঞানের কথা, কন তাই কিনা?

মাধববাবু হাসতে থাকেন।

মনে মনে তবু মানতে পারেন না। কোথায় নিদারুণ ভাবে পরাজিত হয়েছেন তিনি। চলমান জীবনের ভিড় থেকে তিনি সরে এলেন বাতিলের দলে। তবু শক্ত হবার চেষ্টা করেন তিনি, ছেলেদের ভরসা দেন—তোদের ভাবনা নেই। ইংরাজী অঙ্কে আটকাবে না।

আসবি, যা বলি করে যা তোরা। স্কুলে কি হয় বল?

পরক্ষণেই সামলে নেন—এত ছেলের মাঝে কতটুকুই পড়াবার সময় পেতাম ক্লাশে?

মাধববাবু যেন নিজেই সান্ত্বনা খুঁজছেন।

—ভাবছি এবার ইংরাজীর নোট, টেক্সট বুক লিখবো।

বৃদ্ধ বয়সে নতুন করে জীবন শুরু করতে চান তিনি, অদম্য উৎসাহে।

নীতা সংসারের অবস্থা বুঝতে পেরেছে। বাবার চেহারা কদিনেই যেন অনেক খারাপ হয়ে গেছে একটি দুশ্চিন্তায়। নীতাই অভয় দেয়।

—এত কি ভাবো বাবা? যেমন করে হোক দিন চলে যাবেই। একটা ভালো টুইশানি পেয়েছি। সপ্তাহে দুদিন বাংলা পড়াতে হবে এক ভাটিয়া ভদ্রমহিলাকে। মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে।

মাধববাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন; তখনকার দিনে ছিল মেয়ের স্বামী ভাগ্য, স্বামীর

ঘর সংসার সম্পদ শ্রী! এইছিল তাদের গর্বের বস্তু। এখন, চাকরি, না হয় টুইশানি। দু'মুঠো খেয়ে পেরে শুধু বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টায় ক্ষণিক স্বার্থকতা। তাই নিয়ে ওরা খুশি থাকে। চাকরির স্বপ্ন দেখে।

দিন বদলেছে। নীতা বলে চলেছে—পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ইনটারভিউ আসবে বাবা। বি-এটা দিয়ে নিই এর মধ্যে।

কাদম্বিনী মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে, একমাত্র আশ-ভরসা ওই মেয়ে। নীতা টুইশানি আর মাস্টারির টাকা মায়ের হাতেই পুরো তুলে দেয়। গত মাসের সেই কথাগুলো ভোলে নি। তাই বোধ হয় এই রকম করেছে সে।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—তোর জন্য রাখ কিছু। নিজের খরচ তো আছে।

সেই ঘটনার পর থেকে মেয়ের সঙ্গে সে যেন ভাল করে কথা বলতে পারে নি। কোথায় একটা সঙ্কোচে বাঁধতো। ওই টাকা থেকে দু'খানা দশটাকার নোট মেয়ের হাতে তুলে দেয় সে।

—নে রাখ এগুলো।

চুপ করে ওটা নিল নীতা। কাদম্বিনী মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে। দরদভরা কণ্ঠে বলে কাদম্বিনী—খেটে খেটে হাড় কণ্ঠা সার হয়েছে নীতা, তার উপর সংসারের কাজকর্ম! তুই বাপু গীতাকে বুঝিয়ে বল ঘরসংসারের কাজ একটু করুক। তুই কোন দিক সামলাবি? পড়া—চাকরি! কি দশা হয়েছে শরীরের দেখেছিস আয়নায়?

নীতা হাসে—দেখবার সময় কই? তাছাড়া বেশই আছি, তুমি ভেবো না।

কাদম্বিনীর বুক দীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। কত স্বপ্ন দেখেছিল সে, ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়ে দেবে মেয়ের। বড় মেয়ে তার, সাধ আহ্লাদ ছিল। কিন্তু!

সব সবুজ আজ রোদপোড়া তামাটে প্রান্তরের নিঃস্বতায় হারিয়ে গেছে রূপ! পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায় মেয়েটাও কেমন শুকিয়ে গেছে। ও যেন ব্যর্থ যৌবনের বেসুরো বীণা—ওতে সুর ফোটে না। ঝরাফুল—রূপ-রস-বর্ণ গন্ধ সবই যেন হারিয়ে গেছে। গীতা বৈকালে বেড়াতে বেরুবে—মায়ের কথায় থামলো। একরাশ এঁটো বাসনপত্র রয়েছে, নীতা টুইশানি সেরে ফিরে এসে তাই নিয়ে মাজতে বসে। ঝি রাখবার ক্ষমতা নেই।

কাদম্বিনী বলে ওঠে গীতাকে—ঢলানি করতে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? সাজ বেশ ছেড়ে বাসনকোসনগুলো মেজে দাও।

গীতার আজ স্কুলে থিয়েটারের রিহার্সাল আছে। রেলপারেরর গুপীদা আসবে। মিত্তিরবাড়ির গুপীদা, আধুনিক গান যা গায়, গীতার মনে সেই সুরের রেশ। কেমন ভাল লাগে ছেলেটাকে। স্মার্ট, রঙীন পোশাক পরে। মায়ের কথায় ওর সুর যেন ছিঁড়ে যায়।

আমতা আমতা করে গীতা।

—একটু কাজ ছিল যে মা। জরুরী কাজ।

—কাজ তো ওই পেখম মেলে বেড়ানো। সব দেখাচ্ছি!

গীতা বলে ওঠে—আর কেউ করুক আজ আমার সময় নেই।

চটে ওঠে মা—কথা শোনো, বাপ যে দাসী বাঁদী পাঁচটা রেখেছে?

শঙ্কর বাড়ি ঢুকেই মাকে বকতে দেখে এগিয়ে আসে—খাম্বাজ রাগিণী ভাঁজছো না তো?

দপ করে জ্বলে ওঠে কাদম্বিনী—লজ্জা লাগে না তোর! এতবড় মরদ বুড়ো বাপের ঘাড়ে

বসে খাচ্ছিস? দুধের মেয়ে একটা দিনরাত খেটে তোর জামাকাপড় হাতখরচা জোগাচ্ছে; তোর কি কোন কাজই নেই, তুই কেবল তা-না-না করবি?

হাসে শঙ্কর—ফর মানি মাদার। দেখবে টাকা আমিও রোজগার করবো। এখনই পারি, কেবল ওস্তাদ বাধা দেন। দুটি বছর কোথাও ফাংশন করবে না। একেবারে তৈরি হয়ে বেরুবে।

কাদম্বিনী সঙ্কটে পড়েছে শঙ্করকে নিয়ে।

গীতা ফাঁকা খুঁজছিল, পথ পেয়ে সটান সরে পড়ে সে।

মা ছেলের জবাবে অধৈর্য হয়ে ওঠে। ওর বয়সী কত ছেলে সংসারের হাল ধরেছে। রোজগারপাতি করছে ভালোই। মিত্তিরদের গুপী গান গেয়ে থিয়েটার করেও কেমন চালাচ্ছে। নৃপেন দোকান দিয়েছে, নটবর চাকরি করে। আর তার ছেলে বেকার? নির্লজ্জ বেহায়া গণ্ডমূর্খ! কাদম্বিনী কথাটা ভাবছে আর মনে মনে জ্বলে পুড়ে উঠেছে। আজ অসহায় রাগ কোনরকমে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে।

—তোর ওস্তাদের দাড়ি নেই; দাড়ি?

শঙ্কর সহজ ভাবেই জবাব দেয়—হ্যাঁ! এই বড় মেহেদি রং করা সুন্দর দাড়ি আছে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে কাদম্বিনী—তবে সেই দাড়ি ধরেই দুবছর ঝুলে থাক্‌গে? এখানে কেন?

ফেটে পড়ে কাদম্বিনী—মেয়েরও অধম তুই। আশেপাশে দেখ সোমত্ত ছেলেকে বাড়িতে কে পুষছে? কোন কাজকর্ম না পাস ভিক্ষে করগে বাইরে! হাত পাতগে—

—মা! শঙ্করের মনে একটু নরম জায়গায় হাত পড়তেই চমকে ওঠে সে। এতদিন এত কথা সহ্য করেছে, আজ বোঝে মা সত্যই দেখতে পারে না তাকে। এত দিনরাত্রির সাধনা সিদ্ধির দ্বারে এসে থেমে যাবে! তবুও সে এত বড় আঘাত আর সইবে না, রাগ বস্তুটা তার এমনিতেই কম কিন্তু মান অপমান বোধ আর মুছে যায় নি মন থেকে।

নীতা পড়ছিল ঘরে, মায়ের কথাগুলো শুনে বের হয়ে আসে। নিজের উপরই লজ্জা আসে তার। মা যেন কেমন ক্ষেপে উঠেছে, চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ক্ষেপে ওঠা বিড়ালের মত, শেষ আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসেবে নখ দাঁত বের করে রুখে দাঁড়িয়েছে। রাতের সেই ক্ষণিকজাগা স্নেহময়ী মা সংসারের চাপে হারিয়ে গেছে।

ঘর থেকে নীতা বের হয়ে দেখে, শঙ্কর সদর দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে।

—দাদা! চীৎকার করে ডাকে নীতা।

শঙ্কর ফিরে দাঁড়াল। কাদম্বিনী কথাটা বলে ফেলে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। বাসনের গোছাটা নিয়ে নিজেই খিড়কির ঘাটে গিয়ে বসেছে। শঙ্কর ফিরে দাঁড়াল নীতার দিকে চেয়ে।

—কোথায় যাচ্ছো?

—একটা কাজকর্মের চেষ্টাই দেখবো নীতা, এখানে আর চলে না। কিছু না পাই একটা ফিরিওলা তো হতে পারি। ট্রেনে ট্রেনে দাঁতের মাজন, হাতকাটা তেল—বেশ সাধা গলায় হেঁকে হেঁকে ফিরি করবো।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠে নীতা। সেই রাত্রে দেখেছে পরেশকে। ফিরিওয়ালার জীবন—এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনে মৃত্যুকে পরিহাস করে যাওয়া তার প্রাত্যহিক ঘটনা। দাদার মত একটা শিল্পী নিছক বাঁচবার জন্য এমনি করে দিনাতিপাত করবে এ যেন ভাবতেই পারে না সে। সারা মন অজানা ব্যথায় ভরে ওঠে তার!

—কেন? নীতার কণ্ঠে বেদনার সুর।

দাদার প্রতিভার উপর আস্থা আছে তার। এ সাধনা বৃথা যাবে না। সেই রাত্রের সুরটা মনে পড়ে; বিচিত্র একটি অনুভূতি, অন্য কোন মধুময় জগতের অনুসন্ধান! অপরকে এগিয়ে দেবার অনুপ্রেরণা তার সুরে—অথচ জীবনের সেই মাধুরিমার সন্ধান নিজেই সে জানে না। শঙ্কর বলে চলেছে—

—তুই নাকি মাকে বলেছিস, আমি জোর করে তোর কাছ থেকে হাতখরচের টাকা আদায় করি। বাড়িতে ভাত ধ্বংস করছি!

—মায়ের কথায় কান দিস্ না দাদা! একদিনের কথায় নিজের এতদিনের কঠিন সাধনা, ভবিষ্যৎ নষ্ট করবি? ব্যর্থ করে দিবি সবকিছু! তোর ওপর আমার কত আশা ভরসা। দাদা!

নীতার কণ্ঠে আবেগ ফুটে ওঠে।

শঙ্কর মুখ তুলে চাইলো তার দিকে। ওর আন্তরিকতা শঙ্করের হৃদয় স্পর্শ করেছে। কেমন যেন ভরসা পায়। নীতাই বলে।

—না-না! তুমি শিল্পী, তুমি গান গাইবে, কেউ তোমায় বাধা দেবে না।

—সত্যি!

—হ্যাঁ, দুটো বছর তুমি চালিয়ে যাও দাদা। এ কষ্ট কিছুটা সইতে হবে। নাহলে সুর বের হবে কেন?

হাসছে শঙ্কর—ঠিক বলেছিস নীতা। নইলে সুর বেরুবে কেন?

আজ তার কাছে গোটাকতক টাকা ছিল, তাই তুলে দেয় নীতা আড়ালে ওর হাতে।

—আর নেই আপাতত, থাকলে দিতাম। এই নাও এ মাসে।

শঙ্কর বোনের দিকে চেয়ে থাকে। এ বাড়িতে অন্তত একজন আছে যে তার সাধনায় সাহচর্য করেছে। এই সমর্থন তাকে সব দুঃখকষ্ট সইবার অনুপ্রেরণা যোগায়, শক্তি দেয়।

নীতার মনে খুশির হাওয়া। চার দেওয়ালের বেষ্টনীর বাইরে মুক্ত উদার আকাশে ডানা মেলে উধাও হতে চায় মন। সনৎ এসেছে দেখা করতে মাধববাবুর সঙ্গে।

মাধববাবু একগাদা খাতা বই নিয়ে ব্যস্ত। সনৎকে দেখে হঠাৎ বিস্মৃতির বোঝা ঠেলে ওঠেন। আরে সনৎ? এসো এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। দেখো, যে সব নোট আজকাল বাজারে চলে তাতে ছাত্রদের পরকালই নষ্ট হয়! তাই ভাবলাম একটা নোট লেখা যাক। কি বলো? এই যে, লিখেও ফেললাম প্রায়। ক্রুড় ফ্রেজ-ইডিয়মস্ তারপর ধর রেফারেন্সও একআধটু দিচ্ছি। অন্ততঃ তারা জানবার চেষ্টা করুক। বসো—বসো।

মাধববাবু খুশিই হয়েছেন অনেকদিন পর পুরানো ছাত্রকে দেখে। হ্যাঁ, তারপর কি করছ? পড়াশোনা?

সনৎ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো—এম এ. পাশ করলাম স্যার। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি।

নীতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এক মুহূর্ত! মাধববাবুর মুখে একটা বিষাদের ছায়া খেলে যায়। আবছা—অস্পষ্ট! নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে। দারিদ্র্য আর অভাবের চাপে তিনি বেশিদূর পড়তে পারেন নি। তখনকার এফ.-এ পাশ করেই থামতে হয়েছিল। সেই ডিগ্রীহীনতার ক্ষতি দুঃখ সারা জীবন তার দশগুণ পড়াশোনা করেও ভুলতে পারেন নি। ছাত্ররা তাঁরই হাতে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে এক একে। কেউ প্রফেসার, কেউ বড় অফিসার, ব্যবসাদার হয়েছে। কিন্তু? এক মুহূর্তেই সেই চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেন। জীবনের শেষ সীমায় এসে এখনও মনে হিংসা!

হাসছেন মাধববাবু, নিজের মনের এই নীচতা দেখেই হাসছেন বোধ হয়। বলেন।---বাঃ! ওগো শুনেছো, সনৎ ভালভাবে পাশ করেছে। করবে না? কার ছাত্র দেখতে হবে তো!

কাদম্বিনীও এসে দাঁড়িয়েছে; সনতের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন ভাবছে সে মনে মনে। একটা ক্ষীণ আশার সুর জাগে কাদম্বিনীর মনে

—তা এবার কি করবে ভাবছো? চাকরী-বাকরী? প্রশ্ন করে কাদম্বিনী।

—কিছু ঠিক করি নি। সনৎ জাবাব দেয়।

—ঠিক করবার কি আছে? চেষ্টা করো, রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে যাবে। তারপর পি. এইচ. ডি.! বুঝলে। বুড়ো মাস্টারকে সে দিন ভুলো না কিন্তু। আমি মানুষ চিনি। কার দ্বারা কি হয় তাও জানি। সেই দিনেই জানতাম।—ইউ স্যাল সাইন।

নীতার দুচোখে হাসির আভা। সে আজ খুশি হয়েছে।

কাদম্বিনীও ওর দিকে চেয়ে আছে।

গীতা গুণ গুণ করে গান গাইছে ওঘরে আপনমনে, আধুনিক গানের একটা বিশ্রী আবেদনময় কলি। নীতারই যেন লজ্জা আসে।

কাদম্বিনী কি ভেবে ওঘর থেকে বেরিয়ে এসে গীতাকে ডাক দেয়।---গীতা শোন!

গীতা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সনৎকে দেখে দাঁড়াল।

কাদম্বিনী বলে।

—চল বাবা, তোমরা গল্পগুজব করগে বাছা। এই গীতা, তোর সনৎ দা এসেছে রে। বুঝলে বাবা, ও তো তোমার নাম প্রায়ই করে। আমি চা টা নিয়ে আসছি। কই গো তুমি খাতাগুলো শেষ করো! রান্নাঘরে একটু হাত লাগাবি চল নীতা, অনেক দিন পর সনৎ এসেছে।

নীতা মায়ের কথায় একটু অবাক হয়ে ওর সঙ্গে রান্নাচালার দিকে এগোল!

মাধবমাস্টার একাই বসে আছেন ঘরে। কাজে মন বসে না। চুপ করে তামাক টানছেন, ছিটে বেড়ার দেওয়ালে একটা চালকুমড়ো লতা জড়িয়ে রয়েছে সবুজ বেষ্টনিতে। আজ জীবনের প্রান্তে এসে বেহিসেবী মন ভাঙ্গা হিসেবের টুকরো জোড়াবার বৃথা স্বপ্ন দেখে। সারা জীবনটাই অপচয় করে এসেছেন, কাটিয়েছেন পরের ছেলেকে মানুষ করে। কিন্তু বুকই পুড়েছে প্রদীপের, চারি দিকে আলো বিকীর্ণ করে, নিজের জড়-দেহটার পা বেয়ে গড়িয়ে পড়েনি প্রদীপের তেল—পিলসুজের নীচের মত অন্ধকার কোন দিনই ঘোচে নি।

শঙ্কর পড়া ছেড়ে দিল, মণ্টুও পড়বে কতদূর কে জানে? খেলা নিয়েই ব্যস্ত। গীতাও কেমন এক অন্য ধরনের। ওদের পরিণতি কি তা ভেবেও শিউরে ওঠেন তিনি। রাস্তাঘাটে ট্রেনে, ওই ধরনের মেয়েদের দেখছেন। নির্লজ্জ ভঙ্গীতে চলেছে তারা! বেপরোয়া। সভ্যতার নাম যে এই তা ভাবতে পারেন না তিনি।

দিন কাল কি হল দেখতে দেখতে। পীরগঞ্জের সবুজ ছায়াঘেরা দিগন্তসীমা, মধুমতীর তীর আজ স্বপ্নে পর্যবসিত হয়েছে, নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

জীবনের সবই বাজে খরচের খাতে বয়ে গেছে। জমা? জমারঘরে যেন একটা শূন্যতা! কোন আঁচড়ই তাতে নেই।

হুঁকোর আগুনটাও নিভে গেছে। আবছা অন্ধকারে গুম হয়ে বসে আছে মাধবমাস্টার। সংসারের বাতিল একটি প্রাণী মাত্র।

কাদম্বিনী আশা হারায় নি। সনতের উপর তার হঠাৎ আজ যেন নতুন আশার উদয়

হয়েছে। অন্য আশা। সংসারের আবশ্যকীয় প্রাণী আজ নীতা। সংসার তাকে ছাড়তে পারে না। জীবিকার সংস্থান করে সে। রূপ! রূপের দিক থেকেও সে দেউলিয়া, সনতের মত এমন ছেলের সঙ্গে যদি গীতার সম্বন্ধ হয় কাদম্বিনী একটা মহা দায় থেকে উদ্ধার পাবে।

কি যেন ভাবছে কাদম্বিনী।

গীতা সাজগোজ করে বেরুবার যোগাড় করছে, কি এক অন্য জগতের নেশা তার মনে। সদ্যচেনা সেই জগৎ, গানের সুর আর মুক্ত সবুজ দিগন্তের বুকচেরা পথ ধরে ছুটে যাওয়া, একটু হাসি, স্পর্শ! গীতার সদ্যজাগর বুভুক্ষু মনে আদিম তৃষ্ণা এনেছে।

তাই ছুটে চলেছে গীতা, জল না মরীচিকা জানে না। তবু ছুটছে নেশার ঘোরে। গলায় ঘাড়ের নিচে পাউডারের পাফটা বোলাতে বোলাতে মায়ের ডাকে জবাব দেয়—আঃ যাচ্ছি! কোন কাজ করতে পারবো না বলে দিচ্ছি কিন্তু।

মা রান্নাঘরে নীতাকে নিয়ে বসেছে। লুচি বেলছে নীতা, মা ভাজছে।

গীতাকে ঢুকতে দেখে কাদম্বিনী চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে। রূপ এমনিতেই আছে গীতার, সামান্য প্রসাধনেই তা প্রকাশ পেয়েছে, ওর নিপুণ প্রসাধনের দিকে চেয়ে একটু আশ্বস্ত হয় মা।

—খাবারগুলো ওঘরে দিয়ে আয়, সনৎ কখন থেকে একা একা বসে আছে।

—তা আমি করবো কী? আমার বলে গানের রিহার্সাল শুরু হবে। জানো না বাবার ফেয়ারওয়েলে, ধুমধাম হবে স্কুলে?

কাদম্বিনী মুখে বিতৃষ্ণা আর অবজ্ঞার ভাব ফুটে ওঠে, ঠোঁট উলটে বলে—হুঁ!

অর্থাৎ একজনের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার মত নীচতাকে ওরা ফুলমালা পরিয়ে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে করণীয় মহৎ কাজ বলে ঘোষণা করতে চায়।

—নিয়ে যা খাবারগুলো। চা পরে নিয়ে যাবি।

ওর হাত দিয়ে চা খাবার পাঠিয়ে কাদম্বিনী রান্নাঘর থেকে বের হয়ে গেল। নীতা চুপ করে বসে থাকে। মা যেন কী একটা কাজে ব্যস্ত।

জানলার ফাঁক দিয়ে কাদম্বিনী চেয়ে আছে নির্লজ্জের মত ঘরের দিকে; সনতের চোখে মুখে কোন পরিবর্তন ফুটে ওঠে কিনা তাই দেখছে বোধ হয়।

গীতার সময় নেই। কোন রকমে চা-খাবারগুলো নামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—গানের ক্লাস আছে, চলি সনৎ দা!

সনৎ পড়ন্ত বেলার মিঠে রোদে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে; ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল মেয়ে। কাদম্বিনী গজগজ করতে থাকে।

কাজ সেরে নীতা ঘরে ঢুকছে। কদিন নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে সে।

সনৎ চেয়ে আছে নীতার দিকে। বেশবাসের কোন চাকচিক্য নেই। পরণে একটা আটপৌরে শাড়ি, এলো চুলে ঘাড়ের কাছে খোঁপায় বাঁধা; কালো চোখের তারায় হাসির মিষ্টি আভা।

বৈকালের সোনারোদ ম্লান হয়ে আসে।

সনৎ প্রশ্ন করে—পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

নীতা এতদিন শখের জন্যই পড়ছিল বোধ হয়। এবার সে প্রাণের দায়ে যেন পড়ছে। বি. এ. পাশ করতেই হবে তাকে। অনার্স পাবে কিনা সন্দেহ। তবু চেষ্টা করে চলেছে সে।

সনতের কথায় ম্লানভাবে হাসে। মিষ্টি, বেদনামধুর একটু হাসি।

—হচ্ছে একরকম। সময় পাচ্ছি কই?

—চল, দিনরাতই তো পড়ছো, একটু বেড়িয়ে আসবে স্টেশনের ওদিকে।

কি ভেবে উঠে দাঁড়াল নীতা। আধময়লা শাড়িখানাই ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উস্কোখুস্কো চুলগুলোতে চিরুনি বুলিয়ে স্লিপারটা খুঁজতে থাকে।

এই তার সাধারণ পোশাক, তবু সনতের মনে হয় কালো মেয়েটিকে এই সাধারণ রূপেই সুন্দর দেখায় সবচেয়ে বেশি।

—একটু আসছি মা।

কাদম্বিনী নীতার কথায় জবাব দিল না, গীতা আগেই বের হয়ে গেছে। কাদম্বিনী মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। সনৎ যাবার মুখে বলে যায় ঃ—চলি মাসিমা!

কোনরকমে ভদ্রতাটুকু রাখবার চেষ্টা করে কাদম্বিনী—এসো আবার।

এগিয়ে আসে দরজা পর্যন্ত। ওরা বের হয়ে যেতেই চুপ করে দাঁড়াল, কার উপর রাগ করবে জানে না। গীতার উপর না নীতার উপর ঠিক বুঝতে পারে না কাদম্বিনী।

নীতা পিছন ফিরে দেখে মা কেমন যেন বিশ্রী ভাবে তাদেব দিকে চেয়ে আছে। ওর এই বেড়াতে বেরুনোটা ঠিক যেন পছন্দ করে না মা।

কি ভেবে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলে নীতা। তার মনে একটা ঝড় উঠেছে। একটা বাধার অস্তিত্ব জেগে উঠেছে নীতার মনে। হু হু ঝড় ওঠে তাই।

এককালে ছিল পরিত্যক্ত মাঠ। এখন গড়ে উঠেছে উপনিবেশ। মাঝে মাঝে তৈরি হয়েছে কোঠাবাড়ি, টিনের চাল দেওয়া দরমার বাড়ি। মুলিবাঁশের বেড়ায় উঠেছে কুমড়োলতা; কোথাও বা মস্ত জলা। দু'একটা আম নারিকেল গাছ ছিটিয়ে রয়েছে, গড়ে উঠেছে কলাবাগানের সবুজ আবরণ। এঁকেবেঁকে খালটা চলে গেছে লাইনের দিকে; আবছা অন্ধকার ঢাকা আকাশ—গাছগাছালি পাখির ডাকে ভরে ওঠে চারিদিক। নিকানো আকাশের আঙিনায় দু-একটা করে তারা ফুল ফুটে ওঠে।

একটা শান্ত নিথর পরিবেশ। ওরা বসে আছে দু'জনে। সনৎ আর নীতা। কাছাকাছি দুটি সত্তা যেন চিন্তায় একাত্ম হয়ে গেছে।

সনতের সামনে একটা সমস্যা। এতদিন অভাব অভিযোগেব মধ্যে পরের সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করেছে। আজ তার সামনে একটু স্বস্তির সন্ধান। একটা চাকরি-বাকরি, একটু ছোট্ট বাসার আভাস তার মনে ফুটে ওঠে।

নীতা বলে ওঠে—ভাববার এত কিছু নেই। এখনই চাকরি করবে না, আরও পড়বে, রিসার্চ করবে। যদি পি. এইচ. ডি হতে পারো তখন চাকরির অভাব হবে না। আর দু'একটা বছর কষ্ট করো।

—কিন্তু সে তো অনেক খরচাও।

নীতার মনে দৃঢ়তার ছায়া; সামান্য পাওয়াতে সে তৃপ্ত নয়। জীবনের সব কঠিন বাধা উত্তীর্ণ হয়ে সে মহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখে, সাধনা করে। বলে ওঠে—কিছু টাকা স্টাইপেণ্ড পাবে, বাকি যদি আমি চাকরি নিই তার থেকে যাহোক করে হোক manage করা যাবে।

নিঃসঙ্কোচে বলে নীতা। সনতের বাধ বাধ ঠেকে।

—তোমার টাকা? কত নেব বলতে পারো?

নীতা ওর দিকে চাইল; গোধূলির শেষ আলোয় কালো আকাশের বুকে তখনও গাঢ় লাল আবীরের আলপনা; কালো মেয়েটিকেও সুন্দর দেখায়। ওর দু' চোখের চাহনিতে নিবিড় একটি

আমন্ত্রণ। ওর হাতখানা তুলে নিতে নীতা বলে ওঠে—নেবার মত একটা পরিচয় পাকাপাকি গড়ে তুলো তখন।

সনৎ কি ভাবছে। কোথায় রাতের প্রথম আঁধারে ডাকছে পাখি; জোনাকির আলো আশপাশে ঘুরে বেড়ায়।

অবাক হয়ে গেছে সে ওর দ্বিধাহীন আত্মনিবেদনের সুরে। দীর্ঘ দশ বছর দেখে এসেছে নীতাকে; মেয়েরা বোধহয় এমনিই। প্রথমে দ্বিধা-সংকোচ থাকে, কিন্তু যাকে আপন করে নেয় তারা, সেখানে কোন ফাঁক আর ফাঁকি থাকে না। নীতা আজ নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে আসতে পেরেছে।

—কেন, ভয় পাচ্ছো নাকি? নীতার দু'চোখে হাসির আভা।

মিষ্টি এক ঝিলিক হাসি। ওই শীর্ণ পরিশ্রান্ত মেয়েটিও আজ সুন্দর আকর্ষণীয় করে তুলেছে নিজেকে, মনের অতলের আনন্দ আর সুরের পরশে।

রাতের আঁধারে জাগে বকুলগন্ধ; সনৎ যে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

নীতার মনে প্রথম যৌবনের সাড়া; বলে চলেছে—পরে না হয় শোধ দিও। কোথাও বেড়িয়ে আনবে।

—কোথায়?

—দূরে! অনেক দূরে! ধরো কোনও পাহাড়ের রাজ্যে। উঁচু মেঘছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড় আর ঘন সবুজ পাইন বন। পাইন বন ঝড় উঠবে। মাতাল ঝড়। ... হঠাৎ হেসে ফেলে নীতা; হাসছে! নিজের আকাশছোঁয়া কল্পনায় নিজেই হাসছে। সনৎ হঠাৎ ওর হাসি দেখে চেয়ে থাকে ওর দিকে। গলার সুর হালকা করে বলে ওঠে—নীতা।

—মাঝে মাঝে কি যে আজে-বাজে স্বপ্ন দেখি। মাথা-ও নেই মুণ্ডু-ও নেই! মাগো।

—কেন? সেখানে যাওয়া কি সম্ভব নয়? তুমি আর আমি। আমি তোমায় নিয়ে যাবো নীতা।

সনতের মনে একটা বাস্তব স্বপ্ন, নীতা কি যেন ভাবছে।

শন শন জাগে রাতের বাতাস, তারার প্রতিবিম্ব দুলছে খালের জলে।

—নীতা!

সনৎ ওকে কাছে টেনে নেয়, সব বাধা আজ দূর করে দিতে চায়। চমকে উঠেছে নীতা। ... ওর হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। হঠাৎ ওর ঠোঁটে লাগে উত্তপ্ত স্পর্শ; উষ্ণ নিঃশ্বাস ছোঁওয়া দেয় ওর গালে। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে নীতা।

দু' চোখ বুজে আসে। প্রতিবাদ করতে চায় না যেন, এটুকু নিঃশেষে পেতে চায় সে।

—ওঠো! রাত হয়ে এলো।

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে আসে তারা, সিগন্যালের নীল আলোটা মিটিমিট জ্বলছে।

মাধববাবু হ্যারিকেনের আলোয় বসে একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে বই লিখে চলেছেন একমনে। তামাক সেজে নিয়ে কাদম্বিনীকে ঢুকেতে দেখে একটু অবাক হন। কাদম্বিনী আজ কাজকর্ম সেরে একটু কথা বলবার জন্য এসেছে!

—তুমি! ও!

কল্কেটা হুঁকোসমেত ওঁর হাতে তুলে দিয়ে কাদম্বিনী বসলো। মাধববাবু ঠিক বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা।

বলে চলেছে কাদম্বিনী—সনৎ ছেলেটি বেশ! ক'বছরেই মানুষ হয়ে উঠেছে। শুনছিলাম চাকরি-বাকরির খোঁজও আসছে। আসবে না? এম. এ পাশ। লুফে নেবে ওকে কত অফিস থেকে।

মাধববাবু মাথা নাড়েন—উহুঁ! কেরানীগিরি কি করবে? জুয়েল একটা, থিসিস সাবমিট করুক ও। পি. এইচ. ডি হবে। আমি বলে দিয়েছি চাকরি-বাকরির মোহে পড়ো না বাপু, পড়াশোনা করো।

কাদম্বিনী হঠাৎ ফোঁস করে ওঠে—হ্যাঁ, আর তোমার মত পচে মরুক। ওই স্বভাব কি কোন দিনই বদলাবে না? নিজে ভুগছো সেই ভালো, আর পাঁচজনকে ওই জাহান্নামে টানা কেন?

মাধববাবু চুপ করে কাদম্বিনীর দিকে চেয়ে থাকেন।

আর কথা বলা নিরাপদ নয়, এখুনিই শুরু হবে নানা কথা। মাধববাবু এসব ক্ষেত্রে চুপ করেই থাকেন শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে।

কাদম্বিনী বলে চলেছে—গীতার সঙ্গে ওকে মানাবে বেশ। আর দুটিতে ভাবসাবও খুব মনে হয়।

মাধববাবু কোন কথাই বলেন না। কাদম্বিনীর শীর্ণ দারিদ্র্যপীড়িত চেহারায় ক্ষণিকের জন্য একটা দীপ্তি ফুটে ওঠে। একটু হেসে বলে চলে—এমন সোনার চাঁদ ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা। আর দেখতে শুনতে গীতাই বা মন্দ কি। তুমি বাপু বাগড়া দিও না। সনৎ চাকরি-বাকরি যদি ভাল পায় নিক! মেয়েকে বিদেয় করে আমরাও স্বস্তি পাই।

মাধববাবু মনে মনে শিউরে ওঠেন, মুখেচোখে একটা বিবর্ণতা ফুটে ওঠে। কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ দরজার কাছে নীতাকে দেখে থামলেন।

নীতা ঘরে ঢুকছিল, অজানতেই সামনে একটা সাপ দেখে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। মায়ের কথাগুলো শুনেছে সে, পায়েব নিচে থেকে সরে যাচ্ছে মাটি । সারা মনে কেমন হাহাকারভরা শূন্যতা। নিজের কালো কুৎসিত রূপের কথা ভেবে মন গুমরে কেঁদে ওঠে। একটা নিষ্ঠুর কালো দৈত্য তার কাছ থেকে সব যেন ছিনিয়ে নিতে চায়,তাব সব সঞ্চয়।

কাদম্বিনী তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর তীব্র নগ্ন দৃষ্টির সামনে নীতার মনের সব হতাশাই প্রকাশ পায়। কাদম্বিনী বৈকালে ওর সনতের সঙ্গে বের হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করে নি। মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, ওর দৃষ্টিতে এখনও ফুটে ওঠে সেই রাগের জ্বালা।

নীতা চোরের মত সরে গেল ওর কঠিন দৃষ্টিপথ থেকে, নিজের বিক্ষত মনের দৈন্য অপরের সামনে প্রকাশ করার দুর্বলতা সহ্য করতে পারবে না সে; সরে গেল তাই।

মাধববাবু অবাক হয়ে যান নীতার ব্যবহারে। হুঁকোটা নামিয়ে কি ভাবছেন। সনৎ আর নীতা!

দু'জনকে যেন বারবার একই সত্তার পৃথক অস্তিত্ব বলে মনে হয়। মাধববাবু বলেন—এ ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখো বড়বৌ।

—ভাববার কিছুই নেই। এমন ছেলে মিলবে না আর। বুঝলে!

মাধববাবু স্ত্রীর দিকে নির্বাক বেদনাহত ভাবে চেয়ে থাকেন।

নীতা চুপ করে ঘরে বসে আছে। একজনকে ঘিরে তার সব আশা ভরসা স্বপ্ন যেন ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। ওর গালে তখনও সনতের উষ্ণ চুম্বনরেখার স্পর্শ মিলিয়ে যায় নি।

মনে কোথায় একটা সুর বাজে! আঁধারতল থেকে জেগে ওঠে একটা সুর, মনের সঙ্গোপনে মধুর স্পর্শের সুর। দুঃখের মধ্যেও আশা জাগে—সান্ত্বনা জাগে।

ওদিকে গীতা আর মণ্টুর মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে চুলোচুলি হবার উপক্রম। পিঠোপিঠি ভাইবোন। গীতা অকারণেই বলে ওঠে—ফোথ্ ক্লাস! ফোথ্ ক্লাস বারো আনা।

ওই ব্যাপারটা গীতা নিজে দেখেছে সহরতলীর কোন সিনেমা হাউসের পাশে এবং সে দলে মণ্টুও নাকি ছিল।

মণ্টু লাফ দিয়ে ওঠে—মারবো এক রদ্দা, মুখের জিওগ্রাফি বদলে দোব। চোর কোথাকার! কেন আমার পয়সা নিবি তুই?

—ইস্! গীতা বঙ্কিম ভঙ্গিতে রুখে দাঁড়িয়েছে বইপত্র ফেলে।

কাদম্বিনী আজ গীতার ব্যবহারে বেশ চটে রয়েছে। সনতের সঙ্গে ভাল করে কথাই কয়নি মেয়ে। অন্য কিসের মোহে যেন বেভুল হয়ে আছে গীতা। ধমকে ওঠে কাদম্বিনী।

—হাঁদা মেয়ে কোথাকার! যেমন পড়াশোনায় গবেট তেমনি সব দিকেই। ওর পয়সা নিয়েছিস কেন? আর তুইবা পয়সা পেলি কোথায় মণ্টু!

গীতা বলে ওঠে—পয়সা? ওমা, জানো না বুঝি? কলোনির মাধু-অসীমের সঙ্গে গিয়ে জয়শ্রী সিনেমায় টিকিট ব্ল্যাকমার্কেটে বেচে ওরা। ফোথ্ কেলাস ফোথ্ কেলাস। মণ্টু রাগে ফুলে উঠেছে। হঠাৎ ফেটে পড়ে গীতার কথায়।—আর তুই? বলবো? সেদিন মিত্তিরদের গুপীদার সঙ্গে লক্কা পায়রার মত—

—থাম মণ্টু! মা বকে ওঠে।

তবু কাদম্বিনী মনে মনে চমকে ওঠে; মিত্তিরবাড়ির ছেলে-মেয়েদের নানান বদনাম। নানা কারবার থেকে শুরু করে নানা ভাবে জীবিকা অর্জন আর দিনাতিপাত করে তারা। কলোনির মধ্যে ওদের চালচলন সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ। নিজের মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে তাদের কথা উঠতেই শিউরে ওঠে সে। গীতার দিকে চাইল। গীতা লাফ দিয়ে উঠে মণ্টুকে ধরতে যায় চীৎকার করে।—মিথ্যুক,—মিথ্যাবাদী কোথাকার! গীতা কি লুকোতে চাইছে মায়ের কাছ থেকে।

—কোথা গিয়েছিলি মুখপুড়ী?

আজ বৈকালে তার সব আশায় ছাই দিয়ে ও মেয়ে কোন চুলোয় গিয়েছিল তা বেশ বুঝতে পারে। আজবাদ কাল মেয়ের বিয়ে দেবে, সেই মেয়ে কিনা ঢলিয়ে বেড়াচ্ছে আজও। মা ধমকায়—বেসরম মেয়ে, যাবি আর কোনদিন? তাই বুঝি এত সাজগোজ। আজ বাদ কাল কিনা বিয়ে দিতে যাচ্ছি ওই মুখপুড়ীর!

গীতা বলবার চেষ্টা করে—গান শিখতে গিয়েছিলাম।

—গান! একজন গান গেয়ে সংসারকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে, আবার সেই গান! খবরদার যাবি না।

খপ্ করে মা তার চুলের মুঠিটাই ধরেছে।

—মা! নীতা গোলমাল শুনে বের হয়ে এসেছে। বলে ওঠে—এতবড় মেয়ের গায়ে হাত তুলবে?

—তবে কি দুধকলা খাওয়াবো? ছিঃ ছিঃ। সবই আমার বরাত। এক-এক জন এক-

এক পদের! জানলে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে শেষ করে দিতাম। হবে না-ই বা কেন? যা দেখবে তাই তো শিখবে।

চমকে ওঠে নীতা। মা যেন তাকে শোনাবার জন্যই কথাগুলো বলছে। কাদম্বিনী আপন মনেই বলে ওঠে—লোকে কি কিছু দেখতে পায় না? এত রাত অবধি বাইরে ছিলি কোথায়? এক ভাবি—হয় এক!

মণ্টু গীতা চুপ করে গেছে। ওরা মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। দিদিকে নিয়ে পড়েছে মা। কাদম্বিনী বকে চলেছে—এ বাড়িতে আর লক্ষ্মী থাকবেন না কোনদিন। সব শান্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ছিঃ ছিঃ এত অনাচার!

নীতা সরে এল ঘরের ভিতর।

মায়ের উপর রাগ হয়। এই হীন মন্তব্যের জবাব সে দিতে পারে এখনই। সনৎকে নিয়ে এই ঘৃণ্য ইঙ্গিতের জবাব।

কলোনির অনেক মেয়েই কী ভাবে জীবিকা অর্জন করে তা সে জানে। দত্তদের বাড়ির লতিকা, রেলপারের মল্লিকা আরও কত জন শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরে। তাদের জীবিকার পথ কত অন্ধকারে ঢাকা তা তার জানতে বাকি নেই।

আর সে! স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই পরিচিত হতে পারে ইচ্ছে করলে। এ তার ভুলই যদি হয়—সামান্য এই ভুলটুকুও ক্ষমার চোখে দেখেনি মা!

মনের সব শ্রী আজ কুশ্রী হয়ে উঠেছে। জীবনের সব আনন্দের ভোজ থেকে সে বাতিল একটি প্রাণী, সংসার আর অপরের জন্যই তার এই উদয়াস্ত পরিশ্রম। জীবনের কোন সৌন্দর্য, কোন ভবিষ্যৎ স্বপ্নে তার অধিকার নেই। মা যেন বিকটাকার দানবের মত তার চাওয়া-পাওয়ার সব পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। নইলে তাকে প্রশ্ন না করেই সনৎকে নিয়ে গীতার জন্য ভাবতে পারতো না। মা হয়তো সব কিছু জেনেশুনেই এড়িয়ে গেছে—নীতাকে তাদের প্রয়োজন বলেই ছাড়তে নারাজ।

একটা সুর উঠেছে রাত্রির আকাশে। তারাজ্বলা আকাশকোণে কেঁপে কেঁপে স্নিগ্ধ প্রদীপশিখার মত উঠছে ওই সুরের রেশ। জ্বালাভরা মনে একটা শান্তির ক্ষীণ আভাস আনে। ঊষর প্রান্তরে যেন নেমেছে বৃষ্টির ধারাপাত। তৃপ্ত হয়ে উঠেছে শুষ্ক সবুজ স্বপ্ন বাধা বন্ধ্যা মৃত্তিকায়।

গান গাইছে শঙ্কর। স্তব্ধ রাত্রির রাগ। নীতার দু'চোখে জল নেমেছে।

নামুক। ধুয়ে মুছে যাক সব চিহ্ন, অভিসারিকার চোখের কাজলরেখা! একাই চলবে সে সারা পথ, জীবনের দীর্ঘ বন্ধুবিহীন বন্ধুর পথ।

গুপী মিত্তির মাধু সেন আরও কজন ছেলের উৎসাহে আর মাস্টারদের সহযোগিতায় মাধববাবুকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার আয়োজন করা হয়েছে স্কুলের মাঠে। চিত্র-বিচিত্র জামাপরা গুপী তদারক করছে সব কিছু। দেবদারু পাতা, কলাগাছ, মঙ্গলঘট সহ ঘটা করে বিদায় দেবার কোন আয়োজন তারা বাকি রাখেনি। সব কিছুই রয়েছে। গুপী আড়ালে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

কে বলে ওঠে—অ্যাই হেডমাস্টার মশায় আসছে।

গুপী সিগারেট কসে টানতে থাকে, বলে ওঠে—এখন আর ছাত্র নই বাবা, ওর ইজ্জতের দাম স্রেফ দু'পয়সা। ফেলে দিলে সিগ্রেটটাই যাবে—এখনও কোম্পানি পোড়েনি যে রে?

সদ্যধরানো সিগ্রেটের অর্ধেকটা শেষ হয়েছে মাত্র। কোম্পানির নাম লেখা জায়গাটা অবধিও এখনও পোড়ে নি। মাস্টার মশায় ভাগ্যক্রমেই এগোলেন না ততদূব। বোধহয় ভূতপূর্ব ছাত্রদের গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে নিজেই সরে গেছেন।

ওদিকে ফাংশন শুরু হয়েছে! ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় পরেশকেও। গুপী বলে ওঠে—কিরে, আজ ডিউটিতে যাবি না? হাতকাটা তেল—আশ্চর্য মলম?

বেশ একটা ব্যঙ্গই ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে।

হাসে পরেশ—না। মাস্টার মশাইকে প্রণাম করতে এলাম।

—খুব যে ভক্তি, যা চাট্টি বেশি ধুলো নে। বলি মতলবটা কি খুলে বল দিকি?

—এমনিই। পরেশ গুপীর এই সন্ধানী দৃষ্টির সামনে যেন কেঁচো হয়ে যায়।

হাসছে গুপী। এইবার চুড়িওয়ালার ব্যবসা ধব; ফেরিওয়ালা থেকে চুড়িওয়ালার ব্যবসা ঢের লাভের। বুঝলি?

সরে গেল পরেশ।

গুপীর চেলা মদন এসে খবর দেয়—না; এলো না গীতা।

একটা হতাশার খবর! গুপী চমকে ওঠে—কেন?

—বাড়িতে ওর মা নাকি নিষেধ করেছে। বিয়ে-থা হবে, এ সময় বেরুতে দেবে না। একেবারে নজরবন্দী করে রেখেছে।

গুপীর চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে। সিগারেটের স্বাদও পানসে ঠেকে। গজগজ করে—ধ্যাত্তোর! শ্লা খামোকাই তালে এত খাটাখাটনি করে মালা দিলাম ওই বুড়ো ঘাটের মড়াকে? ঘু ঘু মেয়ে দেখছি! কাজ সারা হল আর ওমনিই ফুঃ।

মদনা বলে ওঠে—আগেই জানতাম ইসের খবর। সনৎ না কে ওই যে আসে ওদের বাড়ি, এম-এ পাশ—

ধমকে উঠে গুপী—রাখ তোর এম-এ পাশ। ঢের দেখছি। আচ্ছা আমিও গুপী মিত্তির। বরিশালের লোক বাবা, আইতে শাল যাইতে শাল তবে জানবা বরিশাল। দেইখা লমু।

গুপী সিগারেটটা ফেলে দিয়ে হন হন করে চলে গেল।

মাধবমাস্টার আজ ছেলেদের সামনে শেষ অভিভাষণ দিতে উঠেছেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত জীবনের দিনগুলো। কত মুখ, কত স্মৃতি একটার পর একটা জেগে ওঠে, সব যেন ঘুলিয়ে যায়।

কাল থেকে আর স্কুলে আসবেন না তিনি। চল্লিশ বছরের মাস্টারি জীবনে যবনিকা নামল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, শীর্ণ কোটরাগত চোখ দিয়ে জল নামে। আবেগকম্পিত স্বরে তিনি বলে চলেছেন—সত্য আর জ্ঞানের আলোয় তোমাদের মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, এই দুর্দিনের মাঝেও আমাদের বাঁচতে হবে। সেই বাঁচবার পথ দেখাবে প্রকৃত শিক্ষা আর জ্ঞান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা জয়ী হও, সার্থক হও।

চোখ মুছে বসলেন বৃদ্ধ মাধবমাস্টার।

একদিনেই তাঁর বয়স যেন বেশ কয়েক বৎসর বেড়ে গেছে। চলমান জীবনের ভিড় থেকে তিনি সরে যাবেন। কোন ঠাঁই আর তাঁর নেই এই নিজের হাতে গড়া স্কুলে। প্রথম জলাভূমি আর জঙ্গল কেটে ইস্কুলপত্তন যাঁরা করেছিল তিনিও তাদের একজন।

সন্ধ্যা নামছে। কলরব কোলাহল করে ছেলের দল চলে গেল। আকাশে দু-একটা তারা ফুটে উঠেছে। পথে নামলেন মাধববাবু।

—মাঝে মাঝে আসবেন মাস্টারমশায়! আপনাদের হাতে গড়া স্কুল।

ছোকরা হেডমাস্টার আমন্ত্রণ জানায় তাঁকে। মাধববাবুকে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছেন তিনি। হাসেন মাধবমাষ্টার—না, না আসব বৈ কি বাবা। পরামর্শও দরকার। তোমরা তো ছেলেমানুষ, চল্লিশটা বছর এই কর্ম করলাম। ধর তোমার বয়েসীই মাস্টারি হবে আমার।

—তা বটে। একা যেতে পারবেন তো? অন্ধকার হলো।

চমকে ওঠেন মাধববাবু; বৃদ্ধ হয়েছেন—পথ চলতেও যেন অক্ষম তিনি, এই কথাটা আজ ওদের মনে গেঁথে রয়েছে। একান্ত অসহায় মনে করে তাঁকে। বলে ওঠেন তিনি—না না। চেনা পথ। ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে।

অন্ধকারেই এগিয়ে গেলেন তিনি। জীবনের অন্ধকার ঢাকা বন্ধুর পথে হাতড়ে চলছে একটি বাতিল মানুষ। চলতে যেন পারে না।

রাত্রির আঁধার নেমেছে বাড়িতে। নীতা গুম হয়ে পড়েছে। সামনে তার পরীক্ষা। পড়ার চাপ পড়েছে; এত পরিশ্রমের পর পড়তে শরীর বয় না —তবু পড়তে হয়। গীতা গান গাইছে—গুপী মিত্তিরের শেখানো আধুনিক গান। হালকা সুর উঠেছে, জানলাটা বন্ধ করে নীতা ধমকে ওঠে— চুপ কর গীতা।

কাদম্বিনী সাড়া দেয়—শঙ্কর হ্যা হ্যা করলে তখন কানে বাজে না, বাজে এখনই! একটু গান গাইলে তোর এত কি অসুবিধা হয় বাপু? কেবল ওর পিছনেই লাগা।

নীতা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পড়তে বসে।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ কানে আসে। আঁধার রাতের বাতাস ওঠে শিউরে, কাঁপছে তারার রোশনি। গীতার গান থেমে গেছে। কাদম্বিনী চীৎকার করে কাঁদছে। ধড়মড় করে উঠে বাইরে এল নীতা।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় দেখে পরেশ, আরও কজন লোক ধরাধরি করে মাধব মাস্টারের অচেতন দেহটাকে তুলে এনেছে।

অন্ধকারে আসছিলেন—রেল লাইনের ধারেপাশে সিগন্যালের তারে পা লেগে পড়ে যান মাধববাবু লাইনের উপর। শক্ত পাথরে ছেঁচে গেছে জায়গা জায়গা, মাথায় চোট লেগেছে—জামাকাপড়ে রক্তের দাগ। জ্ঞান তখনও ফেরেনি।

কাদম্বিনীকে থামাবার চেষ্টা করে নীতা— চুপ করো মা। এখন চেঁচামেচি না করে স্থির হও।

পরেশ জল এনে মাথায় দিচ্ছে। কে পাখা করতে শুরু করেছে।

নীতা-ই স্থির মস্তিষ্কে এগিয়ে আসে, সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেয়। বলে ওঠে—মণ্টু ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আন্ এখুনি।

ক্রন্দনরতা কাদম্বিনীকে ধমকে ওঠে নীতা—মা!

মাধববাবু চোখ বুজে পড়ে আছেন। রাতের অন্ধকারে মুখ বুজে সকলেই কী এক নির্মোঘ বিধানের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে।

সংসারের রূপ এক মুহূর্তেই বদলে গেছে কাদম্বিনীর কাছে। নীতার চোখের সামনে অন্তহীন অন্ধকার, যেন ঢেউ-এর মাথায় ভেসে চলেছে হালভাঙ্গা পালছেঁড়া এক নৌকা, কোথাও পারের নিশানা নেই। চারিদিকে তার উদ্দাম ফেনাভরা ঢেউ-এর মত গর্জন। ছোট সংসারের জীর্ণ নৌকাখানাকে বানচাল করে দেবার উন্মত্ততা ওর চারিদিক ঘিরে।

ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। নিবিষ্ট মনে নাড়ীটা দেখে চলেছেন তিনি। চোখমুখে তাঁর উৎকণ্ঠা।

ব্যাকুল কণ্ঠে পরেশ প্রশ্ন করে—ডাক্তারবাবু।

—দেখি কি করা যায়। তবে এত বেশি বয়সে স্ট্রোক একটু বিপদের কথাই।

নীতার চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসে। তবু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

সনতের মনে আজ একটা দ্বন্দ্ব জাগে। একদিকে পরিশ্রম, দুঃখভোগ। মহত্তর জীবনের সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, সে পথের প্রান্তে কি আছে তাও জানা যায় না। নীতার মুখখানা আবছা মনে পড়ে। অনিশ্চিতের মধ্যে ওই একটু পথ।

অন্যদিকে ছোট একটা চাকরি, একটু মনোমত বাসা আর?...

একজনকে অকারণেই মনে পড়ে বার বার। কলেজ স্কোয়ারের আলো-আঁধারির মাঝে দেখা একটি নতুন মুখ,—দুটি চোখের নীরব আমন্ত্রণ। মরু-তীর হতে কোন্ সুধাশ্যামল জগতের আহ্বান। একটি মুহূর্তে তার অবচেতন মনে এমনি গভীর অতর্কিত একটি রেখাপাত করে রেখেছে ভাবতে পারে নি সে। ক্রমশঃ সেই উজ্জ্বল স্মৃতির স্পর্শ মনকে তার ছেয়ে ফেলেছে।

মন থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সনৎ। নীতার মুখখানা মনে জেগে ওঠে আবার।

—এই যে আছেন দেখছি।

এ মেসের ম্যানেজার শীতল নায়েক ঘরে ঢুকলো। কোন কোম্পানির টাইপিস্ট, ঢলঢলে চেহারা, একটু নেওয়াপাতি ভুঁড়িও গজিয়েছে। হাতে রেমিংটন কোম্পানির রিবনের খালি কৌটো ভর্তি বিড়ি আর দেশলাই। যেন দয়া করে নিচেতলার চাকরদের এঁদো ঘরখানায় ঢুকছে শীতলবাবু।

স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা—ও কোণে চালের বস্তার উপর কয়েকটা আরশোলা ঘুরছে, উড়ছে ফরফর করে। এই সনতের রাজ্য। ওকে দেখে অভ্যর্থনা জানায় সনৎ—আসুন, আসুন!

—না এসে আর কি কবি বলুন দিকি? হপ্তার ছদিন ঘানি গাছে ঘুরি, সাতদিনের দিন বাড়ি যেতে হয় বটে। ঘরবাড়ি তো রইছে মশায়, রিফুজী লই তো। সাত ঝামেলা মালি মোকদ্দমা জমি জারাত নিয়েই লবেজান হইছি। তা আপনার ডিউসটা? আজ্ঞে গতমাস থেকেই পড়ে রইছে। আপনারা লেখাপড়া-জানা লোক, আমাদের মত ঘোড়ার পাতা বিদ্যে নিয়ে হ্যামারম্যানগিরি তো করেন না। দিয়ে দেন কেন্নে! ফেলাই দ্যান, লিয়ে যাই।

—শীগগীর মিটিয়ে দোব এইবার। সনৎ আমতা আমতা করে। নিজেরই বিশ্রী ঠেকে ওই কথাগুলো। শীতল নায়েক জবাব দেয় তখুনিই।

—সে তো ঢের দিন থেকেই শুনছি; পড়াশোনা করছিলেন। এতদিন চুপ দিয়ে ছিলাম। ইবার এম-এ পাশ দিয়েও ঠায় বসে থাকবেন—আর আমরা বইবো খাইখরচা? ইটা কেমন কথা? লেগে যান কেন্নে চাকরিতে।

কথাটা চুপ করে শোনে সনৎ। পাশ করার পরই চাকরি, এই তাদের কাছে সোজা পথ। এর মধ্যে আবার অন্য কি করণীয় কাজ থাকতে পারে ছাপোষা শীতল নায়েক জানবে কি করে!

—তালে কালই দিছেন? সোজা কথা বলুন মশায়৷ নালে অন্য মেম্বর দেখতে হবেক। মেম্বরের কি ভাবনা? এত টাকা বকেয়া ফেলে দু'বেলা খেয়ে যাবেন?

সনং কি ভাবছে। নীতার কথা, কিছু টাকা আপাততঃ যদি পায় পরে টুইশানি নিয়েও শোধ করবে। তবু কষ্ট করেই দেখবে সে আরও দু-বছর।

জবাব দেয়—দু-এক দিনের মধ্যেই মিটিয়ে দোব।

—হ্যাঁ, তাই দেন। নালে—

শীতল নায়েক বাকি কথা শেষ করলো না, খড়মের শব্দ তুলে উপরে উঠে গেল। বাইরে আরও ক'জন মেসের লোক অপেক্ষা করছিল, তারা কি বলাবলি করে চাপা স্বরে। সনতের ধৈর্য যেন ফুরিয়ে আসছে।

কি একটা দুঃসহ জ্বালা তার মনে। একটা পথ তার চাই, নিজেকে আজ অত্যন্ত দুর্বল অসহায় মনে হয়। চাকরির সন্ধানও পেয়েছে। তবু শেষ চেষ্টা করবে সে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সনৎ।

মাধববাবুর সংসার কদিনেই শ্রী-হীন হয়ে গেছে। পঙ্গু বৃদ্ধ, ঝড়ে ভাঙা শুকনো বটগাছের মত কাগুসার হয়ে কোন রকমে জীবন্মৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আগে বাইরের ঘরখানায় ছাত্র ধরতো না—এখন দু-একজন মাত্র টিকে আছে। টুইশানি করে বেশই রোজগার হতো, এখন ছাত্ররাও চালাক হয়ে গেছে। নবীন মুদীর ছেলে আজ টাকা ক-টা দিয়ে বলে গেল—কাল থেকে আর আসবো না মাস্টারমশাই।

—অ্যাঁ! মাধববাবু ওর দিকে চেয়ে আছেন। অক্ষম-পা-খানাকে টেনে সোজা করবার চেষ্টা করেন।

নবীন ব্যবসাদার লোক, তাক বুঝে পয়সা ছাড়ে। প্রথমতঃ স্কুল থেকে ছেড়ে এসেছেন মাধববাবু, অন্যান্য স্কুলের মাস্টাররা ছাত্রদের পরীক্ষার আগে ইম্পরট্যান্ট কোশ্চেন বলে দেন এবং সেগুলি পরীক্ষা পাশের বীজমন্ত্র। প্রত্যেক মাস্টার কোশ্চেন করবার সময় সহকর্মীদের বলে দেন, ইংরাজী মাস্টার বলেন অঙ্ক টিচারকে, অঙ্ক টিচারও সাজেশন দেন ইংরাজীর মাস্টারকে। তা ছাড়া ছেলে পাশ করুক ফেল করুক, ক্লাশ টেন অবধি গড়িয়ে উঠবেই তাঁদের হেপাজতে থাকলে। নবীনপুত্র ওটা বেশ বুঝেছে।

তাই বলে ওঠে—হেড পণ্ডিতমশায় বলছিলেন....

মাধবমাস্টারও ভিতরের এই চক্রান্তের ব্যাপার জানতেন। আজ অসহায় বৃদ্ধের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। চুপ করে থেকে সম্মতি দেন—বেশ তো। যাও।

নবীনপুত্র চলে গেল। একা বসে আছেন মাধববাবু, জীর্ণ স্থবির দেহ, মনটা তাই চঞ্চল হয়ে ওঠে অকারণে। চোখের সামনে দেখছেন সমাজের ছবি।

পীরগঞ্জের সেই শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা কোথায় হারিয়ে গেছে, মুছে গেছে সেই প্রীতি-ভালবাসার চিহ্ন, শুধুমাত্র দু'মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সমস্যাই আজ মনের সব কমনীয়তা, শুচিতাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

নীতার রোজগারেই সংসার চলছে। অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেও এম-এ ক্লাসে পৌঁছতে পারে নি। চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে। চাকরি আর টুইশানি। মাধববাবু দেশের ছেলেকে মানুষ

করেছেন; তাঁর মেয়ে এম-এ পাশ করবে—ডক্টরেট হবে এ আশাও আকাশকুসুম রয়ে গেল। একটা আশ্রয়, একটু নির্ভরও জোটে নি তার, শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে সামান্য কেরানীগিরি করেই দিন কাটাচ্ছে। বুক দীর্ণ করে দীর্ঘশ্বাস বের হয় বৃদ্ধের।

কোণ থেকে হাতড়ে ছড়িটা নিয়ে ভর দিয়ে কোন রকমে বাইরের দাওয়াতে এসে বসবার চেষ্টা করেন। ঘরের মাঝে বদ্ধ হাওয়া আর সন্ধ্যার আগত অন্ধকার; রুদ্ধজীবনের পথেও সব আলো তাঁর নিভে গেছে অমনি।

সামনে সাপ দেখলেও হঠাৎ সনৎ অমনি চমকে উঠতো না।

অতীতের বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী তেজস্বী লোকটি আজ বৃদ্ধ পঙ্গু অসহায়। জীর্ণ দেহের বোঝা টেনে বাইরে বসবার চেষ্টা করছেন। হাড়গুলো ঠেলে উঠেছে, কোটরাগত চোখ থেকে বের হয় নীলাভ ছলছল চাহনি!

—মাস্টারমশাই! শিউরে ওঠে সনৎ।

কোনরকমে পঙ্গুদেহখানাকে টেনেটুনে ভাঙা চেয়ারখানায় বসে হাসলেন মাধববাবু। সনৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সংসারের অবস্থাও কিছুটা অনুমান করে নেয়। মাধববাবুর এই দুর্ঘটনার জন্য নীতার অবস্থা সে বেশ অনুমান করতে পাবে। তাকে চাপ দিতে পারে না, তার বিবেকে বাধে। অন্যদিকে মেসের অবস্থা মনে পড়ে, শীতল নায়েকের চিমটিকাটা কথা, মেম্বারদের নীরব হাসির কথা স্মরণ হতেই শিউরে ওঠে সে। সামনে তার কঠিন সমস্যা।

মাধববাবু হাসছেন—এতদিন খাটুনির পর, শরীরটা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই। তবে দুঃখ হয় নীতার জন্য। খেটে খেটে গেল মেয়েটা।

সনতের মন সমবেদনায় ভরে ওঠে। সে যেমন করেই হোক নীতাকে রাজি করাবে। নীতাকে নিষ্কৃতি দেবে এই কঠিন বন্ধন থেকে। ঘর বাঁধবে তারা।

সনৎ পথ ঠিক করে নেয়, শান্তির পথ; সামান্য নিয়েই তৃপ্ত হবার চেষ্টা করবে সে। বলে ওঠে—একটা ভাল চাকরি পাচ্ছি, ভাবছিলাম—

মাধববাবুকে কথাটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করে সনৎ। মাধববাবুর মুখচোখে একটা অসহায় ভাব, হতাশা ফুটে ওঠে—নিবিড় হতাশা। বিড়বিড় করছেন মাধববাবু—চাকরি! ভাল চাকরি!

ওরা জীবনকে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নিতে চায় না। নিশ্চিন্ত আরামে বাঁচবার জন্য কাঙাল। তাই দুঃখে ওদের পরাজিত বিপর্যস্ত করেছে পদে পদে।

বুকভরা আশা নয়—আশাহীন ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত কালো ছায়া দু'চোখের চাহনিতে। দিন বদলেছে—বদলেছে জীবনদর্শন, দৃষ্টিভঙ্গী।

মাধবমাস্টার কাদম্বিনীকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন। কাদম্বিনীর দু'চোখে হাসির আভা। কথাটা ঘরের ভিতর থেকে শুনে এগিয়ে এসেছে কাদম্বিনী। বলে ওঠে—বেশ, খুব খুশি হলাম বাবা। এই তো চাই, লেখাপড়া শেখো, চাকরি করো, ঘরসংসার পাতো; আমাদের দেখেই আনন্দ। ওরে ও গীতু!

গীতা মাথায় একরাশ চুল খুলে বিনুনি বাঁধছিল, গায়ের কাপড়চোপড়ও ঠিক নেই, মায়ের ডাকে দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল। এভাবে আদুর গায়ে সে সনতের সামনে বের হয়ে লজ্জা বোধ করে। লাল হয়ে যায় কপোল, আয়ত দু'চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে কি এক রঙিন আবেশের গাঢ় ছায়া।

সনৎ পড়ন্ত বেলার আলো-আঁধারিতে ওকে দেখে চমকে ওঠে। সরে গেল গীতা! দুচোখে কি যেন একটু মধুর লজ্জাজড়ানো আবেশ।

কাদম্বিনী হাসছে—বড় লজ্জা ওর। চলো বাবা, ভেতরে চলো। তাহলে চাকরিতে জয়েন করছো কবে? কি রকম মাইনে?

মাধববাবু সনতের দিকে চেয়ে থাকেন, কাদম্বিনী যেন তার কাছ থেকে সনৎকে সরিয়ে নিয়ে গেল জোর করেই।

মাধববাবুর মনে হয় যেন জোরে চীৎকার করে উঠবেন। ওদের সকলের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদের চীৎকার। কিন্তু অসহায় একটি মানুষ, তার কণ্ঠস্বরও যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। নির্বাক স্তব্ধ মানুষটি শুধু চেয়ে থাকে।

সনৎ চায়ে চুমুক দিচ্ছে। গীতার ডাকে চমক ভাঙে—কি এত ভাবছেন?

সনৎ ওর দিকে চাইল, গীতা হারমোনিয়মটা নামাচ্ছে। কাদম্বিনী বলে ওঠে—গান আর গান। দিনরাত ওই নিয়েই পড়া কামাই করে বাবা। তবে হ্যাঁ, গায় ভালোই! ওই দেখ না আমাদের ধর্মের ষাঁড়টি—কি যে দিনরাত হাঁ হাঁ করে। উঃ হাড়মাস খেলে বাবা।

শঙ্করের কথা বলে কাদম্বিনী বিরক্তভাবে।

সনতের কানে অর্ধেক কথা ঢোকে না। কী ভাবছে সে।

গীতাকে ঘিরে একটা তৃপ্তির জগৎ—শান্তির সন্ধান। নীতা ঠিক তার বিপরীত। কঠিন সংগ্রামমুখর জীবনের একটা বাহ্যিক রূপ মাত্র। অন্তরের সন্ধান যার পাওয়া যায় না—কঠিন চাপে সব রূপ রস শুকিয়ে গেছে নিঃশেষে। গীতা তার তুলনায় অফুরান প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর।

রাত নেমে আসে। সনৎ মাধববাবুর সামনে যেতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করে। কাদম্বিনীই বলে। যা না গীতা, স্টেশনের দিকে সোজা পথটা দেখিয়ে দিয়ে আয় সনৎকে।

গীতা একপায়ে খাড়া—জুতোটা পরে নিই।

বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে আকাশে বাতাসে। ঘাসবনে ওড়ে গঙ্গাফড়িং, জোনাকজ্বলা অন্ধকার; আমের বোলের মিষ্টি গন্ধে ভরা বাতাস স্বপ্ন আনে। আঁধারের পরশে গীতা বদলে যায়—সম্পূর্ণ অন্য সত্তা। সনতের সঙ্গে আজ এই পরিবেশে বের হয়ে সে খুশিই হয়েছে।

বসতি পেরিয়ে একটা ছোট মাঠ—নির্জন, চাঁদের আলোঢালা গাছগাছালি। গুণ গুণ করে গাইছে গীতা।

সনৎ এমন মধুর জগতের সন্ধান জীবনে পায় নি।

কঠোর কর্মমুখর জীবনের ফাঁকেও এমনি অমৃতসঞ্চয় আছে জানতো না—বাঁচবার নেশা আজ মধুর আবেশ আনে তার মনে।

নীতা অফিস থেকে বের হয়ে টুইশানি সেরে রাত্রির ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাবে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে আনে কোনমতে। স্যাণ্ডেলটাও ততোধিক জীর্ণ। কোনমতে ওই জীর্ণ দেহটাকে টেনে চলেছে সেও। ইস্টিশান থেকে বের হয়ে আসছে বাড়ির দিকে, মাঠের মধ্য থেকে গীতার সুরটা উঠছে। একবার থমকে দাঁড়াল নীতা। কি ভেবে ওদিকে না গিয়ে বাড়ির দিকেই এগোয় আনমনে।

নীতা বাড়িতে ঢুকে দেখে মাধববাবু চুপ করে অন্ধকারেই বসে আছেন। বাড়তি হ্যারিকেনও নেই তাঁর ঘরে একটা জ্বলবে, কেরোসিন তেল কেনার পয়সা তো পরের কথা। মাধববাবু সংসারের খাতে আজ যেন একটা বাজে খরচ।

—বাবা!

নীতা ডিম লাইটটা জেলে আনে—এটা কিনে আনলাম বাবা, বেশ লেখাপড়া চলবে এতে।

মাধববাবুর মুখে একটু হাসির আভা—হ্যাঁ মা।

কাদম্বিনীও এসে ঢুকেছে। কথাটা বলে নীতা—বাবার জন্য একপোয়া করে দুধ আর ওষুধ-পত্র—

কাদম্বিনী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না, নীতা অকারণেই খুশিতে উপচে পড়ে। গলগল করে বকে চলেছে—বুঝলে বাবা, পুজোর ছুটিতে বোনাস পেলে তোমাকে নিয়ে দার্জিলিং যাবো, পাহাড়ের দেশে। সেরে উঠবে। নোট-বইগুলো ছাপবার ব্যবস্থা করবো এইবার।

—কিরে? মাধববাবু খুশি হতে পারেন নি।

নীতা বলে ওঠে—মণ্টুর চাকরি হয়েছে। একশো টাকা মাইনে। সত্তর টাকা দিল। এই নাও।

কাদম্বিনী অবাক হয়ে যায়, খুশিভরা কণ্ঠে টাকাটা নিয়ে কপালে ছোঁয়ায়।

—মা কালীর মানসিক শোধ করতে হবে বাছা।

মাধববাবু প্রশ্ন করেন—কি চাকরি?

—খেলার জন্য গ্যালি কোম্পানির কারখানায় চাকরি পেয়েছে।

মাধববাবু ওর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করেন—কারখানায়? লেবার?

নীতা বলে ওঠে—তাতে কি বাবা? আজকাল এ কাজেও উন্নতি আছে। কেরানীগিরি মাস্টারি এসবের থেকে—

হঠাৎ বাবার দিকে চেয়ে চুপ করে গেল নীতা, দাঁড়াতে গিয়ে বাবার হাত থেকে ছড়িটা পড়ে গেছে। অসহায় বৃদ্ধ দরজাটা চেপে ধরে পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে আছেন।

নিদারুণ আঘাতে শিউরে উঠেছেন বৃদ্ধ! ছেলে আজ কারখানার দিনমজুর মাত্র। সামান্য লেবার, মেয়েকে আজ পাত্রস্থ করতে পারেন নি, তারই হাড়ভাঙা ব্যর্থ জীবনের পরিশ্রমের অন্নে তাঁর মুখে গ্রাস ওঠে; এই কথাগুলো যেন তাঁর সারা দেহমনে চাবুকের মত তীব্র বেগে কেটে বসেছে।

—বাবা! নীতা বাবাকে ধরে ফেলে।

সামলে নেন মাধববাবু। মুখে সেই মলিন হাসি। বলে ওঠেন—হয়তো তাই সত্যি নীতা। দিন বদলেছে। সনৎও তাই বলছিল। সেও নাকি পড়াশোনা আর করবে না, চাকরি নেবে কোনখানে। বোধহয় এই-ই ভালো, আলেয়ার পিছনে দৌড়ে লাভ কি বল? ভালোই করেছে ওরা, জীবনে দুমুঠো শুধু খেয়ে চোখ বুজে বেঁচে থাকার মতে সায় দিয়ে। এ ছাড়া পথ কি বল?

নীতা স্তব্ধ দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এত খুশি আনন্দ এক নিমেষেই মুছে যায় তার মন থেকে এই কথাটা শুনে।

সনৎ চাকরি নিচ্ছে—কেরানীগিরি! তার উপর অনেক আশা ছিল নীতার। কথাটা ঠিক যেন বিশ্বাসই করতে পারে না সে!

কাদম্বিনী স্বপ্ন দেখছে। মণ্টুর চাকরি হয়েছে—সনতেরও। গীতার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে সে।

নীতা চুপ করে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

কাদম্বিনীর ওদিকে দেখবার সময় নেই, মাধববাবু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ওর দিকে। কোথায় একটা বেসুরো বাজে সারা মনে। কাদম্বিনী স্বামীর ডাকে ফিরে চাইল। মাধববাবু প্রশ্ন করেন—সনৎকে তুমি কথাটা বলেছো?

কাদম্বিনী দেখেছে গীতার সঙ্গে ওর কথাবার্তা, ব্যবহার। সনতের চোখমুখের পরিবর্তন। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব।

বলে ওঠে কাদম্বিনী—হ্যাঁ গো হ্যাঁ!

—অ।

মাধববাবু একটু অবাক হন। এতদিন ওদের দুজনকেই মিশতে দেখেছেন—নীতা আর সনৎ। হঠাৎ কেমন যেন সনতের এই পরিবর্তন তাঁর চোখেও ভালো ঠেকে না। সবকিছু বদলাচ্ছে। মানুষের মনও। নইলে কাঞ্চন ফেলে কাঁচ কুড়োবার এত ধুমধাম চলবে কেন চারিদিকে!

সনৎও চাকরির নিশ্চিন্ততা খুঁজতে চলেছে। জীবনকে এড়িয়ে যেতে চায় সে।

রাতের অন্ধকার নেমে আসে। জোনাকজ্বলা রাত্রি। সান্ত্বনাবিহীন এই নির্জনতা নীতার মনে নীরব বেদনা এনেছে।

নীতাও পড়ে আছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। সনতের খবরটা বিশ্বাস করতে পারে না। তবু মনে হয় সত্যিও হতে পারে। তার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। হাজারো মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল সনৎ; সাধারণ—অতিসাধারণ একটি মানুষ। একক—নিঃসঙ্গ ঋজু ব্যক্তিটির জাগর অস্তিত্ব তার মন থেকে মুছে গেল।

এ যেন তার নিজেরই পরাজয়।

সুরটা শোনা যায়। নিঃসঙ্গ একটা পাখি অন্ধকারে ডানা ঝাপটে ঘুরে মরছে বাসার সন্ধানে। অসীম গহন আঁধারে কোথায় হারিয়ে ফেলেছে তার বাসার ঠিকানা।

শঙ্কর তবু বদলায় নি। বাড়ির পরিবেশ বদলেছে; সে থাকে বাইরের একটা চালায়। চারিপাশে কলাগাছ চালকুমড়ো আর রাংচিত্তিরের ঘনসবুজ আবেষ্টনী; সরু পথটা দূর্বাদলে ঢাকা। নিজের চারিদিকে এমনি অগোছালো সবুজ বেষ্টনী দিয়ে সমাজ, জগৎ থেকে পৃথক হয়ে রয়েছে। কিছুদিন থেকে দেখছে সংসারের অবস্থা। নীতার কাছে বিশেষ কিছু চাইতে পারে নি। আর বুঝেছে সে, গান ছাড়া তার আর কোন পথ খোলা নেই; তাই তন্ময় হয়ে পড়েছে সে সাধনা নিয়েই।

মাঝে মাঝে আঘাত পায়, কিন্তু অন্তরের সেই শিল্পীসত্তার এদিকে খেয়াল নেই। বিড়ি সিগারেটের জন্য বাকি পড়েছে কিছু। নবীন মুদী তাগাদা দেয়।

—কই গো শঙ্কর, মিটিয়ে দাও টাকা কটা!

—টাকা! শঙ্কর কি ভাবছে।

গুপী মিত্তির কোন সিনেমা সঙ্গীত-পরিচালকের সহকারী হতে চলেছে। গায়ে ছক্কর বক্কর ছাপমারা হাওয়াই শার্ট, পরণে কর্ডের প্যান্ট, মুখে সিগারেট; সর্বদাই আশেপাশে দু-চারজন চেলা-চামুণ্ডা ঘোরে। শঙ্করকে দেখে এগিয়ে আসে।—হ্যাল্লো শঙ্করদা? রেওয়াজ চলছে কেমন! বলছি এ লাইনে চলে এসো। তা নয়, ওই বর্মিই করবে দিনরাত—হ্যা হ্যা হ্যা। ছোঃ।

শঙ্কর কথা বলে না। নবীন মুদী বলে ওঠে—ওদিকে শঙ্কর ভায়ার পোশাক তো বেশ ফিটফাট, নতুন জামা, কাপড়, জুতো! আমাদের পয়সাডার কথা তো স্মরণ থাহে নাহি। এটা ভালো নয় শঙ্কর ভাই; হুঁশ করাইয়া দিতিছি।

শঙ্কর মুখ নীচু করে বলে—দু-চার দিনের মধ্যেই দিয়ে দোব।

কোন রকমে ওখান থেকে চলে আসতে পারলে বাঁচে। শুনতে পায় পিছনে গুপী মিত্তির সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে ওঠে—ও দিয়েছে তোমার টাকা! কোত্থেকে দেবে?

নবীন মুদীও শাসায়—অর পায়জামা খুইলা নিমু না?

একটা হাসির বান ডাকে।

চুপ করে বাড়ি ঢোকে শঙ্কর। এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত অনাহূত সে, আসা-যাওয়ার খবর কেউ রাখে না—রাখবার দরকার করে না। একমাত্র নীতা-ই দেখে তাকে অবসর সময়ে। মণ্টুর জন্য কাদম্বিনী বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, বলে—দুধের ছেলে, চাকরি করছে, হাড়ভাঙা খাটুনি, খাওয়া না হলে শরীর টিকবে কেন?

দুধ-মাছের বরাদ্দ হয়েছে, মা টিফিন নিয়ে তৈরি। মণ্টু ফোমসোলের চটিটা পাচ্ছে না, পাঞ্জাবিও নেই। কাজে বের হবার মুখেই মণ্টুর মেজাজ বিগড়ে যায়।

গজগজ করতে থাকে মণ্টু।

শঙ্করকে ঢুকতে দেখে তার দিকে চেয়ে এগিয়ে আসে। শঙ্কর পরেছে তারই পাঞ্জাবি ও চটিটা।

ফোঁশ করে ওঠে মণ্টু—কেন পরবে ওসব?

শঙ্কর আমতা আমতা করে—একটু কাজে যেতে হয়েছিল, আমারটা ছিঁড়ে গেছে, ভাবলাম তোমারটাই—

—না! যদি না থাকে তোমার, খালি গায়ে খালি পায়ে যাবে। পরেরটা পরতে লজ্জা লাগে না? পরতে হয় নিজে রোজগার করে পরবে।

শঙ্কর চুপ করে চটিটা ছেড়ে দিল।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—আহা, পরের নিয়ে পোদ্দারি—তবু যদি নিজের মুরোদ থাকতো।

পাঞ্জাবি আর চটিটা খুলে দিল শঙ্কর। এতক্ষণ ছিমছামই দেখাচ্ছিল—পাঞ্জাবি খুলতে ছেঁড়া ফর্দাফাঁই ময়লা গেঞ্জিটা বেরিয়ে পড়ে, শঙ্করের মুখেও একটা কালো ছায়া। নীতা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে শিউরে ওঠে বেদনায়। ধমক দেয়।

—মণ্টু! জিভের ডগে তোদের কিছুই আটকায় না? ছিঃ ছিঃ। সুর নামিয়ে বলে ওঠে—আর তোমাকে বলি দাদা—তুমি আস্ত বোকা, ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই!

শঙ্কর চুপ করে চলে গেল, মণ্টুই বলে ওঠে—নেই আবার! মাইরি!

নীতা কি বলতে গিয়ে থামলো গীতাকে ঢুকতে দেখে। চোখে মুখে ওর খুশির আভা; কোথায় যেন বেরুচ্ছে সে। কাদম্বিনী চেয়ে থাকে মেয়ের দিকে।

গীতা হাসছে—একটু সন্ধ্যা হবে মা ফিরতে।

—সকাল সকাল ফিরিস বাছা!

গীতা আর কাদম্বিনীর মাঝে কি যেন নীরব ইশারা হয়ে গেল। রূপের ঢেউ তুলে বের হয়ে গেল গীতা।

নীতা বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—কোথায় যাচ্ছে ও? নীতা প্রশ্ন করে মাকে।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—কোন বন্ধুর জন্মদিনের নেমন্তন্নে।

কী যেন চেপে যাচ্ছে তার কাছে মা; নীতাও জানতে চাইল না। সারা বাড়িতে তার অন্তরালে কি যেন একটা ঘটতে চলেছে। ঠিক অনুমান করতে পারে না নীতা।

বাড়ির এই বদ্ধ পরিবেশ, তাকেও ওদের ওই এড়িয়ে যাওয়া ভাব দেখে মন বিষিয়ে ওঠে নীতার। বাইরে এসে দাঁড়াল।

গাইছে শঙ্কর। একটু আগে যে ছিল একান্ত অসহায়—সুরের জগতে সে প্রবেশ করেছে বিজয়ীর মত। সেখানে সে শিল্পী—সত্যকার স্রষ্টা।

মিষ্টি সুরেলা গলায় ফুলঝুরি ফুটছে। সবুজ পত্রাবরণের মধ্যে থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি গুনগুন করে—কোথায় পাখি ডাকে ক্লান্ত করুণ সুরে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় নীতা ওর দিকে।

তন্ময় হয়েছিল শঙ্কর, নীতাকে দেখে সুর থামাল। নীতা শঙ্করের দিকে চেয়ে রয়েছে; বিন্দুমাত্র অপমান ওর শিল্পীসত্তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। নীতা এগিয়ে এসে খুঁট থেকে টাকা বের করে দেয়।

—নাও, দরকার হয় আমাকে বলো, এ নিয়ে হাড়ির অপমান হয়ো না যার তার কাছে।

শঙ্কর বেমালুম ভুলেই গেছে সবকিছু। হঠাৎ যেন স্মরণ হয়—ওঃ ওই মণ্টুর কথা বলছিস? যাঃ, ছোট ভাই বই তো নয়! বলুক না—ছেলেমানুষ। তা এ যে দুপাত্তি কড়কড়ে—হ্যাঁরে?

—জমা, কাপড়, জুতো করাও।

শঙ্কর রীতিমত অবাক হয়। তানপুরাটা নামিয়ে বলে ওঠে— নাঃ, জীবনে তুই কষ্ট পাবি নির্ঘাত। একদম পয়সা রাখতে পারবি না। তাছাড়া জানিস? পরের দুঃখে যারা কষ্ট পায় তাদের দুঃখ কোনদিনই ঘোচে না—ঘুচতে পারে না।

—কি যে বলিস বড়দা?

—হ্যাঁরে, খুব সত্যি কথা। পরে হাড়ে হাড়ে বুঝবি। তুই একটা আস্ত ইডিয়েট। নইলে আমার মত অকর্মা লোকও তোকে ঠকায়! দেখবি তোর ঘাড়ে পা দিয়ে অনেকেই উঠে যাবে উপরে, পড়ে থাকবি তুই। দোতলায় উঠলে নীচের সিঁড়িটার খবর কে রাখে বল? সবাই যেদিন এমনি একটি ঘাড়ের খোঁজ পাবে সেদিন দেখবি তোকে ঠকাতে আর কেউ বাকি রাখবে না। এন্তার ঠকছিসও।

আনমনে তানপুরাটায় সুর তুলতে তুলতে বলে—হ্যাঁরে ওই সনৎ ছেলেটা কেমন?

চমকে ওঠে নীতা। কেমন একটা সলজ্জ শিহরণ খেলে যায় তার শরীরে। জবাব দেয়—যতটুকু দেখেছি তাতে মন্দ কি? ভালোই।

আর কিছু বলে না শঙ্কর। নীরবে তানপুরায় সুর তুলতে থাকে, রিনিরিনি একটা করুণ সুরের মূর্ছনা। চুপ করে বেরিয়ে এল নীতা।

কেমন যেন মনটা হু হু করে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটা অসীম শূন্যতা ঘিরে রয়েছে বাড়িটাকে। কলোনির পথেও লোকচলাচল কমে গেছে। খালের ধারে ঝিম হয়ে বসে আছে একটা বক—সরবনের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে গেছে তার। স্তব্ধ জীবনযাত্রার কোথাও কোন পরিবর্তন নেই।

মেসের বাবুদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। ঝিমধরা পুকুরের স্থির জলে কে যেন ঢিল মেরে তার আলোড়ন তুলেছে; ঢেউটা ক্রমশঃ এগিয়ে এগিয়ে পাড়ে গিয়ে আঘাত করে, জল ছিটকে তোলে।

শীতল নায়েক, জলধর বর্মন টেকোমাথা নটেশ্বর আরও কে কে জীর্ণ সতরঞ্চি পেতে পাশার আসর বসিয়েছে। জমাটি দানপাশার দান পড়ছে হু হু করে। পাশে চাকর গেলাসে করে চা নামিয়ে রেখে গেছে, চুমুক দেবার অবসর নেই!

হঠাৎ সনৎকে ঢুকতে দেখে কেউ বিশেষ খেয়াল করে না। সনৎ বলে ওঠে,—টাকাটা মিটিয়ে দিন শীতলবাবু!

—টাকা? কিসের টাকা? কার টাকা? বারো পাঁচ সতেরো! ...... হু হু বাবাঃ। এইবার কচে বারো!

—শীতলবাবু! সনতের ডাকে শীতল নায়েক ধমকে ওঠে।

—অ্যাঁ..... আরে মশাই, বড় জ্বালাতন করেন আপনি। নাইবা দিলেন টাকা। গেলো তো কেঁচে গুটিটা! অ! তা হঠাৎ টাকা?

—চাকরি পেলাম কিনা?

—চাকরি! খেলার নেশা ছুটে যায় ওদের।

—এই দুর্দিনের বাজারে চাকরি?

কে যেন প্রশ্ন করে—তা কত গ্রেড মশায়? কত বল্লেন চারশো!

—সরকারি চাকরি না মার্কেন্টাইল ফার্মে মশাই?

জলধরবাবু বলে ওঠেন—সরকারি চাকরি? নেবেন না মশাই, না টিফিন না বোনাস। ওদিকে যাবেন না মশাই। চাকরি যদি করতে হয় তবে তেল কোম্পানিতে, বছরে পাঁচমাসের বোনাস! মারের চেয়ে ধাক্কার জোর বেশি।

সনৎ ওদের দিকে চেয়ে থাকে, একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের জবাব দেওয়া অসম্ভব। শীতল নায়েক হাঁক পাড়ে। অ্যাঁই রামা, ব্যাটাচ্ছেলে, চা দিয়ে যা সনৎবাবুকে। সিগ্রেট চলে তো?

—না! সনৎ হঠাৎ এত খাতির দেখে অবাক হয়ে যায়। একদিনেই তার দাম বেড়ে গেছে অনেক!

—একদিন খাইয়ে দিন সনৎবাবু।

সনৎ অন্য কথা ভাবছে। টাকাগুলো মিটিয়ে দিয়ে নেমে আসছে। হঠাৎ শীতলবাবুর ডাকে থামল সিঁড়ির কোণে।

গলা খাটো করে বলে ওঠে শীতল—বেশ পজিশনের চাকরিই তো পেয়েছেন মশাই, গুণী লোক এতদিন চিনতে পারি নি। আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ! আমার ছেলেটা বসে আছে, দেন না অফিসারকে বলে করে একটা যাহোক কিছুতে লাগিয়ে।

সনৎ আমতা আমতা করে—সবে নতুন চাকরি!

—আহা আজই কি বলছি। একটু খেয়াল রাখবেন গরিবের কথাটা। চলে গেলেও যেন ভুলে যাবেন না। হাজার হোক কটা বছর এক হাঁড়িতে ভাত খেয়েছি মশায়; এ কি ভোলা যায়? বলুন?

সনৎ সায় দেয়, এ কথা সে ভুলবে না কোনদিনই।

মেসের সকলেই আলোচনা তুলেছে। সনৎ বেশ ভালো বাগিয়েছে। সুতরাং আর গরিবদের মনে রাখবে কেন? চলে গেল তাই আজ মেস ছেড়ে।

শীতল নায়েক আর পাশায় মন বসাতে পারে না। কেমন যেন খালি হয়ে গেছে ঘরখানা, মেসটা। এতদিনের সঙ্গী—ওদের দয়ার পাত্র, হঠাৎ যেন কঠোর জবাব দিয়ে চলে গেল সে। পড়ে রইল তারা সেই নীচেই।

—আরে ছেড়ে দাও ওসব। ঢের চাকরি দেখছি। চাকরি ইজ চাকরি। সেই গোলামি। করতো স্বাধীন ব্যবসা, বুঝতাম, হ্যাঁ বাপের ব্যাটা।

কাত্যায়নী দাঁতের মাজনের আবিষ্কর্তা ভূতনাথ জোর গলায় বলে ওঠে কথাগুলো সীট থেকে। চারিপাশে ছড়ানো খালি কৌটো লেবেল। ব্যবসা সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রচুর।

জলধর বলে ওঠে—তা সত্যি, নিদেন দময়ন্তী কেশ তৈল, কাত্যায়নী দাঁতের মাজন আবিষ্কার করতো, তাও চলতো। কি বল ভূতো?

—অ্যাও! শাট আপ। গর্জন করে ওঠে ভূতনাথ।

গলির পড়ে গলি। দুপুরের রোদ হলদে হয়ে আসছে। নীতা চেনা পথটা ধরে এগিয়ে আসে। রাস্তায় জমেছে ছেলেদের খেলার আসর। টেনিসবলের ফুটবলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আলুকাবলী-ওয়ালাকে ঘিরে জমেছে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জটলা।

বৌ-ঝিদের সামনে ঠেলাগাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে নীলামবালা দরদস্তুর করে চলেছে। দুপুরের অলস শহর। মাঠে রোদপিঠ করে মেসের ঠাকুর চাকররা তাস খেলতে বসেছে। কে যেন জোর গলায় হাঁক পাড়ে—নোনা, সে রং ডিক্ করি মারিবা।

ওরা ফিরেও চায় না। নীতা চলেছে আনমনে সনতের মেসের দিকে। একবার মুখোমুখি সে আলোচনা করতে চায়। সনৎকে এড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা যে কিছুটা সত্য তা অনুমান করতে পেরেছে নীতা। চাকরীর কথাটা সে তার কাছ থেকেই শুনতে চায়।

হলদে রঙের তেতলা মেস বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। রেলিঙে কাপড় ঝুলছে, বাবুদের কে একজন নীতাকে দেখে নেমে আসে।

—সনৎবাবু আছেন?

হলধর বর্মা ওর দিকে চেয়ে থাকে। আপাদমস্তক দেখছে তাকে। নীতা ওর দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করে। হলধর জবাব দেয়—শোনেন নি বুঝি? সনৎবাবু তো এখানে আর থাকেন না।

—থাকেন না?

উঁহু। কোথায় যেন বাসা করেছেন।

চমকে ওঠে নীতা। এতদূর এগিয়ে গেছে সনৎ! নীতাকে একটিবার জানায় নি পর্যন্ত। রাগে অভিমানে সারা মন ভারী হয়ে ওঠে। সরে আসছে, হলধর শর্মা চিরকুটে লিখে দেয় ঠিকানাটা।

—এই ঠিকানায় আছেন।

নীতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাগজখানা কি ভেবে হাতে নিয়ে দাঁড়াল না আর।

বারান্দায় ক-জন কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। সনতের অতীত ইতিহাসের সাক্ষী ওরা, নীতাকেও দেখেছে এখানে আসতে বহুবার। ওরা বোধ হয় মনে মনে হাসছে নীতার এই বেহায়াপনা দেখে।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে নুইয়ে আসে ওর মাথা। সরে গেল সে বড় রাস্তার দিকে।

গলির জীবনযাত্রা তেমনিই স্বাভাবিক গতিতে চলেছে। সনৎ নেই এখানে। তবু নীতার সারা মনে একটা দুঃসহ ঝড় ঘনিয়ে ওঠে। কী এমন অপরাধ সে করেছে ওর কাছে বুঝতে পারে না। যাকে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করতে গিয়েছিল, নিজের পরিশ্রম দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে যাকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল, সেই সনতের কাছ থেকে এমনি নিদারুণ অবজ্ঞা অবহেলা জুটবে এ স্বপ্নেও ভাবে নি নীতা। রাস্তায় গিয়ে ট্রামে উঠে বসে স্বপ্নাবিষ্টের মত, হাতের মুঠোয় আবিষ্কার করে তার নতুন ঠিকানাটা।

সনৎ বাড়িটা হঠাৎ পেয়েই নিয়েছে। ছোট্ট বাড়ি; এত সস্তায় পাবে তা কল্পনা করে নি। এক বন্ধুর হেপাজতে ছিল বাড়িটা। চাকরির ব্যাপারে সে কানপুর বদলি হয়ে যাচ্ছে, সনৎকেই বসিয়ে গেল সেখানে।

বার বার মনে হয়েছে সনতের নীতার কথা। বহু দিনের কল্পনা আর স্বপ্ন ছিল তার একটা ছোট বাড়ি; সামনে একটু বাগান হবে। বাধা দিয়ে উঠতো নীতা সনতের কথায়—

পুঁইশাক আর কুমড়ো গাছ থাকবে না, থাকবে কয়েকটা বেল আর রজনীগন্ধার ঝাড়, দু-চারটে গোলাপ গাছ। কলেজ থেকে ফিরে এসে বসবে, পড়াশোনা করবে সন্ধ্যাবেলায় বাগানেই।

হাসতো সনৎ ওর কথায়।

—সে তো কলকাতায় জোটা সম্ভব নয় গরিব প্রফেসারের পক্ষে।

নীতা তবু স্বপ্ন দেখতো, জবাব দিত—কলকাতার বাইরে আশেপাশে তো জুটবে।

আজ নীতার কথা মনে পড়ে বার বার। একবার তাকে জানাতেও পারে নি। বার বার ইচ্ছে হয়, তবু বাধা দেয় গীতাই।

—নীতার সময় কোথায়? চাকরি টুইশানি। তা ছাড়া সে তো চটে আগুন হয়ে আছে। যা বদমেজাজী!

গীতা এর মধ্যে নিপুণ গৃহিনীর মত কাজকর্ম শুরু করেছে, এ বাড়িতে মাঝে মাঝে এসে উদয় হয়।

জানলার কোথায় পরদা বসবে, কোন্ রঙ কোন্ কাপড়ের তা গীতাই পছন্দমত কিনে এনেছে, টেবিলক্লথ তৈরী করেছে দুটো। সামনে মাসের মাইনে পেলে কী কী কিনতে হবে তারই ফর্দ দেখে বলে ওঠে—একটা খাট! কিছু জিনিসপত্রও চাই।

হিসেব নিকেশ করে বলে—একটা কম্বাইণ্ডহ্যাণ্ড রাখলেই চলবে।

সনৎ গীতার কথায় মুখ তুলে চাইল, নীতার প্রসঙ্গ উঠতে প্রশ্ন করে—কি বলছিল সে?

গীতা একরাশ চুল বাঁধতে বাঁধতে বলে—কি আর বলবে? হিংসে আর কি! অ্যাই ধরো না ভালো চাকরি করছো—ভেবেছিল তেমনি পথে পথেই ঘুরবে, তাহলেই খুশি হতো। তা তো হল না, তাই সে বলে, ও আর কি করবে? গবেটমার্কা ছেলে কিনা, রিসার্চ করতে পিছিয়ে গেল। চাকরি ছাড়া আর পথ কই?

সনৎ ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। গীতাই গলগল করে বলে চলেছে।

—আরে বাপু, সবাই কি তোর কথামত চলবে? তুই নিজে আগে কিছু কর দেখি, তা নয় কেবল বাক্তাল্লা। সব পুরুষই বোকা—আর ওই তো রূপ! যেন কালপেঁচা; হিংসেতে ফেটে পড়বে এইবার, দেখে নিও।

সনৎ উঠে জানালার দিকে চেয়ে থাকে, কথাগুলো শুনতে চায়না। এগিয়ে আসে গীতা।

—শুনছো? ও মশাই।

সনতের হাতটা ধরে একটা টান দেয়, হঠাৎ খোলা দরজার কাছে কাকে দেখে চমকে ওঠে সনৎ, গীতাও!

একটি মুহূর্ত। সনতের হাতখানা গীতার হাতে। বিস্ময়ের ঘোরে সনৎও হাতটা সরিয়ে নিতে ভুলে যায়।

নীতা খুঁজে খুঁজে বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে নেমপ্লেট দেখে সোজাই উঠে এসেছে। কিন্তু এই দৃশ্য দেখবে কল্পনা করে নি। গীতা কোন্ বন্ধুর জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেতে আসবে, কিন্তু এইখানেই আসবে তা জানতো না নীতা। চকিতের মধ্যে ভিতরে সরে গেল গীতা, যেন ওকে দেখতেই পায়নি।

ভিতরে যাবে কিনা ভাবছে।

—এসো?

সনৎ সামলে উঠেছে। নীতা ভিতরে ঢুকলো না।

রোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছে, হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে।

জবাব দেয় নীতা—না; একটু কাজ সেরে ফিরবো।

দাঁড়াল না; ভীত চকিত জন্তুর মত দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সনতের মুখে একটা ম্লান ছায়া ফুটে ওঠে। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে তা ভাবতে পারে নি। গীতা বের হয়ে আসে।

বলে ওঠে সনৎ—কী ভাববে বল দিকি ও?

গীতা নিম্নকণ্ঠে জবাব দেয়—কী আবার ভাববে' এতে ভাববার কিছুই নেই।

সনতের নিজের মনের কাছে জবাব দেবার মত তবু কোন কৈফিয়তও নেই। নিজেকে অপরাধী মনে করে সে।

বের হয়ে এসে পার্কে বসলো নীতা। বিকালটা তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে সে কিসের সন্ধানে; একটু স্বস্তি, একটু শান্তির আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে জ্বালা-পোড়া-ধরা মন।

সারা জীবনের গ্লানি আর আত্মসমর্পণ তার নিজের কাছে দুরপনেয় কলঙ্কের মত কালো হয়ে উঠেছে। মিথ্যা আশার পিছনে ছুটেছিল সে।

সনৎকে ভালবাসতে গিয়েছিল নিজের স্বার্থসিদ্ধির নেশাতেই। সেই আশা ব্যর্থ হতেই ভেঙে মুষড়ে পড়েছে সে।

আজ খোঁজ করে নিজের চারিপাশ; তার নিজের ঘর বাঁধবার কোন উপায় নেই। অসহায় মাই বৃদ্ধ পঙ্গু বাবা, আত্ম-ভোলা দাদা—সবাই তার উপরই নির্ভরশীল। সে যদি বাইরে চলে আসে, নিজের ঘর বাঁধে—তাহলে?

ক্রমশঃ সব পরিষ্কার হয়ে আসছে। অন্য কোন পথ তার নেই, একটা নিবিড় আঁধার যেন ঘিরে রয়েছে তার চারি পাশে; নিবিড় মেঘে ঢেকে আছে তারার সন্ধান, সেই মেঘমুক্তি তার চাই—এই হোক তার সাধনা।

সনতের কথা যেন ভুলতে পেরেছে নীতা। সংসারের জন্য তার অর্থ পরিশ্রম সব দিয়েছে, বোনের জন্য আরও কিছু ত্যাগ না হয় করবে সে। চরম ত্যাগ!

পথচলা অনেকখানি সোজা হয়ে আসে। বৈকালের সোনারোদ আভা আনে গাছগাছালির মাথায়। পাখিডাকা অপরাহ্ন।

বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে নীতা। শূন্য পৃথিবী—উদাস দিগন্ত, তার মাঝে তার ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার কথা কোথায় নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

মণ্টু কেমন বদলে যাচ্ছে। গ্যালি অ্যাণ্ড গ্যালি কোম্পানির ফ্যাক্টরীতে খেলার জন্যই চাকরি পেয়েছে সে। খেলোয়াড় হিসাবে সেখানে তার নাম-ডাকও প্রচুর। অফিসাররা সবাই তাকে চেনে, ভালবাসে। অফিসের গাড়িতে করে মাঠে যায়—সাহেবসুবোর সঙ্গে খেলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই; মাইনে যা পায় সম্মান ভালবাসাটুকুই সেই পদের তুলনায় বেশি। আর এইটাই তার কাছে বেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। ফোরম্যান, মেশিন শপ ইনচার্জ—আর সকলের পরনে দামী সুট, একসঙ্গে বাইরে খেলতে গিয়ে নিজের এই অবস্থার কথা ভেবে কেমন বেশ অস্বস্তি বোধ করে সে।

মাঝে মাঝে বাড়িতে টাকা না দেবার কথা ভাবে—কিন্তু সংসারের অভাব, বড়দির হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার কথা ভেবে কিছু বলতে পারে নি প্রথম প্রথম।

ক্রমশঃ মনের সেই সহজ স্বাভাবিক চেতনাবোধটুকু ম্লান হয়ে আসে। পোশাক-আশাক তার চাই-ই। [illegible] থাকতে পারে না সে।

নীতা বাড়িতে পা দিয়েই স্বাভাবিক হয়ে আসে। রাজ্যিশুদ্ধ কাজ পড়ে—বাবার ঘর গোছানো হয় নি। একটু বেড়াতে বের হন মাধববাবু এখন। নীতাও কাজ নিয়ে পড়ে। কাজের ভিড়ে হারিয়ে যায় নীতা।

মণ্টু টাকা কটা দিদির হাতে তুলে দেয়। অবাক হয় নীতা।

—মাত্র পঞ্চাশ টাকা? তোর না মাইনে বেড়েছে?

কাদম্বিনী বলে ওঠে—তেমনি খরচও তো আছে বাছা। পোশাক টোশাকও চাই। সাহেবসুবোর সঙ্গে ওঠা বসা, তারপর দুধ ডিমও চাই।

নীতা চেয়ে থাকে মণ্টুর দিকে, সংসারের খরচের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। বাবার চিকিৎসার খরচ, পথ্য, গীতার শাড়ি, কিছু দিন থেকে কান বালার জন্য বাতিক ধরেছে সে, মাও বলেছে কথার কিন্তু নীতা যেন দিশে পায় না।

নীতা বলে ওঠে—তোর তো ওই দিলেই খালাস, কিন্তু আমি এতে চালাই কী করে বল। আমি কার কাছে চাইবো?

মণ্টু জবাব দেয়—সমাজে ওঠা-বসা করতে হয় দিদি, সকলের মত না চললে খারাপ দেখায়।

কাদম্বিনী মাঝে মাঝে নীতাকে সন্দেহ করে, আজ মুখ ফুটে বলে ওঠে।—এত টাকাই বা কোথায় যায় বাছা? তোর মাইনে টুইশানির টাকা। তার উপর মণ্টুর মাইনে?

নীতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, বলে ওঠে—নিজেই চালাও না মা!

কাদম্বিনী মেয়ের ঝাঁঝালো কথায় দমে না। জবাব দেয় তখনিই—বলতে গেল রাগ তো হবেই বাছা, [illegible] তো কথায় আছে, উচিত [illegible] না পাস খায়। ধার তাই তোর কোন দিনও হল না।

আজ দুপুরের ঘটনাটা নীতার চোখের উপর ভেসে ওঠে, [illegible] মন অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে—মা!

কাদম্বিনী রুটি বেলছিল, মেয়ের কথায় ওর [illegible] বলে ওঠে কাদম্বিনী—অন্যায় কিছু বলি নি বাছা। এ বাড়িতে বসে খাচ্ছে একটা দামড়া মরদ। আর দুধের ছেলেকে রোজগার করতে পাঠিয়েছি। তার কোন সাধ আহ্লাদও মিটবে না?

শঙ্করকে ওরা বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারে না।

চুপ করে গেল নীতা। মণ্টু চা খেতে খেতে বলে—আজ সনৎদাকে দেখলাম আমাদের হেড আপিসে। স্টোর ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছে।

নীতা কথা বলতো না, কথাটা যেন তার কানেই যায় নি। কাদম্বিনী বলে ওঠে—বলছিল বটে, তা মাইনে কি রকম?

রুটি চিবুতে চিবুতে বলে মণ্টু—মন্দ কি, শ তিনেকের উপর।

কাদম্বিনীর মুখে হাসির আভা ফুটে ওঠে।

নীতা উঠে ভিতর চলে গেল। এ প্রসঙ্গে তার কোন ঔৎসুক্যই নেই। আঁধার ঘরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে। আজ মনে হয় তার জীবন থেকে কী একটা মস্ত অংশ খসে গেছে, অসীম শূন্য হয়ে গেছে আশপাশ। নীল আকাশের তারাঢাকা বুক থেকে একটা উল্কা খসে পড়ল জ্বলন্ত তির্যকরেখায়।

মাধববাবু চুপ করে বসে আছেন। নীতার আনা ডিমলাইটের ম্লান আভা পড়েছে মুখে, বইপত্তরগুলো পড়বার ইচ্ছে নেই, বাতাসে পাতাগুলো উলটে চলেছেন একটার পর একটা, স্মৃতির জীর্ণ কীটদষ্ট পুঁথির পাতা উড়ছে এক একখানা।

সুখমুখর পীরগঞ্জের সেই দিনগুলো মনে পড়ে, নীতা তখন এতটুকু, সাজানো সংসার। খেলাপাতির ঘরকন্না পাতা মেয়েটি, শঙ্কর আর নীতা! প্রাচুর্য আর প্রীতিতে ভরা ছিল সেই জীবন।

কত চেনা অচেনা মুখ, পুজোয় সানাই বাজতো—নদীর জলে ভেসে যেতো পালতোলা নৌকা। বাতাসে শিউলির সুবাস।

—শুনছো?

স্ত্রীর ডাকে ফিরে চাইলেন মাধববাবু।

—গীতার বিয়ের কথাবার্তা ভেবেছো কিছু?

—নীতারই দিতে পারলাম না, আগে ওর হোক। বড় থাকতে ছোট বোনের বিয়ে?

কাদম্বিনীর মনে মনে এত দিনের চিন্তায় এতটুকুও টের পান নি মাধববাবু। নিজের চিন্তাতেই তিনি মত্ত। কাদম্বিনী বলে ওঠে বিকৃত কণ্ঠে—হয়, —আজকাল সবই হয়। বলি, কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছো মেয়েকে দুটো পয়সা রোজগার করছে, আর অমনি বিয়ে দেবার সাধ। এদিকে নেই ওদিকে আছে।

জীর্ণকণ্ঠে মাধববাবু বলেন—চাকুরে মেয়েকে বিয়ে করবার পাত্র আজকাল মেলে।

—রূপ? ওই তো চেহারা? কি দেখে নেবে কেউ?

—মায়ের আমার গুণের সীমা নেই বড়বৌ! যার ঘরে যাবে তাকে ভাবতে হবে না।

মাধববাবুর কথায় ফোঁস করে ওঠে কাদম্বিনী—তারপর নিজেরা কি আঙুল চুষবো? ওইতো তোমার ছেলে! একজন হাত পা নাড়ছেন আর হা-হা করছেন, ছোটটি নিজের নিয়েই অস্থির। তারপর এই আগুনের খাপরার মত রূপজ্বালানো মেয়ে, নীতার বিয়ে দিলে সংসারের কি হাল হবে ভেবেছো?

মাধববাবু এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন কিছু। চিন্তিত মনে বলেন—সবই বুঝি বড়বৌ। আমি যে পঙ্গু অথর্ব। যেটা অন্যায় বলে জানি তাকেও চুপ করে মেনে নেওয়া ছাড়া যে গতি আমার নেই? তবু ভাবি কি জানো? এককালে ছিল কৌলিন্যপ্রথা, বংশ মর্যাদার জন্য ষাট বছরের বুড়োর গলায় ষোলো বছরের মেয়েকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, দশ বছরের বিধবা মেয়েকে ধর্মের নামে জীবনের সবকিছু উপভোগ আশা-আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হতো, আজও সেই দিন বদলায় নি। সংসার আর আমাদের স্বার্থের জন্যই নীতাকে বঞ্চিত করে রেখেছি সবকিছু থেকে। ও সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরবে?

—এ ছাড়া আর উপায় কি বলো?

কাদম্বিনীর দু'চোখ ছলছল হয়ে ওঠে। নিজের এই ক্ষণিকের স্বরূপকেই চেনে না সে। অসহায় নিপীড়িত একটি মাতৃসত্তা বাঁচবার জন্য যে অহরহ নখদন্তে শান দিয়ে টিকে রয়েছে এ সেই নারী নয়। শাশ্বত মাতৃত্বের ব্যর্থ জ্বালা নিয়ে গুমরে ওঠে এই মন।

কাদম্বিনী জলভরা অসহায় কণ্ঠে বলে—আমিও ভাবি, কিন্তু কোনদিকে কোন পথই পেলাম না। চারিদিকে যে শুধু জমাট অন্ধকার। নইলে মা হয়ে কি আমার অন্যদিকে চোখ নেই?

মাধববাবু ওর কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে যান।

আবছা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন তাবার সন্ধানে। কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। বাতাসের ক্রুদ্ধগর্জনে ভেসে আসে ঝড়ের আভাস, অন্ধকারে সার্চলাইটের চাবুক মেরে বিরাট আর্তনাদে আকাশ ভরিয়ে তুলে ট্রেনখানা ছুটে গেল স্টেশনের দিকে।

—বাবা! নীতার ডাকে বৃদ্ধ উঠে বসলেন। কাদম্বিনী কখন চলে গেছে। মাধববাবু কি যেন দেখছেন ওর দিকে চেয়ে।

—খেতে যাবে না?

গীতাও ফিরেছে এতক্ষণে। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল একবার, গুনগুন করছে গানের একটা কলি। একথোকা রজনীগন্ধা এনেছে বাবার জন্য। ঘরের একটা জীর্ণ ফুলদানিতে রেখে চলে গেল। নীতা চুপ করে দেখছে ওকে।

হাসছেন মাধববাবু। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—বুঝলি নীতা, ছেলেবেলায় আমাদের বল খেলার সময় অনেক খেলুড়ে জুটতো, কাকে দলে নেবে কাকে বাদ দেবে? শেষকালে টস করে নেওয়া হতো খেলোয়াড়দের। রোজই সব প্লেয়ার বদল হোত—হোত না কেবল সেন্টার ফরোয়ার্ড।

নীতা প্রশ্ন করে—কেন?

—বলটা যে তারই। বল যার—এ দুনিয়ায় সেন্টার ফরোয়ার্ড হতে বাধে না তার। খেলবার কোন যোগ্যতা তার থাক আর নাই থাক।

হাসে না নীতা, মাধববাবু উঠে দাঁড়ালেন—চল মা, অনেক কষ্টের খাওয়া সেটায় যেন বাদ না পড়ে।

রাত্রি নেমে আসে। গীতা নীতার একঘরে শোবার ব্যবস্থা। নীতা ঘরে ঢুকে একটু অবাক হয়ে যায়। গীতার দিকে এতক্ষণ লক্ষ্য করে চায় নি। চাইতেই দেখে ওর পোশাক আশাক সব কিছুই বদলে গেছে। দামী শাড়ি ব্রকেডের ব্লাউজে যৌবনপুষ্ট দেহ সুঠাম সুন্দর আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। খোঁপায় তাজা রজনীগন্ধার বেড়, হাতে স্যাময় লেদারের রঙিন ব্যাগ। শাড়িখানার রঙও ম্যাচ করেছে চমৎকার। চোখে-মুখে গীতার কি অনাস্বাদিত আনন্দের দীপ্তি। গা থেকে দামী সেন্টের সৌরভ ফুটে উঠেছে ভুর ভুর করে। নীতা ওর পাশে নেহাত বেমানান।

চোখ নামিয়ে খাটে গিয়ে উঠলো, গীতা বেশবাস ছেড়ে একটু হালকা হচ্ছে। নীতা খাতা টেনে বসে। ডিপার্টমেন্টের আপার ডিভিশনের জন্য পরীক্ষা দেবে, তাই তৈরি হচ্ছে।

গীতা বলে ওঠে—কি এত দিনরাত পড়িস বল দিকি? আমার আর বাপু পড়া-টড়া হবে না।। ছেড়ে দিলাম, ব্যাস!

নীতা কথা বলে না; গীতা ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখছে। ওর মুখচোখে বিজয়িনীর আনন্দ-আভা।

গীতা বলে চলে—তা ছাড়া মেয়েদের পড়াশোনা কেবল বিয়ের জন্যই। একটা ভালো ছেলে পাওয়া গেলেই সব ফুল স্টপ।

নীতার তরফ থেকে কোন সাড়াই নেই। গীতা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করল। বেশ ধীর ভাবেই ওজন করে।

—বিয়ে করছি আমরা।

নীতা তবুও কথা বলে না, বই থেকে মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে থাকে মাত্র!

এতক্ষণ ধরে মেঘ জমেছিল আকাশে আকাশে; বিদ্যুতের ঝলক জাগে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি; গাছগাছালির মাথায় বৃষ্টি নেমেছে, উথালপাথল ঝড়ের সঙ্গে মাটিতে ঝরছে বৃষ্টিধারা।

নীতা জানালার দিকে চেয়ে বসে আছে, জলের ছাট আসছে, উড়ছে এলোমেলো চুল, আঁচলের প্রান্ত। বিদ্যুতের জোরালো আলোয় তার মুখ ও গালের একাংশ দেখা যায়—দৃঢ়তার ছাপ তাতে পরিস্ফুট। ঘৃণা আর দৃঢ়তা মিশে বদলে গেছে তার কমনীয় মুখখানা।

বাতাসে ভেসে আসে সুরটা। শঙ্কর গাইছে। মেঘের মাদলের তালে তালে জেগে ওঠে মল্লারের রূপ—নীতার মনের সব কালো যেন ওই সুরের আলোয় ভরে ওঠে। আকাশজোড়া মাতনে সৃষ্টির আনন্দ!

তৃষিত ধরিত্রী শ্যাম সজীব সুধাঝরা হয়ে ওঠে শান্তির নির্মল ধারায়। মাথা পেতে শান্তিজল নিচ্ছে দিগন্তসীমা বিস্তৃত জীবলোক। শান্তি নামুক সারা মনে।

নীতা জানালাটা বন্ধ করে গীতার দিকে ফিরে চাইল। বলে ওঠে সহজভাবে—বেশ তো!

গীতা ওর দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে! হিংসা-দ্বেষের কোন ছাপ নীতার মুখচোখে নেই, প্রশান্ত তার দৃষ্টি।

আবার বই টেনে নিয়ে বসে।

গীতা হাই তুলে বলে ওঠে—আলোটা আড়াল কর বাপু। সারারাত পড়বি তুই, আলোতে আমার ঘুম আসে না। একটা আলাদা ঘরও নেই! বাব্বাঃ, ক'টাদিন কাটলে বাঁচি। এ বাড়িতে মানুষ থাকে কখনও?

অন্য জগতের স্বপ্ন দেখছে সে। অন্যঘর অন্যমনের স্বপ্ন।

নীতা কথা কইল না।

কলোনির অনেকেই জেনেছে সংবাদটা। দূরদূরান্তের বিভিন্ন জেলার আত্মীয়রা দেশত্যাগের কল্যাণে সবাই কাছাকাছি এসে বাসা বেঁধেছে। লতায় পাতায় সম্বন্ধের অনেকের মধ্যেও আলোচনা হয়। একটু রসালো আলোচনাই। কেমন করে অমন ভালো পাত্র বাগালো গীতা, এইটাই আলোচনার বিষয়।

গুপী মিত্তির ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে। সিনেমায় চান্স জোটে নি; গানের স্কুল খোলার মতলবে এইবার ক্লাব ফেঁদেছে।

আপসোস করে চায়ের দোকানে বলে—ভালো গাইত মেয়েটা। সব যাবে এইবার।

দত্তজা গিন্নী মল্লিকামাসী আরও কারা এসেছে বাড়িতে; কাদম্বিনী মেয়ের বিয়েতে ঘটাপটা করবে। প্রথম কাজ। তা ছাড়া এমন পাত্রকে দিতে থুতে কিছু লাগবে না। গর্ব করার মত ছেলে এমনিই পেয়ে গেল। রাতারাতি গীতার দাম বেড়ে ওঠে।

ও পাড়ার মিত্তির গিন্নীও খবরটা শুনে এসেছে। বলে ওঠে—মেয়ে তোমাদের লক্ষ্মী বড়বৌ, যার ঘরে যাবে তার কত বরাত।

কাদম্বিনী পানদোক্তার যোগান দিচ্ছে কদিন থেকে; দত্তজা গিন্নী পানটা মুখে পুরে প্রশংসা করে—তা আবার বলতে, যেমন রূপ তেমনি গুণ।

—আর বাছা ছেলেও তেমনি।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—নীতার সঙ্গেই ঠিক করেছিলাম দিদি; কত সাধ্য-সাধনা করলাম

মেয়েকে, তা ও মেয়ের ধনুকভাঙা পণ, এম-এ পাশ না করে বিয়ে করবে না। কি করি—এদিকে এমন ছেলে হাতছাড়া হয়ে যাবে, গীতার সঙ্গেই ঠিক করলাম বাধ্য হয়ে। কত্তা তো মতই দেবে না—বড় থাকতে ছোটর বিয়ে; তা শেষমেষ নিমরাজী করালাম।

নীতা ঘরে বসে পড়ছিল; মায়ের কথাগুলো কানে আসে। সারা শরীরে জ্বালা ধরায়—মনে হয় এখুনি চীৎকার করে ওর স্বরূপ জানিয়ে দেয় সকলকে। সব মিথ্যা বলছে ওই মেয়েটি; যাকে নীতা ঠিক চেনে না।

কিন্তু কাকে জানাবে এ কথা? নিজের এত বড় অপমান, দীনতার কথা জানাবার ভাষা তার নেই। এই দুঃসহ দুস্তর লজ্জার ভার একাই তাকে নীরবে বইতে হবে।

আনন্দ উৎসবের আড়ালে একটা করুণ নগ্ন অভাবের ছায়া মধ্যবিত্ত সংসারের আকাশে ফুটে ওঠে; এ বাড়িতে তার সংক্রমণ এসে লেগেছে। মণ্টু ধাপে ধাপে উঠে চলেছে। খেলার দিকে নাম যশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আয়ের অনুপাতে আনুষঙ্গিক খরচও বেড়েছে। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও মাত্রা ছাড়িয়েছে; ডিভিশনে খেলবার আশায় হোটেলেও আমন্ত্রণ করতে হয় দু-চার জনকে। তাদের আপ্যায়ন করতে হয় নানা চোব্য চোষ্য পেয় পদার্থ দিয়ে। ওদের খুশি না রাখলে তার নামও কেউ জানবে না। ডিভিশনে খেলতে যাবে এই জন্যই এসব খরচও বেড়েছে। বাস ট্রাম ছেড়ে মাঝে মাঝে ট্যাক্সিতে ওঠে। ট্যাক্সির মিটারের মত খরচের অঙ্কও উঠে চলেছে ধাপে ধাপে।

নিজের কুলোয় না—বাড়িতে দেবে কোত্থেকে? সোজাভাবে কথাটা বলতে বাধে। কাদম্বিনী ছেলের গর্বে উৎফুল্ল। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হচ্ছে—নাম বের হয় খেলার জন্য।

দামী লিনোনের হাওয়াই সার্ট কর্ডের প্যান্ট আর দামী জুতো পরে মণ্টুকে মানিয়েছে চমৎকার। ব্লেজারের কোটটা পরে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

মণ্টু মাকে শোনায়—বুঝলে মা, আগামী সপ্তাহে দিল্লী যেতে হবে। প্লেনে যাবো, একদিন থেকে খেলেই ফিরবো প্লেনে। দম নিয়ে বলে সে—গীতার বিয়েতে আসবোই। দিল্লীর হাতির দাঁতের বালা চুড়ি যা হয়, দেখবে আনবো গীতার জন্য। সেদিন খেলা দেখে বড় সাহেব ড্যামগ্লাড। বলে—ইয়ং ম্যান তোমার ফিউচার আছে।

কাদম্বিনী খুশিতে ফেটে পড়ে—বেঁচে থাক বাবা।

এরই মাঝে কথাটা পাড়ে নীতা—হ্যারে, এ মাসে অনেক খরচা, গীতার বিয়ে, নগদ টাকা কিছু বেশি করে দে।

মণ্টু ঠোঁট উল্টে বলে ওঠে—প্লীজ দিদি, এনি হাউ ম্যানেজ করে নাও। একেবারে এমটি পকেট। খরচা বেড়ে গেছে—দেখি ফিরে এসে ছোড়দির বিয়েতে যদি কিছু পারি দোব।

নীতা কঠিন হয়ে ওঠে—যদি পারিস দয়া করে দিবি! তা সারা মাস চলবে কি করে?

—চালিয়ে নিও এনি হাউ।

নীতা বলে ওঠে তিক্ত কণ্ঠে—আমি কি টাকার গাছ, যে ভেবেছিস নাড়া দিলেই পড়বে।

নীতার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তিক্ত হয়ে ওঠে মন। ইচ্ছে করেই ওরা সকলেই যে তাকে এমনি করে নিংড়ে নিচ্ছে, নিদারুণ ভাবে ঠকাচ্ছে তিলে-তিলে, এই সত্যটা বুঝতে তার দেরি হয় না। মণ্টু কথা বাড়াল না, পকেট থেকে চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে থাকে।

—কোথা পাই আমি! নীতা অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে।

কাদম্বিনী চুপ করে কি করছিল, হাতের কাজ ফেলে উঠে আসে। কদিন আগে কথাটা সে শুনেছিল তারপর বলি বলি করেও বলা হয়নি। তবু একটু বেশি খাটলে আরও কিছু টাকা আসবে সংসারে, এই ভেবেই আজ বলে ওঠে কাদম্বিনী—হ্যাঁরে, রেলপারের দত্তমশাই একটা টুইশানির কথা বলেছিলেন ওঁর মেয়ের জন্য; তিরিশ টাকা দেবেন বলছিলেন।

টাকার সমস্যা মণ্টুর সামনে তখনই মিটে যায়।

—ব্যাস সলভড! মণ্টু বলে ওঠে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে।

নীতা মায়ের দিকে চেয়ে থাকে কঠিন দৃষ্টিতে; টাকা রোজগার করবার জন্যই যেন পুষে রেখেছে তাকে, বিনিময়ে এতটুকু স্নেহ-মায়া-মমতাবোধ নেই ওদের। নীতার ওই কঠিন চাহনির অর্থ যেন বুঝেছে কাদম্বিনী।

তাই কাদম্বিনী মেয়ের দিকে চেয়ে মুখে একটু হাসি এনে বলে—এত খাটুনির পর আর পারবে না ও বলেছিলাম বাছা। সত্যি তো কত আর বয় শরীর! আমারও কি সাধ নয় বাছা, তোরও ঘর বর হোক। কিন্তু পোড়া ভগবানকে কি বলবো—সবাই খোঁজে রূপ না হয় টাকা।

কথাটা হয়তো নিদারুণ ভাবে সত্যি, নইলে সনতের মত ছেলেও তাকে এড়িয়ে যাবে এই ভাবে! এটা কল্পনাও করতে পারে না সে।

কি ভেবে নীতা বলে ওঠে—জানিয়ে দিও দত্তমশাইকে, সামনের মাস থেকে পড়াবো ওর মেয়েকে। কাদম্বিনী খুশিই হয় মনে মনে, তবু বলে ওঠে—দেখ বাছা! শরীর আগে!...তা বলছিলাম, এখন চারিদিকে টানাটানি। বৃত্তি পাবার টাকায় যে কঙ্কণ জোড়াটা গড়িয়েছিলি—পরিস নাতো, নতুনই রয়েছে; ওইটাই দিয়ে দিই—কি বল?

—কঙ্কণ!

খবরটা নীতা ভুলেই গিয়েছিল। সে এক বেদনাদায়ক স্মৃতি, ভুলতে চায় নীতা। সনতের সঙ্গে গিয়ে কিনেছিল ওই কঙ্কণ জোড়াটা। সেই-ই পছন্দ করে দিয়েছিল নিজে।

—এই জোড়াটা মানাবে ভালো।

নির্জন মাঠের ধারে ঝকঝকে বাক্স থেকে বের করে সনৎ তার হাতে প্রথম পরিয়ে দেয় ওই কঙ্কণ জোড়া। নরম নিটোল পূর্ণযৌবনা একটি মেয়ে, প্রথম স্পর্শে আত্মহারা হয় যায় সে—মনে জেগেছিল বিচিত্র একটি সুরের অনুরণন। সনতের দিকে স্বপ্ন ভরা মন নিয়ে চেয়েছিল প্রথম ফোটা সজীব কুঁড়ির মত বর্ণ গন্ধ নিয়ে।

সেই স্মৃতি নিঃশেষে মুছে ফেলতে চায় নীতা—সেই সঞ্চয়ের আজ কোনই দাম নেই, মূল্যহীন। মূল্যহীন সে সবকিছু।

মায়ের কথায় নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয় নীতা— নিয়ে নিও, নীচেকার বাক্সে আছে ওগুলো, কৌটোসমেত। ওরই কাজে লাগবে।

নীতা বাইরের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল।

কাদম্বিনী আমতা করে—তবু কিছু খরচা বাঁচলো। যা দাম এখন!

নীতা দাঁড়াল না। মনের অতলে কি একটা বিদ্রোহ গুমরে ওঠে, মাঝে মাঝে বুক ঠেলে বের হয়ে আসতে চায় সেটা কি‌ন্তু চেপে রেখেছে নীতা বহু চেষ্টায়। অন্তরে একটা অসহ্য জ্বালা—বিষপোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে অহরহ।

অভিমান রাগ—সবকিছু করতে ভুলে গেছে সে! করবে কার উপর?

এ বাড়ির মধ্যে একজন আছে যে ওর সমদুঃখের দুঃখী। কিন্তু একান্ত অসহায় সে। এ

বাড়ির পরিত্যক্ত একটি প্রাণী। বাইরের গাছগাছালির ঘন সবুজ আবেষ্টনী ঘেরা একটি টিনের ঘরে তক্তাপোশে বসে দিনরাত রেওয়াজ নিয়েই ব্যস্ত। দুস্তর সাধনার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়ে আনন্দ পেয়েছে সে। সব দুঃখ আঘাত জয় করবার অনুপ্রেরণা পেয়েছে ওরই মধ্যে। কিন্তু কী এমন সাধনা আছে নীতার—যার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে দুঃখ জয় করবার অনুপ্রেরণা পেতে পারে!

জানলার ফাঁক দিকে সবুজ কলাপাতায় পিছলে ঘরের ভিতর এসে পড়েছে একফালি চাঁদের আলো। শঙ্কর তন্ময় হয়ে আছে সুরের রাজ্যে। এ বাড়ির ওই যেন একটি স্বতন্ত্র প্রাণকেন্দ্র। এই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুরময় একটি জগৎ গড়ে তুলেছে।

নীতা এইখানে এসে শান্তি পায়। আলাপ করে চলেছে শঙ্কর।

নীতাকে ঢুকতে দেখে থামল। তানপুরাটা পাশে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। বাড়িতে সবকথাই শুনেছে সে। গীতার বিয়ের খবরটাও কানে এসেছে।

নীরবে সে বেদনাবোধ করেছে নীতার জন্যই।

নীতার দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে শঙ্কর—ঠকে গেলি নীতা! আমি লোক চিনি রে। বলেছিলাম না ওই সনৎ একটা ঠগ। ভুষিমাল! তুই ভাবতিস ও বিরাট একটা কিছু হবে, পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি, নাম করা কোন অধ্যাপক, গবেষক যাহোক একটা কিছু না? কিন্তু মাটি কখনও সোনা হয় না রে! রূপ দেখেই মজে গেল নেশায়। ননসেন্স!

নীতা শঙ্করের মুখে ওই কথা শুনে একটু ধমকের সুরেই বলে ওঠে— কি বলছিস যা তা। ছিঃ!

শঙ্কর বলে চলেছে—কোন দিন কোন কথা বলি নি নীতা। বলতে চাইনি? তবে, ও ঠকবে নীতা। দেখেনিস জীবনে শান্তি কোন দিনই পাবেনা ও। ধর্ম মনুষ্যত্ব বলে যদি কিছু থাকে ও জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। আমার কথা ফলবেই।

একটু থেমে বলে ওঠে শঙ্কর--তোকে ঠকিয়েছে নীতা, তোর মনে ব্যথা দিয়েছে ও। এই কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

নীতা দাদার দিকে চেয়ে থাকে, শঙ্করকে আজ নতুন করে চিনতে পারে। আত্মভোলা মানুষটির এক জায়গায় কোমল হৃদয় একটি রয়েছে। তার দুঃখে সেও কাঁদে।

হাসে নীতা—খোশামুদি হচ্ছে? টাকাকড়ি এ মাসে কিন্তু দিতে পারবো না। উলটে আর একটা টুইশানি নিতে হবে, মণ্টু হাত গুটোল এইবার। সুতরাং টাকাকড়ি নেই।

শঙ্কর হাসছে--তানপুরাটা সরিয়ে রেখে পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে তাড়া-পাকানো দশটাকার নোট কখানা বের করে দেয় ওর হাতে। বেশ গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে শঙ্কর— হিয়ার ইট ইজ!

অবাক হয় নীতা—এত টাকা!

হো হো করে হাসছে শঙ্কর, হাসি থামিয়ে বলে ওঠে—কেন, টাকা কি আমার থাকতে নেই? একটা গানের স্কুলে চাকরি নিলাম। সপ্তাহ একদিন করে যেতে হবে। মাসে আপাততঃ একশো টাকা করে দেবে।

—সত্যি! নীতা প্রশ্ন করে, তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা।

শঙ্কর বলে চলেছে—মাকে বলিস না। টুইশানি ফুইশানি ছেড়ে প্রাইভেটে এম. এ.-টা দিয়ে দে। ফার্স্টক্লাশ তুই পাবি নিশ্চয়। ওটা কি পেয়েছে—ওই সনৎ? সেকেণ্ড ক্লাশ না? ইডিয়ট!

হাসছে নীতা নাঃ, বেজায় রেগে উঠেছো তুমি।

শঙ্কর তানপুরার তারে হাত বুলোয়। মৃদু সুর উঠছে। আবার সেই সুরের রাজ্যে ফের হারিয়ে গেছে সে। নীতা সেই মানুষটিকে আর খুঁজে পায় না।

তবু মনে হয় বেঁচে থাকার একটা আনন্দ আছে। সংসার একেবারে নিষ্করুণ নয়। চারিদিকে থেকে আঁধার ঘনিয়ে আসে না একসঙ্গে। কালোমেঘের পাশেই রুপোলি আলোর নিশানা জাগে। আঁধারের মাঝে জাগে আকাশভরা তারা—আর চাঁদ। দিনের সবহারানো আলোয় তারা হারিয়ে যায়, আবার অন্ধকারের অতলে ক্ষীণ ম্লান দীপ্তিতে জেগে ওঠে তারকার দল—আশার আলোয় মন ভরে তোলে।

... রাতজাগা পাখি ডাকছে দীর্ঘ ক্লান্ত সুরে, বকুলের গন্ধস্নাত বাতাস আমন্থর হয়ে উঠছে।

সনৎ কি এক নেশায় ডুবে রয়েছে। কাঙালের কাছে এ আনন্দের ভোজের নিমন্ত্রণ। চিরজীবন দুঃখ অভাব আর কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে হঠাৎ প্রাচুর্য আর আনন্দের সন্ধান পেয়ে সনৎ পিছনের জীবনকে ভুলতে চায়।

হয়তো এ তার দুর্বলতাই। কঠিন বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে যেতে চায় মন। তবু জীবনের পথে ক্ষণিকের জন্যও ক্লান্তি আসে, চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় পথিক।

সেদিন কলেজ স্ট্রীটেই দেখা হয়ে যায় সন্ধ্যাবেলা। কখানা পুরানো বই কিনছিল নীতা। মনের কোণে গোপন আশা জেগে ওঠে—শঙ্করের কথায় এগিয়ে গেছে। প্রাইভেটে এম. এ-টা দেবে। অনার্স পেপার ছিল—আরও কিছু পড়াশোনা করলে উতরে যাবে নীতা। ফুটপাথে বইওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুর করে বইখানা তুলে নেয়।

—তুমি? কার কথায় চমকে উঠল নীতা।

সনৎ ফিরছে। বগলে একটা শাড়ির বাক্স, সিল্কের শাড়িই হবে বোধ হয়। বিখ্যাত সিল্ক ব্যবসায়ীর দোকানের নাম আঁটা ছবি রয়েছে তাতে। আবছা আলোয় নীতার দিকে চেয়ে থাকে সনৎ।

নীতাও।

একটি মুহূর্ত। ক-দিনেই নীতার কালো দেহটায় এসেছে ক্লান্তি আর হতাশার ছায়া; চুলগুলো আলগা খোপার ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের উপর, সনৎ চেয়ে দেখে ওর হাতে জ্যাথারবেরির ইকনমিক্স।

বছরখানেক আগে নীতাই তাকে ওই বই কিনে দিয়েছিল দাসগুপ্ত কোম্পানির দোকান থেকে—ঝকঝকে নতুন বই। আজ তার নিজের দরকারে সনতের কাছে মুখ ফুটে চায় নি—বলে নি কোন কথা। নতুন বই কিনতে পারে নি, কোত্থেকে পুরানো বই কিনে নিয়ে চলেছে। তবু নীরব অবজ্ঞা ফুটে ওঠে নীতার চোখে।

—দাম না হয় আমিই দিই, সনৎ বলে ওঠে।

বাধা দেয় নীতা—না!

সে-ই দাম মিটিয়ে দিয়ে চলেছে। সনৎ আছে সঙ্গে। নীতার সে দিকে খেয়ালই নেই। নিঃশেষে এড়িয়ে যেতে চায় আজ তাকে।

—নীতা!

অতীতের তীর হতে ডাকছে কোন সুদূরের পথিক। নীতা ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—আমার যে বলবার অনেক কিছুই ছিল। সনৎ বলে ওঠে নীতাকে ব্যাকুল কণ্ঠে।

আজ তার অপরাধী মন নিজের ভুলের জন্য বোধ করে অপরিসীম লজ্জা। কলেজ স্কোয়ারের অপেক্ষাকৃত নির্জন একটু জায়গায় দাঁড়িয়েছে তারা। এর আগেও অনেক সন্ধ্যায় দুজনে এখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছে, অনাগত কোন মধুর ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

সনতের মনে সেই স্মৃতির অনুরণন। নীতা সে সব আগেই ভুলতে চেয়েছে। ওসব তার কাছে অর্থহীন অবান্তর। তাই উদাসীনের মত জবাব দেয় নীতা—নাই বা বললে। না শোনাই ভালো।

—ভুল বুঝে যাবে আমায়?

নীতা কথা বলল না, জনহীন মাঠটা—চারিপাশে থমথমে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কলেজ স্কোয়ারের গা থেকে হকারদের গলা শোনা যায়, ভেসে আসে আলোর রেখা।

নীতা সনতের দিকে চেয়ে থাকে, হঠাৎ মৃদু হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। হাসছে নীতা সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে।

—ভাল যাহোক তুমি। সন্ধ্যা বেলায় এই নির্জনে ডেকে এনে ভালবাসার উপাখ্যান শোনাচ্ছো! মস্ত ভুল করেছিলে সনৎ। ভালবাসা, ভুলে যাওয়া—এসব কথা শোনবার বয়স ঢের পিছনে ফেলে এসেছি। তুমি কি ভাবো যে আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম? ... ওটা একটা খেয়াল, নিছক ছেলে খেলাও বলতে পারো।

সনৎ চমকে ওঠে। আগাগোড়াই যেন একটা ভুলের মধ্যে পাক খাচ্ছে সনৎ, কথাটা নীতার না গীতার পক্ষে প্রযোজ্য তা ঠিক বুঝতে পারে না। রহস্যময়ী ওই নারীর দিকে চেয়ে থাকে অসহায় দৃষ্টিতে। ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠে নীতা।

—যাই চলি, টুইশানি আছে আবার!

—নীতা? .... নীতা যেন ওই হালকা হাসির আবরণে সবকিছুই ঢেকে ফেলতে চায়। এড়িয়ে যাচ্ছে সে।

নীতা বলে ওঠে—দিনকতক একটু খেলেছিলাম তোমায় নিয়ে।

—ঠকানোর মানেই কি? সনৎ প্রশ্ন করে।

হাসছে নীতা—বোধ হয়; আজকে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কবিতাটা শুনেছো সনৎ?

প্রয়োজনে নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

হঠাৎ কবিতা থামিয়ে নীতা বলে ওঠে স্থির কণ্ঠে—না, এরপর দেরি হলে ছাত্রীর দাদু কালই বিল্বপত্র শোঁকাবার ব্যবস্থা করবেন। অনেকগুলো টাকা মাসে—তা আর হারাতে চাই না!

বের হয়ে গেল নীতা ছায়াঘন দেওদার গাছের নীচে দিয়ে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার জগতে—আকাশের বুকে ফুটে ওঠে ভীরু শঙ্কিত তারার চাহনি।

ক্ষুণ্ণ অসহায়ের মত বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সনৎ। মনে মনে রাগই হয় আজ। নীতা তাকে অপমান করে গেল; নিষ্ঠুর খেলার জন্য সনৎই কষ্ট পায়। কই নীতার মনে তো বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নি। সহজ সাবলীল গতিতে হাসে চলাফেরা করে; কাজও করে চলেছে। মনে হয় নীতার যোগ্য সে নয়।

নীতা বোধ হয় তার চেয়ে অনেক উপরে। তাকে পাবার জন্য নিজেকেও তৈরি করতে হয়, দুস্তর পুরশ্চরণের প্রয়োজন। সে সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে সনৎ।

বাড়িতে পা দিয়ে অবাক হয়ে যায় সনৎ। গীতা গুনগুন করে গান-গাইছে। গাছকোমর করে ঘর গোছায়। রোজই আসে গীতা, নিজের ঘর-সংসার তার মনোমত করে সাজাতে চায় এখন থেকেই।

সনৎকে দেখে এগিয়ে আসে। কাপড়টা সামলাতে সামলাতে বলে—এত দেরি?

যেন এরই মধ্যে কৈফিয়ৎ চাইছে সে।

সনৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দেহের দিকে চেয়ে আছে। নীতার বঞ্চনা আর তীব্র বিদ্রূপ মনে জ্বালা ধরিয়েছে, গীতা সেই জ্বালা স্নিগ্ধ করবার আমন্ত্রণ আনে।

—কি হল?

গীতা ওর পাশে এসে বসে একখানা হাত তুলে নেয়। আপনমনেই বলে চলেছে গীতা—একটা ভাল দেখে রেডিও কিনতে হবে কিন্তু। জি. ই. সি নয়তো এইচ. এম. ভি।

—অনেক দাম যে। তা বাবা, মেয়েকে কিছু দেবেন তো? কি বল।

হাসি ফুটে ওঠে সনতের গম্ভীর মুখে, হালকা হচ্ছে সে। গীতা হতাশ কণ্ঠে বলে ওঠে—বাবার থাকলে নিশ্চয়ই দিতেন। মায়ের হাতেও নেই।

একটু দম নিয়ে কচি খুকীর মত আবদারের সুরে বলে চলেছে গীতা—সংসারের টাকাকড়ি সব নীতার হাতে, হাড়কেপ্পন। যেমনি রূপ তেমনি গুণ। তা ছাড়া ওর বাইরের টানও আছে। কাকে যেন ভালবাসে, সাহায্যও করে বাপু মাসে মাসে। এই তো মাঝে মাঝে বাইরে কাকে টাকাকড়ি দেওয়া নিয়ে বেশ বচসা হয়ে যায় মায়ের সঙ্গে। কেন রে বাপু—একটা অমনি কিছু বারটান না থাকলে তোর এত টাকার দরকার কেন? ছি ছি! উপর উপর অমনি টলানি করবার চেয়ে তাকে বিয়ে করলেই তো পারিস!

সনৎ শিউরে ওঠে। সে জানে নীতা গড়ে তুলেছে নিজের পরিশ্রম দিয়ে, আজ নিঃশেষে সব অধিকার মুছে দিয়ে গেল। এই নিয়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনা কুৎসিৎ ইঙ্গিতও সয়েছে বাড়িতে তব তার কাছে কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলে নি, তবু টের পেয়েছে সনৎ, আজ আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে বাড়িতে নীতার অবস্থা।

ঘৃণা নয়—ঘৃণা করতে পারে না নীতাকে। নীরব বেদনা জেগে ওঠে সারা মন জুড়ে।

ওর বেদনাহত মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কিসের যেন সন্ধান করছে গীতা সনতের দৃষ্টিতে। গীতার মনে কী যেন সন্দেহের নিবিড় ছায়া। এককালে সনতের কাছে পড়তো নীতা, পীরগঞ্জে থাকতে দেখেছে দু'জনের মাঝে মধুর একটু সম্পর্ক! আজও তার বেশ মনে জাগে!

গীতা বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠে—ছাত্রীর কথা শুনে দুঃখ হল নাকি?

সামলে নেয় সনৎ—না না! রেডিওর কথা ভাবছিলাম।

ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার চেষ্টা করে। গীতা বলে ওঠে—কিনতে যদি হয় নিজেরাই কিনবো। কারো দানের আশায় থাকবো না। দাঁড়াও তো চা খাবার নিয়ে আসি। বসবার ঘরটা গুছিয়ে যেতে হবে আবার।

সনৎ আবহাওয়াটাকে হালকা করবার চেষ্টা করে—বিয়ের আগে কেউ এসে নিজেদের ঘর গুছিয়ে যাচ্ছে। এমন কথা তো শুনি নি।

গীতা কি ভেবে ফস করে বলে ওঠে—আর তোমার ছাত্রী যে বিয়ে না হলেও অন্য

কোন ছেলের পকেট খরচা জুটিয়ে যাচ্ছে এমন কথাও শুনি নি বাপু! কই তার নিন্দা তো করা হয় না মশাইয়ের।

গীতা ইচ্ছা করেই নীতাকে আঘাত করছে বার বার। কোথাও ওর মনে সন্দেহের একটা কালো টুকরো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। সব বাধা জয় করে আজ বিজয়ী সে। মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকে চিনে ফেলেছে সনৎ।

প্রথমে সনতের মনে ঝড় তোলবার জন্যই এগিয়ে এসেছিল সে। নিজেকে তুলে দিয়েছিল ওর হাতে নিঃশেষে। সনৎ তার হাতের মধ্যেই এগিয়ে এসেছে। তাই বোধহয় রহস্যময়ী নারী নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে নিজের চারিপাশে একটা কঠোর কঠিন আবরণ রচনা করেছে পুরুষের মনে ঝড় তোলবার জন্যই।

সনৎ দেখেছে পিছনের পরিচয় আজ অর্থহীন। নীতা তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। আজ গীতাকে কেন্দ্র করেই সে নতুন জীবন গড়ে তুলতে চায়; বাঁচার স্বপ্ন দেখে যা পেয়েছে তাই নিয়েই।

—গীতা! সনৎ এগিয়ে আসে।

আবছা আলোয় গীতাকে মনে হয় কোন রূপবতী কন্যা। সবুজের স্পর্শ মেশানো পাখি ডাকা দিগন্তসীমা; যার অসীমে নিজেকে অবাধে মুক্ত করে দিয়ে সব ভুলতে চায়—নিজেকে হারাতে চায় সে।

হাতটা ছাড়াবার কৃত্রিম চেষ্টা করে গীতা—ছাড়ো, আর সোহাগ করতে হবে না। আমি তো বেহায়া।

—বেহায়া! কই বললাম সে কথা? সনৎ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

গীতার রাগ তখনও পড়ে নি। বলে ওঠে—বা রে! ওই তো বললে বিয়ের আগে বৌ এসেছে ঘর সাজাতে!

—দূর! সনৎ প্রশ্নটা আপাততঃ চাপা দেবার চেষ্টা করে ওকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে। গীতার খোঁপাটা খুলে গেছে। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে মুখের বর্ণ। হাঁফাচ্ছে অসহ্য উত্তেজনায়—আঃ, ছাড়ো লক্ষ্মীটি!

চোখের তারায় হাসির দীপ্তি!

হঠাৎ চমকে ওঠে সনৎ ওর চোখের দিকে চেয়ে—হ্যাঁ ঠিক একই! একই চাউনি—নীতা আর গীতার মধ্যে পার্থক্য অনেক। কিন্তু নিবিষ্ট মনে চাইলে দেখা যায় এক চোখ—এক চাউনি। হয়তো ভাষা আলাদা। বহু তারাজ্বালা সন্ধ্যায় সনৎ নীতার চোখে অমনি আমন্ত্রণ দেখেছে।

কিন্তু আজ?

আজকের সন্ধ্যায় হাসির সুর মন থেকে মুছে যায়নি। বহু চেষ্টা করেছে—বার বার। তবু ভুলতে পারে নি তাকে সনৎ।

ভোলা যায় না। গীতা তার মনের এই ঝড়ের সংবাদ জানেনা।

ছোট বাড়িখানা ভরে উঠেছে লোকজনের কোলাহলে। বিক্রমপুরের মাসী, সোনারঙের কাকীমা, কাসুন্দির দিদিমা, লতাপাতায় জড়ানো অনেক সম্বন্ধের আত্মীয়বর্গ এসে পড়েছে। বাড়ি ভর্তি হয়ে উঠেছে ওদের কলরবে।

মাধববাবুও জানতেন না যে তাঁর সামনে পিছনে এত স্বজন আছে; কিন্তু দেখে শুনে ভরসা পাবার চেয়ে ভয়ই পেয়েছেন বেশি। কিন্তু তাঁর কথা বলার উপায় নেই।

কাদম্বিনী বলে—একটি মাত্র শুভকাজে আত্মীয়দের খোঁজ নোব না?

—কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে, মাধববাবু আমতা আমতা করেন।

তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে পীরগঞ্জের প্রাচুর্যের ছবি। শঙ্করের অন্নপ্রাশনের সময় দেশ জুড়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তিনি। সেদিন সামর্থ ছিল—আজ? ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। তাই ভয় পেয়েছেন।

কাদম্বিনী স্বামীর কথায় একটু উষ্ণস্বরেই জবাব দেয়—তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? বিয়ে বলে কথা, শুভকাজে পাঁচজনকে ডাকবো না?

এরপর মাধববাবু আর কথা বলেন নি। চুপ করে বসে থাকেন বাইরের ঘরে। বাড়ির ভিতর হাসির ধুম পড়ে, কারণে-অকারণে, গায়ে হলুদের সময় জোকারের শব্দ ওঠে; আর সব ছাপিয়ে ওঠে ছেলেমেয়েদের কান্না আর মায়েদের নির্মম পিটুনির শব্দ।

—মরবার পারস না? অকে ধরতি কইলাম না, অ বাসন্তী?

নীতা এই আনন্দের মাঝে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। মনের গভীর দুঃখকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। সনতের সঙ্গে সব সম্বন্ধ সে সেদিন বিকালেই চুকিয়ে দিয়ে এসেছে। এরপর যা অতীত তা নিয়ে কোন কথাই আর ভাববে না সে। সব ভাবনার শেষ পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বুক বেঁধেছে আবার নীতা মনের সেই জোরেই।

বাড়িতে পা দিয়ে বাবাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়। বৃদ্ধ স্থবির লোকটিকে এক নজর দেখেই কেমন যেন বেদনা ছেয়ে ওঠে ওর সারা মনে। একা বসে আছেন মাধববাবু। চেহারা ক-মাসেই বদলে গেছে, মাথায় একগাছি চুলও কালো নেই, চোখের কোলে গভীর কালো দাগ। কেউ তাঁর দিকে আসেনি, খোঁজ খবরও নেয় নি। নীতা এগিয়ে যায়!

—বাবা?

অসহায় দৃষ্টি মেলে চাইলেন মাধববাবু। শিশুর মত বলে ওঠেন—এক কাপ চা দিবি নীতা, ওরা বোধ হয় ভুলে গেছে আমার কথা।

নীতা ঘরের ভিতর থেকে ওদের কলরব শুনতে পায়, আনন্দের উচ্ছল ভোজে ওই লোকটির কোন আমন্ত্রণ নেই। একটু রাগও হয়—দুঃখও আসে। নিজের তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার কথা ভুলে যায় ওকে দেখে। বলে ওঠে—এখুনি আনছি বাবা!

—হ্যাঁরে!

নীতা দাঁড়াল বাবার ডাক শুনে, কী যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে ইতস্ততঃ করছেন তিনি। বলে ওঠেন—তোকে সনৎ কিছু বলেছিল! আর পড়াশোনা করবে? না—

নীতা জবাব দেয়—কই, দেখা করতে পারি নি।

মিথ্যা কথাই বললো বাবাকে সে। একটা স্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া যেন দম বন্ধ করে আনছে। হালকা হতে চায় সে।

বাবার সামনে থেকে সরে এল, ওর দৃষ্টির সামনে এখুনি নীতার সব দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবে সেই ভয়ে।

বাড়ির ভিতরে সরে এসে ওদের ভিড়ে মিশে যায় সে।

মন থেকে সব কিছু ঝেড়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় নীতা। বাড়িতে পা দিয়ে হৈ চৈ করে ওঠে সে—কে কে চা খাবে-এ-এ?

কাদম্বিনী মেয়েকে এই পরিবেশেও হালকা হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। বিয়ে বাড়ির সব আয়োজন, সব কাজের ভার নীতাই তুলে নিয়েছে নিজের হাতে।

বাড়িময় হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

—অ্যাই মণ্টু, বাড়তি গোড়ের মালা গাছি কয়েক আনবি?

—কেন? মণ্টু প্রশ্ন করে।

—গীতার বন্ধুদের দিতে হবে। তা ছাড়া বাসরঘর সাজাতে হবে না? কি হাবা রে তুই। তা জানবিই বা কি করে বল? হ্যাঁ, নিয়ে আসবি কিন্তু!

কেমন সহজ সাবলীল করে তোলে পরিবেশ—তার হাসি চীৎকার আর কর্মব্যস্ততা দিয়ে!

বিক্রমপুরের মাসী আড়ালে বলেন—মেয়ের যেন নিজেরই বিয়ে লেগেছে।

এদিকে ওদিকে চেয়ে সোনারঙের পিসী ফোড়ন কাটে—তার লাগবো না। বাজারে এতো গরুর দুধ মিলবো, তো গরু পোষবার ঝামেলা ক্যান সইবো কও। তাই এত খুশি বোঝোনো? আজকালকার মাইয়া!

শুধু একজনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না নীতা।

সে শঙ্কর। বাড়ির হৈ-চৈ এর বাইরে রয়েছে সে। দিনরাত এই চীৎকারে হাঁপিয়ে উঠেছে। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই পরিবেশ। জানলার বাইরে সবুজ ঘন দিগন্তসীমার দিকে চেয়ে কি ভাবছে শঙ্কর, হঠাৎ নীতার কথায় ফিরে চাইল।

দিন শেষ হয়ে আসছে। রাস্তায় দেখা যায় আশপাশের বাড়িতে আলো, আকাশে সন্ধ্যাদীপ জ্বালে তারার দল। পাখি ডেকে ফিরে গেল দিনের সঙ্গীকে।

শঙ্কর অনেক ভেবেছে, ভেবে এ-ছাড়া পথ পায়নি। এই স্বার্থপর পরিবেশ তার দম বন্ধ করে এনেছে, চোখের সামনে দেখেছে নীতার জীবনে এই নিদারুণ যন্ত্রণা। তবু অবাক হয় ওর সহ্যশক্তিতে।

নীতা ঢুকেছে ঘরে, হ্যারিকেনটা ওদিকে রেখে এগিয়ে এসে চৌকিতে বসে কথাটা বলে নীতা—গান দু'খানা একটু তুলে দে না বড়দা, আগে গাইতিস তো তুই রবীন্দ্রসঙ্গীত।

—গান! তুই গাইবি? অবিশ্বাস ফুটে ওঠে ওর দু'চোখের চাহনিতে।

নীতা বুঝতে পেরেছে। বলে—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

হাসছে নীতা। একটু ম্লান আলোর আভা পড়ছে ওর মুখে, চুলের উপর। সহজ সুরে বলে নীতা—বাঃ রে দোষ কি?

শঙ্করের কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালির মত বোধ হয়, প্রশ্ন করে—গান গাইবার মত এত খুশি হলি কিসে?

এই বিয়ের বাসরে নীতা গাইবে—এ যেন স্বপ্ন দেখেছে সে। নীতাকে চেনে—তবুও মনে হয় কোথায় এক জায়গায় ও যেন অচেনা রহস্যময়ী।

নীতাই বলে ওঠে—কেন, আগে গাইতাম না? প্রাইজও পেয়েছিলাম। তারপর না হয় কাজকর্ম আর পড়ার চাপে ও কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। তবু তালিম নিলে এখনও হবে—বুঝলি! সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতটা তুলে দে না। জানিস তুই।

শঙ্কর কি ভেবে বলে ওঠে—দোব, কিন্তু একটি শর্তে।

—কী! প্রশ্ন করে নীতা।

শঙ্কর মন স্থির করে ফেলেছে।

—আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো নীতা। এত বড় অন্যায়টা তুই মেনে নিতে পারিস, আমি সহ্য করবো না। এ বাড়ির আমি তো ফালতু—এলে গেলেও কেউ টের পাবে না। তবু আমিই এর প্রতিবাদ জানিয়ে গেলাম।

চুপ করে যায় নীতা। মুখের হাসির আভা মিলিয়ে গেছে। অন্ততঃ একটি লোকের সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছে যার সাধনশুদ্ধ চিত্তের সামনে ফাঁকি দেবার সামর্থ তার নেই।

কি ভেবে নীতা বেদনাহত কণ্ঠে বলে ওঠে এ ছাড়া আর পথ কি বল? মুখ ভার করে থাকলে লোকের মনে অহেতুক প্রশ্ন উঠবে। তাই।

শঙ্কর বলে ওঠে—ঠিক তা নয় নীতা। দুঃখকে ভয় করিস বলেই এতটুকু আনন্দকে কাঙ্গালের মত আঁকড়ে ধরে তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চাস। কিন্তু দুঃখকে জয় করবার এ পথ নয় রে! নিজের কাছে পদে পদে যে হার মানবি—দুঃখ তাতে বাড়বে বই কমবে না।

রাতের শনশন বাতাসে কাঁদছে ধরিত্রী, তারায় তারায় সেই বেদনার প্রতিধ্বনি। পৃথিবী কাঁদে বুকজোড়া দুঃখে।

নীতা হালকা হবার চেষ্টা করে—ধ্যাৎ, তোর যত সব বাজে কথা।

শঙ্কর তানপুরায় সুর তুলে গলা মেলায়—

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে।
জানি নাইতো তুমি এলে আমার ঘরে।

—দুঃখের মধ্যে যে মঙ্গল আসে—সেই প্রকৃত আশীর্বাদ নীতা। তারই মাঝে পাবি সান্ত্বনা—পথ খুঁজে পাবি মুক্তির। দুঃখকে এড়িয়ে নয়—তাকে জয় করেই খুঁজে নিতে হবে সেই পথ।

অনুভব করে নীতা দু'চোখ দিয়ে নেমেছে তার বাঁধনহারা আশ্রু। টপটপ অশ্রু ঝরে হাতের ওপর। বাধা দেয় না। সুরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে করুণ মূর্চ্ছনায়—

অন্ধকারে রইনু পড়ে—স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি।
সকাল বেলায় চেয়ে দেখি—দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি!
ঘরভরা মোর শূন্যতারই বুকের পরে।

সুরটা থেমে গেছে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে শঙ্কর।

নীতার কান্নায় বাধা দেয় না সে। চোখের জলে ওর বুকের ব্যথা কমুক। শান্তি পাক সে।

নীতা যেন স্বপ্ন দেখছে—আকাশছোঁয়া সেই পর্বতসীমা। দূরে মেঘ রোদ ছায়া—পাইনের সবুজ বনে ঝড় উঠেছে—আকাশমাতানো ঝড়; তারই মাঝে কি যেন একটা সুর এগিয়ে আসে। সারা দেহে জাগে রোমাঞ্চ, প্রতি লোমকূপ সজাগ হয়ে ওঠে।

সুরটা আবার সরে গেল দূরে, তার পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল সেই ঝড়ের তাণ্ডব। ...স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সে একা।

শঙ্কর কখন বের হয়ে গেছে খেয়াল করে নি! ঝড়! কোথায় ঝড়!

আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই, ঝড়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। চাঁদ উঠেছে। নীতা কি যেন স্বপ্ন দেখছিল। কোন নিভৃত সত্তা মাঝে যেন জেগে ওঠে দুর্বার অদম্য আগ্রহে—বিরাটকে ধরতে চায় সে। অসীমকে স্পর্শ করতে চায় দেহ-মন দিয়ে।.........এই অনুভূতিটা মাঝে মাঝে কেমন যেন পাগল করে দেয় নীতার সারা মন।

শাঁখ বাজছে—উলুধ্বনি ওঠে। ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি পড়ে যায়। বর এসেছে—বর।

কাদম্বিনী পুরানো জবড়জং একখানা বেনারসী শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে—খই ছিটোতে হয় রে। খইগুলো কোথায়?

—সাবধানে নামাবি গাড়ি থেকে।

চারিপাশে ভিড় জমে যায়; কলরব কোলাহল উঠেছে। মাধববাবু বাইরের ঘরে নিরাসক্তের মত বসে আছেন—পরনে ধোপদুরস্ত পোশাক। কোনদিকেই খেয়াল নেই তাঁর!

পাড়ার ছেলেরা সবাই এসেছে, তারাই তদারক করছে সব কিছু। এসব ব্যাপারে নিষ্কর্মা ছেলের দল একটা করণীয় মহৎ কার্য পেয়ে মেতে ওঠে। গুপী মিত্তির ব্যস্তসমস্ত হয়ে তদারক করছে। হাতে ক্যাপস্টানের টিন, পরনে ছক্করবক্কর-মার্কা জামা। চীৎকার করে—

—ভিয়েনের ওখান থেকে সব জিনিস আইটেম বাই আইটেম আসবে।

দলবলকে ডিরেকশন দিচ্ছে সে নাটকীয় ভঙ্গিতে। ট্যাক্সি থেকে বর নামাতে এসেছে নীতা; বর আসনে গিয়ে বসতেই ট্যাক্সিওয়ালার আর দাম কি। সে যেন নেহাৎ অবাঞ্ছিত এখানে।

নীতা ফিরে আসছে বাড়ির দিকে। হঠাৎ কার ডাক শুনে দাঁড়াল। ট্যাক্সিওয়ালা আর কেউ নয়। পরেশ। অবাক হয়ে যায় নীতা।

—তুমি?

পরেশকে চেনা যায় না। সেই ট্রেনের ফেরিওয়ালার পোশাক নেই। পরনে খাকি প্যান্ট আর হাফ শার্ট। বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে চেহারা। বেশ অবাক হয়েছে সে। নীতাকেই আজ অন্য পোশাকে দেখবার কল্পনা করেছিল সে। কিন্তু সেটা না হতে পরেশ বেশ চমকে উঠেছে।

পরেশ বলে ওঠে—তা, সনৎবাবুর বিয়ে! গীতার সঙ্গে?

হাসে নীতা—কেন এখনও সন্দেহ হচ্ছে নাকি? তা তুমি ফেরিওয়ালাগিরি থেকে ড্রাইভারিতে পেশা বদল করতে পারো—কনে বদলই বা হবে না কেন, বল?

কথা বললো না পরেশ । এই পেশা বদলের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আর পরিশ্রম জমা হয়ে আছে। কত কষ্টে সে নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছে।

কিন্তু যাদের সুখ দেখলে আনন্দ হয়—আশেপাশে তাদের অধিকাংশকেই দেখেছে কষ্ট পেতে, কেমন ধাপে ধাপে নেমে চলেছে তারা। নীতাকে এভাবে দেখবে আজ কল্পনা করে নি সে। সামলে নেয়! একটু ক্ষুব্ধস্বর ফুটে ওঠে তবু ওর গলায়—না, এমনিই বলছিলাম।

ওদিকে বিয়ের কাজ শুরু হয়েছে। নীতা বলে ওঠে— এসে পড়েছো যখন না খেয়ে যাবে না। এসো।

পরেশ ওর দিকে চেয়ে থাকে; বেশ একটু দৃঢ়স্বরেই বলে ওঠে—না; ও বিয়ে দেখার অভ্যাস নেই। বাহক আমরা, আমাদের শুধু বয়ে দেওয়াই কাজ। আচ্ছা চলি। ড্রাইভার মানুষ, ওসব শখটখের দরকার নেই।

পরেশ এড়িয়ে গেল! নীতা চুপ করে কি ভাবছে।

ভীরু ছেলেটি, ট্রেনে ফিরি করতো। ক্রমশঃ কঠিন নগ্ন জীবনের সংস্পর্শে এসে সেও ঋজু কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখে মুখে ওর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর সংগ্রামের ছাপ।

সনতের সঙ্গে কোথায় পরেশের একটা বেশ পার্থক্য আছে।

সনৎ দুঃখকষ্টকে ভয় করে—ক্লান্ত হয়ে আজ একটা আপোস রফা করতে চলেছে। ভীরু সে। পরেশ তার ঠিক বিপরীত। দুঃখ কষ্ট অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে জয় করতে চলেছে জীবনকে।

ফেরিওয়ালা পরেশ। হাতকাটা তেল, আশ্চর্য মলমের ফেরিওয়ালা। সেও তো এ জীবনে পিছিয়ে যায় নি। হার মানেনি।

কোথায় যেন একটা আশার আলো সেও দেখে। জীবন তত কঠোর বা কঠিন নয়; তাকে জয় করার সাধনায় সার্থকতা আছে—আছে নিবিড় আনন্দের সুর।

নীতা আনমনে কথাটা ভাবছে, ওদিকে উলুধ্বনি শাঁখের শব্দ ওঠে। এগিয়ে যায় ভিতরে। কি সব ভাবছিল অকারণে সে।

গুপীর নিপুণ ডিরেকশানে এবং দলবলের সহযোগিতায় খাওয়াদাওয়া অতিথিসৎকার আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় না। নীতাও তদারক করছে। ভাঁড়ারীর কাছে জিনিসের হিসাব করে এগিয়ে দেয়। গুপীর হাঁকডাক শোনা যায়, মাধববাবুকে দেখে সিগারেটা একটু লুকিয়ে বলে ওঠে—আপনি শুধু দেখে যান স্যার, কোনও শম্মাকে টুঁটি করতে হবে না। নবোদয় সঙ্ঘের মেম্বাররা থাকতে তিলমাত্র অসুবিধা হতে দেব না কারোও।

চীৎকার করে ওঠে পরক্ষণেই—অ্যাই মদন, ফাস্ট ব্যাচ হয়ে গেলে সেকেণ্ড ব্যাচে মেয়েদের বসিয়ে দে! যে যে স্টেশনে যাবে তাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে বল হেরম্বকে। ন-টা বাহান্নতে ট্রেন। কুইক মার্চ।

ক্রমশঃ ভিড় হৈ চৈ কমে আসে। রাত্রি নামছে কলোনির মাঠে, গাছ-গাছালির মাথায়, ফাঁকা প্রান্তরে।

কেমন কুয়াসা জড়ানো আবছা ওই অন্ধকার।

একজনকে খুঁজছে সনৎ অনেক আগে থেকেই। এত ভিড়ে দু'চোখের চাহনি মেলেও তাকে দেখতে পায় না। একনজর দেখেছিল তাকে, বিয়ের সময় টোপরের ফাঁক দিয়ে একবার দেখেছিল তাকে। মেয়েদের সঙ্গে বেশ জোর করে উলু দেয় নীতাও। পরনে সেই আধময়লা একখানা শাড়ি, ক্লান্ত খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের উপর, শ্রান্ত ঘামঝরা চেহারা। তবু চোখের তারায় হাসির ছন্দ ওঠে। ফেটে পড়েছে আনন্দে।

সনৎ সেদিকে চেয়ে থাকে, কিন্তু যে নীতাকে এতদিন দেখেছিল কত সন্ধ্যা-সকালের আঁধার-আলোয়, সুখদুঃখের স্মৃতিস্বপ্নে এ সেই কর্মঠ মেয়েটি নয়। সেই দৃষ্টিতে আর প্রীতি-সমবেদনাব বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। অপরিচিত একটি মেয়ে—সনৎকে সেও বোধ হয় আর চেনে না।

এই গীতাকেও সনৎ দেখে অবাক হয়ে যায়। মেয়েরা এমনিই হয় বোধহয়। পুরুষের চোখে ফুটে ওঠে তার মনের আলোর প্রতিবিম্ব। চঞ্চল মেয়েটি আজ গম্ভীর হয়ে গেছে। ফুটে উঠেছে রূপ আর রূপের পসরা। বেনারসী শাড়ি, হাতে কঙ্কণ, চুড়ি, গলায় নতুন গড়ানো হারটা, পাওয়ার আনন্দে গীতা যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে বিস্মিত দৃষ্টিতে।

বাসবঘরে জমেছে আত্মীয়দের ভিড়। নীতা হাতমুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে সেখানে হাজির হয়। বলে ওঠে—কই রে, গানটান হোক? অ্যাই বাসন্তী? সব চুপ-চাপ যে!

বাসন্তী পাঁড়াগায়ের মেয়ে ছিল, উৎখাতের পর তার বাবা-মা বাধ্য হয়ে শহরতলীর দিকে এসে ঘর বেঁধেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এখনও শহরে হয়ে ওঠে নি। বাসন্তী জবাব দেয়—জানি না। শিখতাছি।

—ধুৎ! গান না হলে বাসরঘর মানায়! কি বলো গো?

—তা ঠিক কথা।.

ওরা নীতার অতর্কিত আবির্ভাবে, এই হৈ-চৈ—এ একটু অবাক হয়ে গেছে। নীতা তার মনের সমস্ত দুর্বলতা সুরের ঝড়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বেলো করতে থাকে। কি ভেবে গীতাকেই বলে ওঠে—কই রে গীতা, তুই না হয় একখানা গা। তাতে দোষ নেই। আজকাল কনেরাও গান গায় বাসরে।

গীতা ওর কথায় জবাব দেয় না। শুধু চেয়ে থাকে তার দিকে। নীতা যেন আমূল বদলে গেছে। গান প্রায়ই গাইতো না। আজ গান গাইছে সে—আর যে গীতার ঠোঁটে গানের কলি ফুটে উঠতো সেই গীতা যেন গান ভুলে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে নীরবে।

নীতা গান গাইছে—শঙ্করের কাছে শোনা গানটা :

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে,
জানি নাইকো তুমি এলে আমার ঘরে।
সব যে হয়ে এলো কালো
নিয়ে গেল দীপের আলো
আকাশপানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে।

নীতার সারা মনে কোন্ দূরাগত ঝড়ের সংক্রমণ ...... হঠাৎ চমকে ওঠে—সেই সন্ধ্যার মত। দূর থেকে বনের গাছগাছালি কাঁপিয়ে যেন উদার একটা চাঞ্চল্যের সুর জেগেছে—এগিয়ে আসছে সুরটা ঝড়ো হাওয়ায় ভর করে—কার উদ্দেশ্যে! আকাশে আকাশে তারই অন্বেষণ।

থেমে গেল নীতা। নিজের অবচেতন মনের অতলে জেগে ওঠা ঝড় তখনও স্তব্ধ হয় নি। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে। উঠে পড়ল নীতা, এখান থেকে বের হয়ে সেই মুক্ত আকাশের নীচে যেতে পারলে যেন সুখী হবে, শান্তি পাবে সে।

ওরা বিয়ের পরই কোন্ দূরে চলে যাচ্ছে বেড়াতে। সনৎ কথাটা শোনায়—শিলং বা অন্য কোথাও যাবো ভাবছি। একমাস ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়বো।

—গীতার ভাগ্যি ভাল। দেশ-বিদেশ ঘুরে আসবে! ন-দিদি বলে ওঠে।

নীতা জবাব দেয় না। এই স্বপ্ন সেও দেখেছিল। কোন্ দূর পাহাড়ের মাথায় সূর্যের আলো পড়েছে, সবুজ টিলার পর টিলা আলোর ঝরনাধারায় শুচিস্নাত। পাখিডাকা স্তব্ধ নির্জনতা। পাইন-বনে শনশনানি হাওয়ার মাতন ওঠে।

হেসে ফেলে নীতা। ...... ব্যর্থ স্বপ্ন।

উঠে দাঁড়াল। সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসছে। বলে ওঠে—বসুন সনৎবাবু, এ সময়ে আপনাদের ডিস্টার্ব করবো না। ধারালো হাসি ফুটে ওঠে নীতার ঠোঁটে।

সনৎ শিউরে ওঠে মনে মনে। ওর মনের সব খবর সে জানে, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় দুর্বল বোধ করে সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে।

বের হয়ে গেল নীতা। গীতার মুখ থেকে বের হয় শব্দটা। ঘৃণাজড়ানো কণ্ঠস্বর—বেহায়া!

সনৎ ওর দিকে একবার বেদনাহত দৃষ্টিতে চাইল মাত্র। কোন জবাব দিল না, সমর্থনও করে না। সমর্থন করে নীরব চাহনিতে বাসরের উপস্থিত মেয়েরা, কেউ কেউ একটু হাসল মুখ নীচু করে।

কে যেন বলে—বড় থাকতে ছোটরই ভাল ঘর-বরে বিয়ে হলে বড় বোনের অমন একটু হবে বৈকি। হাজার হোক মেয়েমানুষের মন তো।

সমর্থন করে ন-দিদি—সত্যি কথা দিদি। আমাদের নস্যুর দিদি—চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে বাসন্তী—অ্যাই শুরু হল ভাগবতকথা।

সনৎ চুপ করে কি ভাবছে। মনে মনে আজ প্রশ্ন জাগে। রূপসী গীতার দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে। নীতার মনে আজ কোন বেদনার ছায়াই সে দেখে নি। সহজ ভাবেই এত বড় সবহারানোর দুঃখকে সে জয় করে নিয়েছে। তবে কি সে কোনদিনই ভালবাসে নি

সনৎকে? নীতার ভালবাসার যোগ্য করে তুলতে পারে নি নিজেকে! ভীরু সে। তার অগ্নিশুদ্ধ প্রেমের যোগ্য করে তুলতে যে সাধনার দরকার, সনৎ সেই পথ থেকে যেদিন ভ্রষ্ট হয়েছে, নীতাও সরে গেছে সেই দিন তার কাছ হতে। নিজেকে অক্ষম মনে করে সনৎ।

এই অক্ষমতাই আজ সনতের মনে কাঁটার মত বাজে নীরব ব্যথায়। এতদিন নীতা নীরবে কৃপা করে এসেছিল আজ সেই কৃপা রূপান্তরিত হয়েছে পুঞ্জীভূত অবজ্ঞা আর অবহেলায়।

বাসর জাগানোর শখ ওদের মিটে আসছে, একে একে সকলে বের হয়ে যায়।

অসীম অন্তহীন স্তব্ধরাত্রির নির্জনে দু'জনে মুখোমুখি বসে আছে গীতা আর সনৎ। যেন কেউ কাউকে চেনে না। এই প্রথম দেখা। কথা কইবারও কিছু নেই। সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে ওদের।

সংসারের খরচ বেশ কিছু কমলো। গীতার পেছনের খরচটা বন্ধ হয়ে আসায় সংসারের অবস্থা একটু গুছিয়ে নিতে পারবে নীতা। মন্টুও কিছু বেশি মাইনে পাচ্ছে। সে যদি আরও কিছু বেশি করে দেয়—বাড়তি টাকা কিছু এলে বাড়িটাও নতুন করে গড়ে তুলতে পারবে বছর খানেকের মধ্যে। মাধববাবুর চিকিৎসা আরও ভাল করে করতে পারবে তারা।

কাদম্বিনী মনের কথাগুলো বলে চলেছে। অনেকদিনের আশা ওসব।

মাধববাবু কথাগুলো শুনে যান। চুপ করে বসে থাকেন। কাদম্বিনী নিশ্চিন্ত হয়েছে, মেয়ের বিয়ের দেওয়া নয়—আপদ উদ্ধার হওয়া। আগুনের মত রূপ আর ওই হৈ-চৈ করা মেয়েটাকে নিয়ে দিনরাত স্বস্তি ছিল না; মেয়ে পার হয়েছে—না গলার কাঁটা নেমেছে। স্বামীর কাছে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। আবার শান্তি নেমেছে সংসারে—পীরগঞ্জের প্রাচুর্যের দিনগুলো ফিরে এসেছে। সবুজ শান্তিমাখা পরিবেশ।

হাসেন মাধববাবু—সেদিন আর ফেরে না বড় বৌ।

—কেন?

—এ জীবনের জটিলতা অনেক বেশি। দুর্গম এ পথ। শান্তিতে চলবার উপায় এখানে নেই। শান্তির স্বপ্ন আজকের মানুষের মন থেকে একেবারে মুছে গেছে।

একটি ঘটনাকে বহু চেষ্টা করেও তিনি ভুলতে পারেন নি। সনতের ওই গোত্রান্তর। মাধববাবু কত আশা-ভরসা ছিল তার উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেরা ছাত্র হবে সে। খ্যাতিমান কীর্তিমান হবে।

কিন্তু! সব আশা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল।

সনৎ জীবনের ক্ষেত্রে নির্মম পরাজয় বরণ করে সামান্য পাওয়াকেই চরম বলে মেনে নিয়েছে। মনের সব দিক থেকে সে কাঙাল হয়ে উঠেছে। লোভী, বিশ্বাসহন্তা। এমনকি নীতার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে ও প্রতারক।

বাবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি নীতা। তাই মাধববাবু সনৎকে মনে মনে ক্ষমা করতে পারেননি।

কাদম্বিনীকে দেখেছেন, পীরগঞ্জের বাড়িতে সে ছিল প্রাচুর্যের মধ্যে গৃহলক্ষ্মী। আজ জীবনের কঠিন সংগ্রামের কালো ছায়া তার মুখে-চোখে। বাঁচবার জন্যই নিষ্ঠুর হতে নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছে। সেই লক্ষ্মী-শ্রী মুছে গেছে ওর মুখ থেকে, চারিদিকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য অহরহ চেষ্টা করে চলেছে। নীচতা-শঠতাকেও মেনে নিয়েছে।

সনৎও গোত্র বদলেছে। সবাই এর আগে এমন কি ছিল? না! তবে? এই নির্মম পরিণতির

জন্য দায়ীও তিনি কাউকে করতে পারেন না; দায়ী যদি কেউ থাকে তা এই যুগ—এই সমাজ, এই সামগ্রিক বিপর্যয়।

এর মধ্যে মানুষের ধর্ম তবুও টিকে আছে। চারিদিকের তমসার মাঝে তবু জ্বলে আলোকশিখা; নইলে সবই অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেত, ভালমন্দে কোন পার্থক্য থাকতো না। অবলুপ্তি ঘটতো সব কিছুর।

বড় বৌ-এর দিকে চেয়ে হাসেন মাধববাবু। ওরা স্বপ্ন দেখে,—আরও ভালভাবে বাঁচবার স্বপ্ন। বাড়ি উঠবে—আরও কত কি পাবে তারা। কিন্তু জানে না—পানপাত্র আর ঠোঁটের মধ্যে ব্যবধান অনেক। দুরন্ত বাধা আর হাজারো অন্তরায় রয়েছে ছড়ানো, সব কটি মানুষের মনের অতলে। সুর এক হয়ে মেলে না আর কোনখানেই। সবই বেপর্দা-বেসুরো।

মণ্টুই বাগড়া দেয় প্রথম। কাদম্বিনী একটু রুষ্ট হয়ে ওঠে ওর কথায়, কিন্তু কড়া কথা বলতে বাধে তার। চিরকালই মুখ বুজে এসেছে ছেলেদের ক্ষেত্রে; অন্ধ স্নেহ তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এইটুকু সেই মণ্টু, আজ সুন্দর একটি তরুণ। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা—পোশাক-আশাকে মানায় চমৎকার, ওকে সুন্দর দেখেই আনন্দ। তাই সন্তর্পণে ওদের আগলে রাখতে চায় কাদম্বিনী সংসারে থেকে।

মণ্টুর মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খরচাও বেড়েছে অনেক। দামী পোশাক, জুতো পরে। ট্যাক্সি হাঁকিয়ে বাড়ি আসে মাঝে মাঝে। ভুল ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে শুরু করেছে। এত দূর থেকে চাকরি করতে যেতে অসুবিধে হয় তার। সেই সকালে ডিউটি, সন্ধ্যায় ফুটবল ক্লাব থেকে বের হয়ে ফিরতেও রাত হয়,—নোংরা পরিবেশে সে আর থাকতে রাজী নয়। বন্ধুবান্ধব আসে এ বাড়িতে, তারা কি ভাবে কে জানে!

টিনের ছাউনি আর পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের গাঁথুনির একচালা ঘর—কলোনির এই পরিবেশে অনেক বন্ধুবান্ধবদের আনতেও অসুবিধা হয়। চারিপাশে রাংচিত্তিরের বেড়া, কলাগাছের ঝোপ—দু-একটা পেঁপে আর লাউকুমড়োর লতার আবেষ্টনী। এই জগতে তার মত অতি-আধুনিক কোন তরুণের থাকা অসম্ভব। তারপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও মনে লাগে না। দুধ-ডিমও ঠিক মত জোটে না। তাই এখান থেকে চলে যাবার কথাই ভেবেছে।

নীতা মণ্টুর কথাগুলো শুনে বলে—এখন যদি চলে যাস তবে সংসারের অবস্থা সেই তেমনিই হয়ে যাবে। দুটো পয়সা দিস—তাই চলছে।

মণ্টু বলে ওঠে—কিন্তু রিয়েলি আই ফীল আনহ্যাপি। এখানে প্লেয়ারের বাঁচা চলবে না। নেভার।

—বলিস না হয় খাওয়া-দাওয়ায় একটু ভাল ব্যবস্থা করে দিই। বুঝছি অসুবিধা হচ্ছে! নীতা অনুরোধ করে ব্যাকুল কণ্ঠে।

মণ্টু বলে ওঠে—না—না, দ্যাট ইজ সেট্‌লড্‌। আমি বরং কোম্পানির মেসেই থাকবো ঠিক করেছি। এভরিথিং অ্যারেঞ্জড্‌।

কাদম্বিনী ইংরাজি বোঝে না। তবু বুঝতে পারে ব্যাপারটা। সে ভাবে সত্যিই। ছেলেরও যখন অমত—তা ছাড়া অসুবিধা হচ্ছে, তার দিকে চাওয়া উচিত।

মণ্টু সান্ত্বনা দেয় দিদিকে—অফ কোর্স বাড়িতে টাকা আমি ঠিকই দোব মাসে মাসে।

হাসে নীতা, চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। চোখে সব দেখেশুনেও দিতে চায় না সে, বাইরে গেলে এ বাড়ির সঙ্গে কতটুকু সম্বন্ধ রাখবে তা ভালোই জানে।

তবু বলে ওঠে নীতা—টাকাটাই বড় নয় মণ্টু ; এক জায়গায় থাকবি বাবা মা ভাই-

-বোনের মধ্যে, এতে সম্পর্কটা মধুর হয়, বিপদে সান্ত্বনা থাকে। পরস্পরের জন্য মমতাবোধ জন্মায়! সুন্দর কিছু গড়ে ওঠে সকলের সমবেত চেষ্টায়।

মণ্টু জবাব দেয়—উঁহু এতে তিক্ততা বাড়ে বই কমে না, দূরে দূরে থাকাই ভালো। তাতে সম্বন্ধটা বজায় থাকে। খিচড়ে যায় না সবকিছু।

নীতা কথা বলে না। চমকে উঠেছে ওর কথায়। এতটুকু ছেলে, এই কদিনেই এত সব শিখে ফেলেছে।

কাদম্বিনী বলে ওঠে—তা ও যেতে চাইছে যখন তুই বাধা দিস কেন বাপু? যাক না।

নীতা একটু কঠিন সুরেই বলে ওঠে—একা যে সংসার টানতে আর পারছি না মা! কেউ যদি না দেখে, দায়িত্ব কি একা আমার?

কাদম্বিনী বলে ওঠে—সংসারে মানুষ তুই একা নোস। কেন ওই বুড়ো মিনসে দিনরাত হা হা করছে, তাকে এই কথাটা শোনাতে পারিস না? মণ্টু দুধের ছেলে তাকে এই সব কথা বলা কেন? ওর অসুবিধা হয় মেসেই থাকবে।

নীতা কোন কথা বললো না। শঙ্করের প্রতি এখনই হাজারো বাণ নিক্ষেপ করা শুরু হবে। বাবাকে বের হয়ে আসতে দেখে সে থেমে গেল। মাধববাবু হাসছেন কাদম্বিনীর দিকে চেয়ে।

—ছোটবাবু চলে গেল? তোমার ছোট কুমার, প্রিন্স!

কাদম্বিনী কথা বলে না।

মাধববাবু বলেন—ওরা যাবেই বড় বৌ। রাখতে তুমি পারবে না। বললাম না—আজকের এখানের পথ বড় জটিল। সুর এখানে মেলে না কারো সঙ্গে। সব বেসুরো-বেপর্দা বাজে।

ওঁর কথায় কান না দিয়ে কাদম্বিনী বের হয়ে গেল। মাধববাবু নীতার দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন।

ওঁর হাসি—ব্যর্থতার দুঃখমাখা হাসিও—স্তব্ধ হয়ে যায় ওর সামনে।

বাবা প্রশ্ন করেন—কোথা যাচ্ছিস নীতা?

নীতা ফিরে দাঁড়াল—মিত্তিরবাড়িতে নতুন টিউশনির কথা বলেছিল, দেখে আসি একবার।

মাধববাবু এগিয়ে আসেন, শীর্ণ কোটরগত চোখ দুটো জুলজ্বল করছে নিষ্ফল ব্যর্থতায়। বলে ওঠেন—দু-চার জন ছেলেকে বল না বাড়িতে এসে পড়ে যাবে। কম টাকায় পড়াবো; যে যা দেয়!

—বাবা! নীতা বাবার আর্তিভরা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠেছে। মাধবমাষ্টার আজ যেন ভিখারীর মত আবেদন জানাচ্ছেন। যেন কেউ তাঁর নেই। একা অসহায় একটি প্রাণী—বাঁচবার জন্য অন্তিম চেষ্টা করছেন প্রাণপণে!

বলে ওঠে নীতা—এখনও আমি আছি, বাবা!

—জানি মা, জানি! তবু মাঝে মাঝে মনে হয়—আমার মত পাপী আর কেউ নেই; নইলে এতও দেখছি বাজপড়া বটগাছের মত শূন্য মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে।

হাঁপাচ্ছেন মাধববাবু। নীতা কি ভাবছে।

দুটি ব্যর্থ মন কোথায় এক সুরে অনুরণন তোলে।

মাধববাবু বার বার ভেবে দেখেছেন, তাঁর কথাগুলো নীতার ক্ষেত্রে নিদারুণ নিষ্করুণ

ভাবে সত্য। একটা মেয়েকে সেই যুগে টুঁটি টিপে বিয়ের নামে গঙ্গাযাত্রী বুড়োর সঙ্গে বেঁধে দিত, বছরখানেক পরই বিধবা হয়ে নিজের সব সাধ কামনা চুকিয়ে দিয়ে সংসারের ঘানি টানতো, বইতো কঠিন ব্যর্থ জীবনের বোঝা।

একালেও প্রগতির নাম করে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বয়ে নিজের জীবনের সব আশা ভবিষ্যৎ নষ্ট করার মধ্যেও সেই দিনের ব্যর্থতার সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। নীতা এই যুগের একটি বলি মাত্র—একা নীতা নয়—আরও অনেককে দেখেছেন তিনি।

মাধবাবাবু ক্লান্ত, হতাশা-জড়ানো স্বরে বলেন—ওকে যেতে দে নীতা। জোটে যদি এক বেলাই খাবো। তবু হয়তো নিশ্চিন্তে থাকতে পারবি। ছোটবাবু যেতে চায়, যাক।

—তোমার বইটা কতদূর হল বাবা? নীতা বাবাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে ফেরাতে চায়।

—বই!

—হ্যাঁ তোমার সেই টেক্সট বুক। কথাবার্তা বলে এসেছি।

নীতা বাবার কাছে এসে দাঁড়াল।

চুপ করে কি ভাবছেন মাধববাবু। মেয়ের দিকে চাইলেন।

একটু ক্ষীণ আশার আলো জাগে মনের কোণে। তাঁর বই বাজারে বেরুবে, জনপ্রিয় হেডমাস্টার মাধব সান্যালের বই, বহু স্কুলে চলবে। কত ছেলের নিবিড় সাহচর্যে ভরে উঠবে মন। তাঁর বই হবে বাজারের সেরা বই।

নীতা বাবার স্তিমিত মুখের ক্রমবর্ধমান ক্ষীণ আলোর দিকে চেয়ে থেকে। ..... একটা পথ যেন পেয়েছে বাবার ছাইচাপা কর্মোদ্যমকে জাগাতে—মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে।

মাধববাবু বলেন—বই তো প্রায় শেষ করেছি মা, কিন্তু কে ছাপবে?

—ছাপবে বাবা। এমন বই যে কোন প্রকাশকই নেবে।

—নেবে?

মনে জড়তা কেটে যায় মাধববাবু নীতা বলে ক্ষেত্রে নিদারুণ নিষ্করুণ ভাবে সত্য। একটা

মনের জড়তা কেটে যায় মাধববাবুর। নীতা বলে ওঠে—এখনই আমি দু-এক জায়গায় কথা বলেছি। তুমি শেষ করে ফেল বাবা। তাঁরা ছাপতে রাজি হয়েছেন।

—বলেছিস?

কাদম্বিনীর ডাকে চমক ভাঙে—কই রে নীতা, আপিস যাবি না? বেলা হয়ে গেল। চান-টান কর।

তার আর মিত্তির মশায়ের বাড়ি এবেলা যাওয়া হল না। দেরী হয়ে গেছে।

চমকে ওঠে নীতা—যাই মা!

—হ্যাঁ ওঠ তুই। যাবার বেলা মাধববাবু আবার বলে ওঠেন।

—তাহলে বাকিটুকু শেষ করি? কি বলিস?

—নিশ্চয়ই!

নীতা বাথরুমের চটঘেরা ঠাইটুকুর দিকে ছুটল, ওদিকে বেলা বেড়ে উঠেছে অনেক।

নীতা আপিসের ছুটির পর কি খেয়ালবশেই বই-এর দোকান অঞ্চলের দিকে যায়। দোকানে দোকানে কত বই। ঝকঝকে মলাট। অনেক দোকানের স্বল্প পরিসরের মধ্যে খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক ঘরোয়া হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছেন। জমাট আড্ডা। স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ, অথচ নিজের জগতে এঁরা ভিন্ন সত্তার লোক—শিল্পীসত্তা।

এই অচেনা পরিবেশে কেমন যেন নিজেকে বেশ অসহায় বোধ হয়। দু-চারটা দোকানের

সামনে ঘুরে শেষকালে একটা দোকানেই ঢুকলো, স্কুল-কলেজের বই-এর নামকরা প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান। অজানা আশা আর আতঙ্কে দুরু দুরু কাঁপছে নীতার বুক। তবু এগিয়ে গিয়ে দোকানে ঢুকল।

ভীরু শঙ্কিত মনে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে কী ভাবতে থাকে। একটি সেল্‌স্‌ম্যান এগিয়ে আসে।

—কি চাই আপনার?

নীতার বুকে কাঁপন ধরে; মনে করে, বের হয়েই চলে আসবে নাকি! পরমুহূর্তেই নিজেকে শক্ত করে বলে ওঠে—আপনাদের মালিকের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

সেলস্‌ম্যান ছোকরাটি একবার ওর দিকে আপাদমস্তক দেখে কি ভেবে কাউণ্টারের একটা পাটাতন একটু তুলে পথটা দেখিয়ে বলে—আসুন।

সরু দরজাটার ফাঁক দিয়ে বই-এর দোকানের মধ্যে ঢুকে চলেছে সে লোকটির পিছুপিছু। দেওয়ালের গায়ে থরে থরে সাজানো আলমারি-র‍্যাক-ভর্তি বই। তারই একপাশে একটি বড় বনাতমোড়া টেবিলের সামনে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে দেয় কর্মচারীটি—ওই যে উনি।

নীতা দুর্জয় সাহসে ভর করে এগিয়ে যায়, নিজের কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নেয়, কি ভাবে কথাটা পাড়বে, বলবে সবকিছু। মনের মধ্যে একটা ভরসা পায়। ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখে ভারি গলায় বলে ওঠেন—বসুন, কি দরকার?

নীতা বলে চলেছে কথাগুলো, এ যেন অন্য কারোও কণ্ঠস্বর। কার্যকালে এমনি নির্ভয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে তার বক্তব্যটা পেশ করতে পারবে ভাবে নি নীতা। বাবার জীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি, সেই হতাশা-ভরা চাহনি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মনে বল পায় সে। বলে চলেছে নীতা পরিষ্কার গলায়—চল্লিশ বছর মাস্টারি করেছেন। আজ ইনভ্যালিড হয়েও সেই চিন্তা থেকে বিরত হন নি। পড়াশোনার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কয়েক বছর ধরে লিখেছেন এই বই।

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে নীতা, কপালে ফুটে উঠেছে দু-এক বিন্দু ঘাম। যেন ফাঁসির আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে, আত্মপক্ষ সমর্থন ঠিকমত করতে না পারলেই ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে। তাই মরীয়া হয়ে বলে চলেছে সে। ভদ্রলোক ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করেন—পীরগঞ্জের হেডমাস্টার ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে এসে চাকরি করেছেন। এখন রিটায়ার্ড।

কি ভেবে ভদ্রলোক বলে ওঠেন—কপিটা যদি একবার দেখতে দেন তাহলে দেখেশুনে কথা বলতে পারি।

চমকে ওঠে নীতা। মনের কোণে দপ্‌ করে আনন্দের আভা জেগে ওঠে। হয়তো ব্যর্থ হবে না। আবার নতুন উদ্যমে বাঁচতে পারবেন বাবা, কাজের আনন্দে সৃষ্টির আনন্দে তিনি বাঁচবেন।

জবাব দেয়—আজ্ঞে হ্যাঁ, এনে দোব। কাল এই সময়? আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার।

নীতা বের হয়ে এসে ট্রাম লাইনের দিকে এগোতে থাকে। আলোজ্বলা রাজপথ, কর্মব্যস্ত জনতা। এই মহাজীবনের স্রোতে সেও এগিয়ে চলে। মনটা খুশিতে ভরে রয়েছে। চারিদিকে অনেক বাধা—হোক! তবু বাধা সে উত্তীর্ণ হবে, হতেই হবে। বাবাকে কথাটা জানাবার জন্য

ছটফট করছে মন। কপি দেখলে ওদের পছন্দ হবে, প্রকাশক ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হল বাবার নাম জানেন। বেশ খুশি মনেই বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে নীতা।

অগাধ জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের অবস্থার মত, একটা রুদ্ধ দম বন্ধ-হওয়া অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সনৎ। একদিন স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে মুক্ত অবাধ গতিতে বিচরণ করেছে। সেই প্রাণোচ্ছল পরিবেশ, হাসি-গানের সুরভরা রৌদ্রজ্জ্বল জীবন থেকে গুমোট এই চার-দেয়ালে-ঘেরা আপিসের সীমায় বন্দী হয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। যেমন কাজ তেমনই লোকজন আর তেমনই পরিবেশ! দম বন্ধ হয়ে আসে সনতের। এখানে সাহেব বড়সাহেব ছাড়া কথা নেই।

আপিসের প্রবোধবাবু মাঝে মাঝে রাজনীতির তর্ক করে। সাবেক কালের গ্র্যাজুয়েট—সেই মর্যাদাটুকু নিয়েই এক ছত্রাধিপত্য করেছিল এতদিন—প্রথম দিনই সনৎকে দেখেই একটু অসন্তুষ্ট হয় সে। বড়বাবু হেঁকে বলে—একজন এম-এ পাশ এলেন হে প্রবোধ!

প্রবোধ একটু চমকে ওঠে। এ ঘরের মধ্যে শিক্ষার দিক থেকে সেই ছিল সবার উপরে। সেই সম্মানটুকু নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওই সনৎ যেন এসে পড়েছে। টেবিল থেকে মাথা তুলে প্রশ্ন করে প্রবোধ—কোন ক্লাশ?

বড়বাবু একজন কেরানীর ডিবে থেকে ভিজে-ন্যাকড়া-জড়ানো পানটা মুখে পুরে চাট্টি দিলীপের জর্দা হাঁ-এর মধ্যে ছিটিয়ে দিয়ে একটু সামলে জবাব দেয়—

—অত শত জানি না বাবা। নিজে ফোর্থ কেলাস পর্যন্ত, প্যারীচরণ সরকারের ঘোড়াপাতা অবধি বিদ্যে, তাই জানি। এত কেলাস জানলে এখানে কি আসতাম। কি বল সুহাস।

সুহাস তৈরি ছিল। বলে ওঠে—তা সত্যি, কিন্তু ওই বিদ্যে নিয়ে তো কত সাহেবের ড্রাফটের তো ভোল বদলে দিলেন। সব এক্সপিরিয়েন্স, পাশটাশ এখানে বাজে কথা স্যার। চাই প্রতিভা।

বড়বাবু খুশি হয়েছে। হোঁদলকুতকুতের মত ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসতে থাকে।—কি যে বল! তবে চিনতো বটে কাথবার্ট সাহেব। বলেছিল, ইংল্যাণ্ডে জন্মালে তুমি ইণ্ডকেপ হতে পারতে হে,—বিজনেস ম্যাগনেট হয়ে যেতে।

প্রবোধবাবু তখনও আগন্তুক সনতের কথাটা ভোলেনি। বেশ একটু বিরক্তই হয়েছে মনে মনে। পেন্সিল-এর শিষ বাড়াতে বাড়াতে বলে ওঠে—ওসব থার্ডক্লাশ এম-এ। অন্য কিছু হলে স্কুল কলেজে ভালো মাস্টারি, প্রফেসারি পেতো, না হয় রিসার্চ করতো। আজকাল ওই লাইনে ভাল পয়সা। আমারই ছোট ভাই—বুঝলেন কিনা—সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হল, লুফে নিয়ে গেল দুধোরিয়া কলেজ। ওরা না হোমে না যজ্ঞিতে লাগা এম-এ পাশ। ওই তিন নম্বর এম-এর দল।

দূর থেকে কথাটা শোনে সনৎ। হাতের কলম নামিয়ে রেখে কি ভাবছে। দিন দিন এই পরিবেশে বিষিয়ে ওঠে তার মন। এমন জানলে এই পথে আসতো না। কিন্তু ফেরবার পথও যেন বন্ধ। কি ভুল করেই আটকে ফেলেছে নিজেকে, একটা দায়িত্ব নিয়ে!

নীতা হয়তো জানতো সনৎকে— তার প্রকৃতিকে। তাই উৎসাহ দিয়েছিল অন্য পথে এগিয়ে যাবার জন্য। পড়াশোনা করা, অধ্যাপনাই তার স্বভাবসিদ্ধ পথ ছিল। কি যেন মোহে

হঠাৎ একটা ভুল করে বসেছে—যার জন্য আদম-ইভের মত অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এই নির্মম জগতে ছিটকে এসে পড়েছে!

টিফিন করছে দু-একজন বাবু। চা আর মুড়ি। বড়ো জোর তার সঙ্গে একটা সস্তা দরের কলা। তাই পরম তৃপ্তি ভরে খায় তারা খুঁটে খুঁটে।

সনৎ ক্রমশঃ যেন তাদের দলে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। তিনশো টাকায় তার সীমানা, তারই মধ্যে সবকিছু। গীতার খরচ, বাড়ির ঝিয়ের মাইনে, টুকিটাকি অনেক কিছু। শেষতক ঠেলতে ঠেলতে এসে মাত্র টিফিনের উপরই টান পড়ে। একমাত্র ওইটাই দৃশ্য বাজে-খরচ পর্যায়ে পড়ে। তাই ওটাকে সবাই ওই মুড়ির খাতেই এনে ফেলেছে।

হঠাৎ বড়বাবুর হাঁকডাকে সকলে চমকে ওঠে। প্রবোধবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে।

—কি হল?

বড়বাবুর টাক ঘামছে। যেন চাকরি যাবারই উপক্রম। হুঙ্কার ছাড়ে।

—ও মশাই সনৎবাবু, আরে চাকরি যে নট হয়ে যাবে মশাই! আপনার তো হবেই, সেই সঙ্গে আমারও। কি লিখেছেন মশাই? কাস্টমারকে এমনি কড়া চিঠি লিখলে কোম্পানির ব্যবসা লাটে উঠবে। তখন কি চারহাত বের করে খাবেন?

—কি হয়েছে?

সনৎ একটু ঘাবড়ে যায়। ঘরের সব বাবুরাই উঠে পড়েছে, সকলেই তার দিকে চেয়ে দেখছে। প্রবোধবাবুর মুখে হাসির আভা—আরে মশাই, একালের এম-এ পাশ তখনকার দিনের এনট্রান্সের সমান। আমাদের কালে বি. এ. পর্যন্ত উঠতে নাক দম হয়ে যেতো। ইংরাজি? ইংরাজিতে ডুবে থাকতাম; স্বপ্ন দেখতাম।

কথা বলে না সনৎ! বড়বাবুই তড়পে চলেছে।

—আসুন মশাই, লিখুন যা বলি। ছিঃ ছিঃ এই লেখাপড়া শিখেছেন আপনারা এত খর্চা করে?

ড্রাফটের পাতাটা আগাগোড়া কেটে ফেলে। চমকে ওঠে সনৎ। তার গালে অতর্কিতে কে যেন প্রচণ্ড একটা চড় কসেছে। প্রবোধবাবুর মুখে বিজ্ঞের হাসি। আরও দু-চারজন বেশ উপভোগ করছে দৃশ্যটা।

জীবনে এত বড় অপমানিত বোধ করে নি কখনও সনৎ। অভাবের মধ্যেই জীবন কেটেছে তবু সেখানে এত বড় অবমাননার কোন আয়োজনই ছিল না। এখানে মাত্র ওই কটি টাকার বিনিময়ে সে তার সব কিছু বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে। এত অসহায় হয়ে পড়েছে সে।

—লিখুন মশায়।

সনৎ ঘোড়ার পাতামার্কা ইংরাজি বিদ্যাধারি বড়বাবু দেবতার ডিকটেশন লিখছে। উইথ রেফারেন্স টু ....

—ঠিক করে লিখুন মশায়। বানান-টানান যেন ভুল না হয়।

সনৎকে ধরে ওরা যেন এক পোঁচ কালি মাখাচ্ছে গা-মাথা ভরে; হাত-পা বেঁধে রেখেছে তার; ওরা সকলে ধরেছে—পোঁচড়া টানছে ওই কিম্ভূতকিমাকার লোকটা।

তার ইকনমিক্সের বিদ্যা কোন কাজেই লাগবে না এখানে। ছকবাঁধা কাজ, ফরম ভর্তি করা, মালের জায়মত হিসাব রাখা, যোগ দিয়ে দর ফেলে খদ্দেরকে জানানো। তাতেই বড়বাবুর এত হাঁকডাক।

একজনের কথা মনে পড়ে বার বার—পি. এইচ. ডি. হতে পারলে সম্মানজনক চাকরির অভাব হবে না। তুমি পারবেই চেষ্টা করলে।

টিকিওয়ালা জরদগব বড়বাবু মাথা নাড়ছে—লিখুন—লিখুন—নাও, মার্কেট প্রাইস ইজ রাইজিং টু দি স্কাই।

সনৎ জবাব দিয়ে ওঠে—আমার দ্বারা ঠিক হচ্ছে না বড়বাবু, ওটা প্রবোধবাবুকেই দিন ঠিক হবে। না হয় আপনি দয়া করে—

বড়বাবুর গর্বে বুক ফুলে ওঠে—

—তাই বলুন মশায়। শিখুন, দেখে শিখুন—ঠেকে শিখুন। সব ঠিক করে দিচ্ছি। সারানডারই যখন করলেন। ওহে প্রবোধ।

চোখ কান ঝাঁঝা করছে সনতের। মনে হয়, স্বেচ্ছায় কি নেশার ঘোরে মেতে উঠে এই দুঃসহ অপমানের মধ্যে এসে পড়েছে সে তার প্রকৃত পথ ছেড়ে। ফেলে-আসা জীবনে সেই দুঃসহ কষ্টের মধ্যেও সান্ত্বনা ছিল, ছিল মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাবার উদ্যম, কল্পনা। কার স্নিগ্ধ ডাগর চোখের মনছোঁয়া চাউনি অন্ধকারের মাঝে আলোর নিশানা আনতো।

আজ সেই জীবন কোথায় হারিয়ে ফেলেছে—হারিয়ে ফেলেছে সেই পথ। তবু ফিরে যেতে মন চায় বার বার।

গীতার মনে এসেছে স্তিমিত ভাটার টান। উদ্দাম জোয়ারে ভরা নদীর মত মাতাল ছন্দে এগিয়ে এসেছিল সে কূলের সন্ধানে। সমস্ত প্রাণশক্তি সেই উত্তেজনার আবেগে যেন নিঃশেষিত প্রায়। আজ মনে মনে সে ক্লান্ত; নীতার উপর রাগ করেই গীতার দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল সনৎ।

অনায়াসেই জয়লাভ করে গীতার মনেও সেই নেশার আকর্ষণ কমে গেছে। গতিহীন স্তিমিত জীবন। বিয়ের আগেকার দিনগুলো বার বার গীতার মনে জাগে। কলোনির দিনগুলো, গুপীদার সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, গান গাওয়া। কত মনের সামনে রঙীন প্রজাপতির মত পাখনা মেলে উড়ে বেড়াতো সে। সেদিনের গীতা আজ কোথায় এসে থেমে গেছে। সেই উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী আজ পথ হারিয়ে কোন্ রুদ্ধপুরীতে বন্দী হয়ে বসে আছে। সনৎকে পেয়ে ভেবেছিল এই তার জীবন। আজ ক-মাসেই ক্লান্তি এসেছে তার, মনে মনে একটা চাপা বিক্ষোভ জাগছে তিলে তিলে। যা আশা করেছিল তা হয়নি। সনতের মনেও একটা শূন্যতা রয়ে গেছে, সেইখানে গীতার কোন ঠাঁই নেই এটাও সে বুঝেছে।

আজ মায়ের উপরও ক্ষোভ হয় গীতার; সনৎকে পেয়ে তার ঘাড়ে চাপিয়ে পাপ বিদায় করেছিল। কিন্তু সনৎ ঠিক যেন কোনখানে তাকে মেনে নিতে পারে নি। সমস্ত দিতে গিয়েও কোথায় বাধা ঠেকে সনতের, তার মনের কোণে আজও নীতার নিঃশব্দ সঞ্চরণ।

গীতার সেইখানে কোন ঠাঁই নেই—সে অবাঞ্ছিতা।

সনৎ সেদিন আপিস থেকে ফিরতে দেরি করছে দেখে বিরক্ত হয়ে ওঠে গীতা। স্নান প্রসাধন সেরে অপেক্ষা করছে, কোথায় সিনেমা দেখতে বেরুবে। কিন্তু সনতের কোনদিকে খেয়াল নেই, সেও এড়িয়ে যেতেই চায় গীতার সঙ্গ। আবছা অন্ধকারে মনের ভিতর একটা অহেতুক আতঙ্ক জাগে।

মনে পড়ে অতীতের কথাগুলো। নীতার সঙ্গে ওর দশ বছরের ঘনিষ্ঠতা বহুবার দেখেছে, নীতা তাকে পড়ার খরচ জুগিয়েছে, বই কিনে দিয়েছে নিজের টুইশানির ও জল-পানির টাকায়। তার এই অপব্যয়ের জন্য নীতা বাড়িতে কথা শুনেছে কিন্তু কোনদিনই প্রকাশ করে নি। এতদিনে গীতা বেশ বুঝেছে নীতা আর সনতের মাঝে ছিল কতখানি নিবিড় সম্পর্ক। সেটা টের পাওয়ার পর থেকেই মনে মনে জ্বলে উঠেছে নীরবে।

ঘড়ির কাঁটা চলেছে একটানা ছন্দে। সিনেমার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তখনও দেখা নেই সনতের। টিকিট দুটো টেবিলের উপর উড়ছে হাওয়ায়। গীতার মনে আলগা চিন্তার ঝড়—একটা চাপা রাগ উঠছে ক্রমে ক্রমে। সনতের এই অবজ্ঞা—অবহেলা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাত হয়েছে। সাতটা বেজে গেছে। শীতের সন্ধ্যা, এরই মধ্যে নিবিড় আঁধার নেমেছে। ছোট গলিটা গ্যাসের আলোয় থমথমে; কেমন অলস সন্ধ্যা মনের সব আলোকে ঘিরেছে তমসায়—হতাশা জড়ানো তমসা ওর চাবিদিকে!

হঠাৎ সনৎকে ঢুকতে দেখে ফিরে চাইল, বেশ ঝাঁঝালো স্বরে গীতা প্রশ্ন করে—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? টিকিট দুটো—

সনৎ ওর দিকে চাইল। গীতাও অবাক হয়ে গেছে। মুখচোখ ওর থমথমে, বগলে একগাদা বই-খাতা।

সনৎ বলে ওঠে—বইগুলো আনলাম, দোকানে গিয়েছিলাম।

বিদ্রূপ করে গীতা—বুড়ো বয়সে আবার সুমতি হয়েছে দেখছি!

সনৎ ওর কথার সুরে একটু আহতই হয়; ধীর কণ্ঠে জবাব দেয়—আবার পড়াশোনা করবো ভাবছি। দেখি যদি থিসিস সাবমিট করতে পারি। ও চাকরি ঠিক আমার পোষাবে না।

সনৎ হতাশ সুরে কথাগুলো বলে, গীতা শিউরে ওঠে মনে মনে। হঠাৎ পড়াশোনার আগ্রহ জেগে উঠতে দেখে একটু চিন্তায় পড়েছে, একটু আতঙ্ক মেশানো চিন্তা! তবে কি আবার যোগাযোগ গড়ে উঠেছে নীতার সঙ্গে, তার পরামর্শেই আবার চলেছে সে।

—চাকরি ছেড়ে দিয়ে কী করবে শুনি?

—ছাড়ি নি এখনো, তবে—ছাড়তে পারলেই ভাল হত!

—সে কম্ম করে এলেই পারতে! ঝাঁঝ ফুটে উঠে গীতার কথার সুরে; জিভে যতটুকু গরল ছড়ানো সম্ভব ছিটিয়ে বলে ওঠে—আবার মন্ত্রণাদাতা জুটেছে বোধ হয়?

কথাটা শুনে ফিরে চাইল সনৎ। গীতার দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে ঘোষণা করে সনৎ—মন্ত্রণাদাতা যে ঠিক কথাই বলতো এটা আজ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

একটি মুহূর্তে গীতার মনে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের স্তূপে যেন অগ্নিসংযোগ ঘটেছে; ফেটে পড়তে গিয়েও কোনরকম সামলে নিয়ে সরে গেল! মাথা ঝিমঝিম করছে অসহ্য রাগে—এত বড় কথাটা সনৎ তাহলে চেপে ছিল তার কাছে!

চোখের সামনে গীতা দেখতে পায় এ বাড়িতে তার ঠাঁই কত খানি—তার তুলনায় নীতা আজও সনতের নিকটতমা।

ভাল ভাবেই অনুভব করে গীতা। সে জেতে নি, জিতে রয়েছে নীতাই অনেক আগে থেকে।

মাধববাবু নতুন উৎসাহে আবার কাজে লেগেছেন, বইখানা শেষ হয়ে গেছে। নীতাই ঘোরাঘুরি করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। মাধববাবুর কুঞ্চিত বয়সজীর্ণ মুখে আবার আশার আলো ফুটে উঠেছে। এক-একটি ছেলে ওই পদের। মণ্টু দু-পয়সা রোজগার করার পর থেকেই সরে গেছে সংসার থেকে। বড় ছেলে শঙ্কর—সেও সংসারের বোঝা। ইদানীং আবার সেও কোথায় বাইরে গেছে। বেপাত্তা বোধ হয়। থেকেও না থাকা। মাধববাবু দুঃখ করেন।

—তুই আমার সব নীতা। বুড়ো বাপের প্রতি ছেলেদের যে একটা কর্তব্য আছে সেটুকুও তারা স্বীকার করে না।

নীতা চুপ করে থাকে। এ বাড়ির জীবনযাত্রায় একটা স্তিমিত চাঞ্চল্যহীন ভাব এসেছে। সে যার জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। কেবল তার নিজেরই কোন পথ নেই—মতও নেই। বিরাট জগদ্দলের সঙ্গে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। নড়াচড়ার পথ নেই।

চাকাটা ঘুরে চলেছে তবু। নীল স্তব্ধ আকাশ আর ছায়াঢাকা কলোনির পরিবেশ। শূন্য লাগে কেমন তার। বিকালের সোনারোদ জেগে উঠে আবার ফিকে হয়ে যায়। পাখি ডাকে, জলার বুকে কচুরিপানার হালকা বেগুনী রঙের ফুলগুলো হাওয়ায় কাঁপে। পথ দিয়ে আনমনে যায় দু-চার জন। আশেপাশে ক্ষেতে পাটগাছের আবছা সবুজ আভা জাগে ছোট খালের ধারে। দু-একটা কলাগাছ বাতাসে মাথা নাড়ছে।

কেমন উদাস হয়ে ওঠে মন। নীতার দিনগুলো কেটে চলেছে। জীর্ণ পাতার মত ঝরছে একটা দুটো করে। বৈচিত্রহীন স্বাভাবিক গতিতে। কাদম্বিনী একটা কাঁটার মত খচখচ করে ওঠে মাঝে মাঝে এই স্তব্ধ জীবনযাত্রায়। গীতা একবার এসেছিল কদিন আগে; নীতা আপিসে বের হবার সময়।

ওকে দেখে নীতাই একটু থামল।

মা ব্যস্ত হয়ে পড়ে মেয়ের তদারকে। দেখছে মেয়েকে, কেমন যেন গীতার মুখে একটা কালো ছায়া।

কেমন আছিস? নীতা প্রশ্ন করে।

—ভালোই! জবাব দেয় গীতা। কোনরকমে সামনের থেকে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। ওর দিকে চাইল নীতা, কোথায় যেন কি একটা গোলমাল বেঁধেছে। কিন্তু ওদিকে তার অপিসের দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়ে।

আসল খবরটা জানতে পারে নীতা বাড়ি ফিরে সেই সন্ধ্যাবেলায়।

কাদম্বিনী মুখ ভার করে আছে।

গীতা বিকালেই ফিরে গেছে কলকাতায়। গজগজ করছিল কাদম্বিনী। সোজা কথায় কোন কিছু বলা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। টেরা বাঁকা কথায় ফোড়ন কাটে, ঠিক বুঝতে পারে না নীতা। তবে এটা বেশ বোঝে— তারই উদ্দেশ্যে এই চোখা বাক্যবাণ ছাড়া হচ্ছে।

মা গজগজ করে চলেছে।

—লজ্জা বলে বস্তু আমাদেরও ছিল। এই এতখানি ঘোমটা। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবো, হাসবো কি? ছিঃ লজ্জা করে না! তা হলই বা আগেকার চেনা।

নীতা একবার দাঁড়াল মাত্র, কোন কথাই বলে না।

কাদম্বিনী যেন ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত পা দিয়ে মাটি ছিটোচ্ছে। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পেলেই হয়, একটু ছুতোয় নাতায় কথা উঠলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। ধারালো নখ দাঁত বিস্তার করে ছিঁড়ে ফেলবে টুকরো করে। মাকে চেনে, তাই চুপ করে সরে গেল নীতা, তবু শব্দভেদী বাণ ঠিক লক্ষ্য ভেদ করছে।

বাবার ঘরে কি কাজ করছিল নীতা, বাবা ওর দিকে চাইল।

মাধববাবু বলে ওঠেন—সনৎ নাকি চাকরি করতে চায় না! শুনলাম আবার পড়াশুনা করবে।

চমকে ওঠে নীতা—তা কি করে হয়?

যে পথ পিছনে ফেলে গেছে সনৎ সেখানে ফেরা আর অসম্ভব। এখন দায়িত্ব বেড়েছে তার। অনেক দায়িত্ব।

মাধববাবু বললেন—তাই তো গীতা বলছিল।

মৌকা পেয়ে কাদম্বিনী ঘরে ঢোকে কি অছিলায়। মাকে দেখে নীতা বের হয়ে গেল। মাধববাবুকে বলে ওঠে কাদম্বিনী—হবে না? কানে যে মন্তর পড়েছে। ফুসমন্তর। **ছিঃ ছিঃ,** কালামুখী কি ঘর না জ্বালিয়ে ছাড়বে না। গীতার বরাতে শেষ কালে কিনা—

মাধববাবু থামিয়ে দেন—চুপ কর বড়বৌ! ওকে আর দগ্ধে মেরো না।

—চুপ করেই তো আছি। বলে না—

কথা কইবো কোন ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে।

নীতা মায়ের কথাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। সনতের এই মত পরিবর্তন কত বড় বিপর্যয় আনবে তা জানে। বাধাই সে দেবে সনৎকে। তবে মনে হয় এতখানি সরল দৃঢ়মনা নয় সনৎ, তাহলে তাদের জীবন আজ অন্যপথে চলতো। ওমনি সহজে তারা পথ হারাতো না। এটাও সনতের মনে ক্ষণিকের চাঞ্চল্য মাত্র।

রাত্রির অন্ধকার ছেয়ে আসে ঘরে-বাইরে। হঠাৎ কেমন ঝড় ওঠে পশ্চিম আকাশে। সর্বনাশা ঝড়। সব শান্তি উড়ে পুড়ে ছাবখার হয়ে যায়, সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায় নীতার মনে। একটা কালো মেঘ আকাশের কোল থেকে ঘূর্ণির সঙ্কেত নিয়ে এগিয়ে আসে; সংসারের জীর্ণ নৌকাখানা পাল ছিঁড়ে হাল ভেঙে অতলে তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

আশেপাশে কেউ নেই। শঙ্কর বাইরে। একা নীতা হিমসিম খেয়ে যায়—কোনদিকে কূল কিনারা পায় না। কাদম্বিনী বুক চাপড়ে কাঁদে।

—হেই ভগবান! এ কি করলে তুমি? এই ছিল তোমার মনে।

নির্বাক হয়ে গেছে বাজপড়া বটগাছ, বাতাসের মৃদু স্পর্শ টুকুও স্তব্ধ হয়ে গেছে ওর পত্রহীন অর্দ্ধমৃত শাখা কাণ্ডে। মাধবমাস্টার চুপ করে বসে আছেন—মনে ওই দুরন্ত ঝড়ের পূর্বাভাস ফুটে ওঠে ঠোঁটের নীরব কাঁপুনিতে। অসহায় ক্লান্ত হতাশ একটি মানুষ।

চোখের সামনে দেখছিলেন দিনগুলো কেমন বদলাচ্ছে। প্রাচুর্য থেকে এল অভাবের দিন, ক্রমশঃ সেই জঘন্য পরিবেশে বাস করবার জন্য শুধু বেঁচে থাকার তাগিদেই ওদের স্বভাব বদলালো, সংস্কারও বদলে গেছে। আজ সব যেন চোর বাটপাড় হয়ে উঠেছে। মা তার স্নেহ ভুলতে বসেছে! ভাই ভুলেছে তার কর্তব্য। এই ছোট্ট সংসারের মাঝেই সেই বিরাট সামাজিক সর্বনাশের সামান্য প্রতিবিম্বও দেখেছেন মাধববাবু।

এমনি তালগোল পাকিয়ে যদি সবকিছু চলতো তাহলে ও কথা ছিল। কিন্তু কিছু মানুষ এর মধ্যে রয়ে গেছে। তারাই আজও এই পরিবর্তনের স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করে—আঁধারে পথ খোঁজে। তারাই দুঃখ পায় বেশি, কষ্ট পায়—তবু মাথা নোয়ায় না।

এই চরম বিপদেও নীতা আজ তাই উঠেপড়ে লেগেছে।

ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে কেমন করে মেশিনে মন্টুর একটা পা আটকে যায়। ফোরম্যান ওর কাছেই ছিল, তক্ষুণি মেশিন বন্ধ করে টেনে বের করেছে। মণ্টু প্রাণে বেঁচে আছে মাত্র। অজ্ঞান হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। অবশ্য কোম্পানিও গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে এই দুর্ঘটনার জন্য। সব ব্যবস্থাও করছে তারা।

নীতা খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটেছে।

এ এক অন্য জগৎ। এখানে কে কার কড়ি ধারে। নার্স ডাক্তাররা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে—বন্ধুবিহীন জগৎ। তারই মাঝে একা দাঁড়িয়ে আছে নীতা। বিশাল বিশ্বে সে যেন হারিয়ে গেছে দুঃখের তমশায়।

মণ্টুর জ্ঞান অল্প অল্প ফিরেছে। ডাক্তার নির্দেশ দেন—আজই ব্লাড চাই।

—ব্লাড!

—হ্যাঁ, ব্লাডব্যাঙ্কে টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে যান। দাম দিলে হয়তো ব্লাড মিলবে।

দাঁড়াবার সময় নেই নীতার। তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল। মেডিক্যাল কলেজের বড় বাড়িটার দিকে পা বাড়ায় সে।

কর্মব্যস্ত মহানগরী। তারই স্রোতে খড়কুটোর মত এ-ঘাটে ও-ঘাটে ভেসে ফিরছে একটি মেয়ে। সারাটা দিন কেটে গেছে তার নানা ঝামেলায়। রক্ত আনতে কখনও ছুটেছে, কখনও ছুটেছে ইনকেজশন ওষুধ কিনতে। সব ঝামেলা চুকিয়ে যখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তখন হাসপাতালের ঘন সারিবদ্ধ দেওদার গাছের মাথায় পড়ন্ত দুপুরের অভ্ররোদ গেরুয়া হয়ে আসে।

ঘামে নেয়ে উঠেছে। সারা দিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। একটু জিরিয়ে বিকালে মণ্টুকে দেখে বাসায় ফিরবে সন্ধ্যা নাগাদ।

কি ভেবে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে গীতার বাসার দিকে চলতে থাকে নীতা। এ সময়ে সনতের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। এ অবস্থায় সনৎ যেন তাকে ভরসা দিতে পারবে—আর ভরসা পেত শঙ্কর থাকলে। কিন্তু সেও বাইরে চলে গেছে—অনেক দূরে। একা দাঁড়াতে হবে তাকে বিপদের মাঝে—সামলাতে হবে সবকিছু।

একাই চলবে সে! কেমন যেন মনের মধ্যে একটা সুর বেজে ওঠে। নিজেকে যখনই একক সত্তা হিসেবে দেখেছে তখনই মনে হয় ঝড়ের কি সুর বাজে তার মনে। ওই উদাস হাওয়া আনে তার মনে অদম্য ক্ষমতা—প্রেরণা। মহাজীবনের বিচিত্র প্রকাশ। দুঃখ জয়ের সাধনা! ছোট্ট রুমালটা দিয়ে ঘাম মুছে এগিয়ে চলে। দুপুরের শহর আবার ধীরে জেগে উঠেছে!

সনৎ কিছু দিন ছুটি নিয়েছে আপিস থেকে। একটা প্রফেসারি পাবার আশা করছে। মাঝারি কলেজ হোক, তবুও সেই কাজই নেবে সে। কেরানীগিরির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। আপিসের সেই পরিবেশ—বড়বাবু, গজেন সামন্তের বেহায়া কথাবার্তাগুলো মনে পড়লেই শিউরে ওঠে।

কতকগুলো দৈত্য যেন তাকে বেঁধে পিষে মেরে ফেলতে চায়।

অলস দুপুর। গীতা ঘুমুচ্ছে খেয়েদেয়ে। কদিন থেকে ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ তার মনে ফেটে পড়েছে ধীরে ধীরে। সনতের এই নিশ্চিন্ত জীবন থেকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝে পাড়ি জমানোটা কিছুতেই ভালো চোখে দেখতে পারে না গীতা।

সনৎ মরীয়া হয়ে উঠেপড়ে লেগেছে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জেগে ওঠে বিক্ষোভের একটা ব্যবধান।

হঠাৎ এই রোদের মধ্যেই নীতাকে আসতে দেখে বিস্মিত হয় সনৎ। উঠে এসে অভ্যর্থনা জানায়—এসো এসো ভেতরে, ঘেমে, নেয়ে উঠেছো যে!

সনৎ ফ্যানের রেগুলেটারটা পুরো পয়েন্টে বাড়িয়ে দেয়। নীতা বলে ওঠে—উঃ যা, রোদ!

ছাতা কোলে রেখে চেয়ারটা টেনে নেয়—জল দাও একগ্লাস! গীতা কোথায়?

নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দেয় সনৎ—খেয়ে ঘুমুচ্ছে।

নীতা একবার ওর দিকে চাইল। কেমন শান্তি আর নিশ্চিন্ততার মাঝে নিজেকে মেলে দিয়েছে। আর সে! উল্কার বুকপোড়া জ্বালা নিয়ে ছুটে চলেছে অসীম আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। মন থেকে সেই ভাবনা মুছে ফেলে নীতা।

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিজেই একনিঃশ্বাসে শেষ করে বসলো নীতা। তখনও হাঁপাচ্ছে। ঠাণ্ডা জল খেয়ে একটু দম ফিরে পায়। সনৎ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে—ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা। ওর দেহ-মনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। আরও শীর্ণ হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি।

নীতা বলে চলেছে—মণ্টু অ্যাকসিডেণ্ট করে নীলরতন সরকার হাসপাতালে রয়েছে। ডান-পা খানাই হয়তো অ্যামপুট করতে হবে। বেঁচে হয়তো যাবে—কিন্তু টিকে থাকবে পঙ্গু হয়ে।

সহজ ভাবে কথাটা বলে নীতা। কোথাও এতটুকু দ্বিধা নেই! কঠিন বাস্তবকে মেনে নিয়েছে সে।

চমকে ওঠে সনৎ—কি বলছো তুমি?

নীতা কথা বললো না! চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। সনতের মন নীরব সমবেদনায় ভরে ওঠে। সবাই, এমন কি সেও তাকে বঞ্চনা করেছে। আঘাত দিয়েছে তাকে অদৃষ্টও। তার তুলনায় গীতা অনেক শান্তিতে আছে। তবু জ্বলছে অহরহ নীতা!

সে স্বাভাবিক ভাবে সর্বংসহা ধরিত্রীর মত মুখ বুজে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে।

—নীতা! সনৎ ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

হঠাৎ পর্দাটা ঠেলে গীতাকে ঢুকতে দেখে সরে এসে বসলো সনৎ। উত্তেজনায় তখনও তার মুখচোখ থমথমে।

গীতা দুজনের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজছে। অসময়ে—এই নির্জন দুপুরে নীতাকে এখানে আসতে দেখে সে অবাক হয়েছে। একটু রাগও হয় গীতার নীতার এই অস্বাভাবিক দৃষ্টিকটু ব্যবহারে।

সনৎ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে—নীতা এসেছে স্নানটানের ব্যবস্থা করে দাও।

মণ্টুর দুঃসংবাদটা প্রকাশ করতে সাহস পায় না সনৎ। এখুনি হয়তো কেঁদে-কেটে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে গীতা। সামান্যতেই অধৈর্য হয়ে ওঠা গীতার স্বভাব। তাই ও প্রসঙ্গ আপাততঃ চেপে যাবার চেষ্টা করে সে।

নীতা একটু অবাক হয়েছে গীতার এই উদাসীন বিরক্তিজনক ব্যবহারে। নিজে অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। গীতার সেদিকে নজর নেই।

সনতের প্রশ্নে জবাব দেয় গীতা, বেশ একটু ব্যঙ্গের সুরে—তা তো দেখছি! নীতাকে প্রশ্ন করে—কতক্ষণ এসেছিস? অনেকক্ষণ মনে হচ্ছে।

নীতার সম্বন্ধে সব ভাবনাগুলো ভিড় করে এসেছে তার মনে।

গীতার মনের জ্বালা ফুটে ওঠে। সনৎকে সেই মন্ত্রণা দিয়েছে। সেইই তাকে চাকরি ছেড়ে আরো কম মাইনেতে কোন ছোট কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ নিতে অনুরোধ জানিয়েছে!

গীতার কথাগুলোর পিছনে কি কদর্য ইঙ্গিত আছে তা বেশ বুঝতে পেরেছে নীতা। সারাদিন তার কেটেছে দুশ্চিন্তায়; স্নান খাওয়া নেই, তারপর এই হীন অপমান সহ্য করার মত মানসিক প্রস্তুতি তার ছিলনা। সারামন জ্বালা করে ওঠে।

কি যেন বলতে গিয়ে উঠে পড়ল নীতা চেয়ার থেকে। এর চেয়ে বাকি সময়টুকু না হয় স্টেশনে কাটিয়ে আবার হাসপাতালে ফিরে যাবে। তবু ওর সামনে থেকে সরে যেতে চায় নীতা। এ ঘর থেকেই চলে যাবে—এখানে নীতার জন্য নেই কোন সান্ত্বনা—কোন আশ্রয়। ছাতাটা নিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

চমকে ওঠে সনৎ—ও কি! উঠলে যে?

নীতা জবাব দেয়—হ্যাঁ, এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা চলি!

সনৎ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে।

নীতা তার সামনেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় চরম বিপদের দিনে অপমানিত হয়ে ফিরে গেল তারই বাড়ি থেকে। অথচ সেইই বছরের পর বছর নিজের পরিশ্রম ও কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে তার পড়ার খরচ ও মেস চার্জ যুগিয়েছে।

নীতা কোন দিনই প্রতিবাদও করবে না; এত বড় অবিচার অপযশ বঞ্চনার কোন প্রতিবাদই সে করে নি। বজ্রাহতের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সনৎ।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে—সনৎ আর গীতা। গীতার বুকে সন্দেহের বিষজ্বালা।

মনছাপানো ঝড় গর্জাচ্ছে সনতের মনে। বলে ওঠে সনৎ—ওকে যেতে দিলে?

সনতের কথায় বলে ওঠে গীতা—আমার কাছে তো আসে নি, যার কাছে এসেছিল আতিথ্য দেখানো উচিত ছিল তারই।

কণ্ঠে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের জ্বালা ফুটিয়ে গীতা বলে ওঠে—যাও, পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনোগে। দেহি পদপল্লবমুদারম্—

সনৎ রাগ চেপে ধীর কণ্ঠে বলে ওঠে—অনেক কিছুই ভেবে নিয়েছো, কিন্তু ওকে আজও চেনো নি। কেন এসেছিল তাও জানো না।

—থাক। আর জেনে দরকার নেই। যা জেনেছি তাই ঢের।

গীতার সব জানা হয়ে গেছে। জ্বলছে সে মনে মনে। ওদের দীর্ঘ দিনের গভীর পরিচয়—একটা পরিণামে পরিণত হবার আগেই গীতা এসেছিল তার জীবনে। ভেবেছিল গীতা বদলে ফেলবে সনৎকে, পাঁচজনের মত শান্তির ঘর-সংসার করবে।

কিন্তু আজ বুঝছে পদে পদে নীতা ওর মনের কত গভীরে আসন পেতেছে, সেখান থেকে গীতার সাধ্য নেই নীতাকে ফিরিয়ে দিতে। তবুও সামাজিক দাবিতে গীতা আজ নিজের অধিকার জানায়, কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ করে। বলে ওঠে—মায়ের পেটের বোনকে চিনি না আমি! শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করো না। ছিঃ ছিঃ, লজ্জা হওয়া উচিত তোমার। ওই বেহায়া ঢলানী—

বাধা দিয়ে ওঠে সনৎ রুদ্ধ কণ্ঠে—গীতা।

—মারবে নাকি? তাও হয়তো আজ পারো। আচ্ছা!

গীতা ভিতরের দিকে চলে গেল।

একা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সনৎ। ওই পলাশফুলের মত বর্ণসার মেয়েটির মনের তীব্র বিষের জ্বালায় তখনও জ্বলছে সে। নিজের জন্য নয়, নীতাকে এই অবস্থায় এমনি কুৎসিৎ ভাবে অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে তারই বাড়ি থেকে, এই কথাটা বহু চেষ্টা করেও

সে ভুলতে পারে না। ওকে থামিয়ে দিতে পারে সনৎ, কিন্তু প্রতিবাদ করলেই এখুনি কেঁদেকেটে গীতা পাড়া মাথায় করবে। আশেপাশের ছাদে বৌ-ঝিরা উঁকিঝুকি পাড়বে কৌতুহলী দৃষ্টিতে। একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি বাধাতেও গীতার বিন্দুমাত্র আটকাবে না। সেই কেলেঙ্কারির হাত থেকে বাঁচবার জন্যই সনৎ চুপ করে গেল আপাততঃ।

—কোথা যাচ্ছো?

গীতা সাজগোজ করে বের হয়ে গেল কোন জবাব না দিয়েই।

দুপুরের জনহীন হাসপাতালের রূপ বদলে গেছে বৈকালের জনারণ্যে। কাতারে কাতারে লোকজন, রোগীদের আত্মীয়স্বজন দেখতে আসছে। কারোও হাতে ডাব ফল, কেউ ফ্লাস্কে করে আনছে দুধ, অভাবে হরলিকস্-এর বোতলেও কেউ এনেছে দুধবার্লি। কোন বস্তিবাসী বৌ-ঝি কমদামী ফ্রকপরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুধু হাতেই দেখতে আসছে স্বামীকে, সারা মুখেচোখে হতাশা আর দারিদ্রের নগ্ন ছাপ। কেউ পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল কটেজের দিকে।

দু-একটা বাচ্চা ছুটোছুটি করছে সামনের লনে।

হাসিকান্নার মেলা। বহুবিচিত্র জীবনযাত্রা এদের।

এই নীরব গাছগুলোর পত্রমর্মরে ফুটে ওঠে দীর্ঘশ্বাস—হতাশার সুর।

মলিন ক্লান্ত মুখে নীতাও ঢুকলো গেটে। ঘামে ভিজে গেছে তার ব্লাউজটা, সস্তা শাড়িখানা পথের ধূলোয় ময়লা হয়ে উঠেছে। মুখচোখ বসে গেছে। রাস্তার কল থেকে খানিকটা জল আঁজলা করে ঘাড়ে মাথায় মুখে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করেছে। সারি সারি খাট পাতা, লাল কম্বলে ঢাকা বেড। সব মুখই ওখানে এক রকম। কোন নাম নেই-- সব যেন এক-একটা নম্বর। নামের চেয়ে ওদের খাতায় নম্বরের হিসাবই বেশি চালু।

একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে থমকে দাঁড়াল নীতা। ডাক্তারবাবু এগিয়ে আসেন ওকে দেখে, সত্যই যে এত বড় সর্বনাশ ঘটবে ভাবে নি সে। কোনরকমে সরে এল নীতা।

মণ্টু অজ্ঞান হয়ে রয়েছে মর্ফিয়ার ঘোরে। ডান পাটা হাঁটুর উপর অবধি নেই। নার্সও পাশেই ছিল। ওকে দেখে আশ্বাস দেবার সুরেই বলে ওঠে— আপনার পেশেণ্ট ভালোই আছে।

ডাক্তারবাবু বলে ওঠে—চেষ্টা করে দেখলাম অনেক, কিন্তু পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে উঠেছিল। তাই বাদ দিতেই হল। আর ও তো সাধারণ ব্যাপার। দু-চার দিন পরই ঠিক হয়ে যাবে।

কথা বলে না নীতা, চোখ ঠেলে হু-হু কান্না নামে। নার্সও যেন দয়া পরবশ হয়েই ওকে ওদিকের বারান্দায় ধরে নিয়ে গিয়ে একটা টুলে বসায়।

—হলে গিয়ে কাঁদবেন না, পেশেণ্টরা নার্ভাস হয়ে যাবে। এ সময় ধৈর্য হারাবেন না।

নীতা কথা কইল না, ওর দিকে অশ্রুভেজা চোখ তুলে চাইল। ও জানবে কি করে নীতার ধৈর্যের সীমা! এমনি করে পদে পদে অপমানিত জীবনযুদ্ধে বঞ্চিত ক্ষতবিক্ষত হয়েও বুক বেঁধে ছিল, কিন্তু আজ সব আগল টুটে গেছে। অসহায় সে।

ভেঙে পড়ে নীরব কান্নায়। কল্পনা করতে পারে না নীতা, মণ্টু জ্ঞান ফিরে যখন দেখবে তার ডান পা নেই, সে কি সহ্য করতে পারবে?

ছেলেবেলা থেকে ফুটবল খেলা মণ্টুর রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেই তার প্রাণ! জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই জীবন থেকে সে নির্বাসিত—বাতিলের দলে। একটা কাঠের ক্রাচের উপর ভর দিয়ে জীবন কাটাতে হবে—পরের গলগ্রহ হয়ে সারাজীবন।

চোখের উপর ভেসে ওঠে মণ্টুর সুশ্রী সুন্দর সুঠাম দেহ, ব্লেজারের কোট পরে কত খেলাজয়ের ছবি, আলমারি-ভর্তি কাপ মেডেল। সেই মণ্টু আজ পঙ্গু। জীবনযুদ্ধে আহত বিকৃত একটি সত্তা।

হু-হু কান্না কমে না নীতার। নিজের জন্য দুঃখবোধ তার নেই কিন্তু অন্যের জন্য তার অফুরান স্নেহ—দুঃখবোধ। নিতান্ত অসহায় সে। আশেপাশে সান্ত্বনা দেবার কেউই নেই তার। বাইরে গিয়ে অবধি শঙ্করও একটি চিঠি পর্যন্ত দেয় নি! সবই তাকে বইতে হবে, এই সব বোঝা আর বইতে পারে না সে!

কান্নাভেজা মুখচোখ নিয়ে বের হয়ে আসছে নীতা, হঠাৎ সামনে সনৎকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

—কেমন আছে মণ্টু?

কথা কইল না নীতা, আঙুল দিয়ে হলের মধ্যে লাল কম্বলঢাকা মূর্তিটার দিকে দেখাল।

চমকে ওঠে সনৎ। এই সর্বনাশা দৃশ্য দেখবে কল্পনা করে নি সে।

কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে নীতা—ওর না বাঁচাই ছিল ভালো সনৎ, বড় কষ্টের জীবন ওর। ও সহ্য করতে পারবে না।

সনৎ চুপ করে থাকে, সেও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলেছে নীতা, হতাশায় ভেঙে পড়া ক্লান্ত একটি মূর্তি; সারাদিন পরিশ্রম আর উত্তেজনার পর এই শোচনীয় পরিণতিতে ভেঙে মুষড়ে পড়েছে সে।

সনৎ ওকে একা ছেড়ে দিয়ে ভরসা পায় না। শুকনো অস্নাত চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

—কিছু মুখে দিয়ে বাড়ি ফিরবে। অন্ততঃ কিছু খাবার আর চা।

—না; বাবা মা ভাবছে, এখনি বাড়ি ফিরতে হবে।

নীতা কেমন বদলে গেছে। চোখের জল তখনও শুকোয়নি। মণ্টুর সেই অসহায় মূর্তিটা চোখে পড়তেই কান্না আসে চোখ ঠেলে। সনৎ বলে ওঠে—চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সনতের কথায় আজ প্রতিবাদ করে না নীতা। অত্যন্ত অসহায় বোধ করে নিজেকে। দু'জনে শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায় ভিড় ঠেলে। আপিসের বাবুরা দৌড়চ্ছে তখন বাঁধাকপি হাতে ঝুলিয়ে, কেউ র‍্যাশান থলিতে তরকারি কিনে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছে বকের মত পা ফেলে—ঠেলেঠুকে ধাক্কা দিয়ে। জীবনের আপাতত পরমগতি তাদের ছটা তেত্রিশের লোক্যাল।

গীতা বাড়িতেই এসেছে দুপুরের পর। মাকে নীতার সব কীর্তি কাহিনীই জানাবে। দরকার হয় মায়ের সামনেই নীতার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে আজ। তার সুখের সংসারে অভিশাপের মত ওর কালো ছায়া আর পড়তে দেবেনা! অনেক সহ্য করেছে নীতাকে, আর কখনই নয়।

মা গীতাকে অসময়ে আসতে দেখে অবাক হয়। গীতার মুখে চোখে করুণ একটা ভাব। বাড়িতে পা দিয়েই মায়ের মনের অবস্থার খোঁজ নেবারও দরকার বোধ করে না। নিজের

কাহিনীটাই বলে যায় নানা ডালপালা দিয়ে রঙ ফলিয়ে। নীতা যে তার কতখানি সর্বনাশ করবার জন্য ঘুরছে এ কথাটা জানিয়ে দেয় মাকে।

কাদম্বিনী নিজের মনের দুঃখে অস্থির। সারাদিন মণ্টুর কোন খোঁজ পায়নি। গীতা সেই সকালে বের হয় গেছে—এখনও দেখা নেই। ভাবছে মা। কিন্তু এমনি সময়ে গীতার দুঃখে নীতার সম্বন্ধে ওই সব বিশ্রী কথাগুলো শুনে সারা মন জ্বলে ওঠে তার।

ফেটে পড়ে রাগে; গীতার কথাগুলো শুনে নিজের কপালই চাপড়াতে থাকে।

—দেখ কেমন মেয়ে ও! গীতা বলে ওঠে।

কাদম্বিনী কান্নাভেজা স্বরে বলে চলেছে—সবই আমার বরাত। নইলে ওই মেয়ের রোজগারে আমাকে বাঁচতে হয়। আর তার শোধও খুব নিচ্ছে যাহোক। তোর সংসারেও শান্তি নষ্ট করেছে সে। মেয়ের বিয়ে দিলাম, তার পিছনেও লাগলো।

গীতা বলে ওঠে—ওই তো মা, ওকে পরামর্শ দিয়েছে চাকরি ছাড়বার। বলে মাস্টারি করো!

চমকে ওঠে কাদম্বিনী—মাস্টারি।

মাস্টারি করার সুখ টের পেয়েছে হাড়ে হাড়ে। দীর্ঘ এতগুলো বছরের একটি দিনও স্বচ্ছলতার মধ্যে কাটে নি—শান্তির মুখ দেখে নি কোনদিন। গীতার কথা শুনে তাই আঁতকে ওঠে।

—না-না, ও কথা বলিস না গীতা; সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরবি আমার মত।

—নীতা তো তাই চায় মা।

মা মেয়ের দুজনেই চমকে উঠেছে। নীতা যেন তাদের জীবনে একটি দুষ্টগ্রহ।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। গাছগাছালির বুকঢাকা জোনাকজ্বলা আঁধার নামে। পাখি ডাকাও থেমে গেছে। মাধববাবু উতলা হয়ে ঘর বার করেন। ওদের দেখে প্রশ্ন করেন।

—নীতা ফিরলো?

কাদম্বিনীর মনে গীতার কথাগুলো তখনও গজগজ করছে। আজ দুপুরের ঘটনাটিও। তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে—ঢলানি গেছেন কোথায় কে জানে। ভাজে উচ্ছে বলে পটোল!

মাধববাবু ওর কথায় কান দেন না। আপনার চিন্তাতেই মশগুল।

অসহায়ের মত তিনি বলে ওঠেন গীতাকে—আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবি? একবার দেখে আসতাম মণ্টুকে, হ্যারে?

গীতা জবাব দেয়—কিন্তু আমাকে যে আজই ফিরতে হবে।

মাধববাবু নিরাশ হন—ও! কিন্তু কেমন রইলো সে খবরটাও তো পেলাম না।

একাই ছটফট করেন তিনি অসহায়ের মত। আঁধার নামছে চারিদিকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে সব কেমন যেন হারিয়ে যায়।

হঠাৎ সনতের সঙ্গে নীতাকে ঢুকতে দেখে মাধববাবু এগিয়ে আসেন। গীতার চোখে সন্দেহের গাঢ় ছায়া। তার সন্দেহ অমূলক নয়। সনতের দিকে সে চেয়ে থাকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে।

কাদম্বিনী বলে ওঠে নীতাকে—কোথায় ছিলি সারা দিন?

নীতা জবাব দিতে পারে না। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবার পায়ের কাছেই। চমকে ওঠেন মাধবমাস্টার। তবে কি সত্যই কোন অঘটন ঘটে গেছে!

কাদম্বিনী ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করছে—কি হয়েছে বল। শুনি তুই কি বলবি—কোন সর্বনাশের খবর।

মাধববাবুর চোখ দুটো জ্বলছে অসহ্য বেদনাভরা আর্তিতে।

—মণ্টু! আমার মণ্টু কেমন আছে রে? তার কোন খবর?

নীতার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাঁপছে সে, কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে—বেঁচে আছে মাত্র, তার ডান-পা খানা বাদ দিতে হয়েছে।

—অ্যাঁ। চমকে ওঠেন মাধববাবু।

বড়ো একটা প্রকাণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়তে গিয়ে সামলে নেন নিজেকে। থর থর কাঁপছে তাঁর সমস্ত শরীর। জীর্ণ শিরাগুলো ফেটে পড়বে রক্তের অসহ্য চাপে। খরস্রোত নদীর বুকে নোঙর-জড়ানো রশিটা যেন জোয়ারের গতিবেগের সঙ্গে যুদ্ধ করে আটকে রেখেছে নৌকাটাকে জড়ের মত। নীরবে সেই অতর্কিত আঘাত সহ্য করার জন্য লড়াই করছে সে।

কাদম্বিনী ডুকরে কেঁদে ওঠে। অসহায় আর্তকান্না

গীতা এই দৃশ্য দেখতে পারে না, চায় না। নগ্ন দুঃখের দৃশ্যটাকে এড়িয়ে যেতে চায় সে। সকলের অলক্ষে চোরের মত বাড়ি থেকে পা টিপে পালায়।

সুখের পায়রা সুখের দিনে বাসা বাঁধে, সুর তোলে। দুঃখের সময় তার চিহ্নমাত্র থাকবে না, নীরব হয়ে যাবে তার সুর। জগতের এই নিয়ম।

গীতা তাদেরই দলে। তাই সরে গেল এ বাড়ি থেকে আজও ওদের অলক্ষ্যে।

সনৎ তখন দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে দেখছে কতকগুলো অসহায় মানুষের নিষ্ফল ব্যর্থতার জ্বালা।

—নীতা! সনৎ ওকে ডাকে সান্ত্বনার কণ্ঠে।

—সারাদিন স্নান খাওয়া নেই, পথে পথে ঘুরছো। যাও স্নান সারগে। এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না এ সময়, ওঠো!

কাদম্বিনী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক ছেড়ে কাঁদছে—এ কি হল রে! কোন পাপে আমার সব ছারখার হয়ে গেল গো!

স্তব্ধতা নেমে এসেছে আঁধারঢাকা আলোনেভা বাড়িতে, শোকের একটা কালো মেঘ নেমেছে নীরবতার আবরণে। তারাগুলো হারিয়ে গেছে আঁধারে।

সনৎ বের হয়ে আসছে। সিঁড়ির কাছে নীতার ডাকে থমকে দাঁড়ায়। তার দিকে চেয়ে আছে। সহজ কণ্ঠেই বলে ওঠে নীতা—কিছু টাকা দিতে পারো? মাসকাবারেই দিয়ে দোব। এখন বড় দরকার। আমার কাছে যা ছিল সবই খরচ হয়ে গেছে।

সাধারণ অধিকারেই চাইছে। সনৎ তারার আলোয় ওর আবছা মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—কাল যখন হাসপাতালে আসবো তখন নিয়ো! শ দেড়েকে হবে?

চুপ করে ঘাড় নাড়লো নীতা।

সনৎ হালকা পায়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলে। গীতাকে খুঁজে পায় না এ বাড়িতে। স্টেশনে গিয়ে দেখে, গীতা আগেই পৌঁছে অপেক্ষা করছে ট্রেনের জন্য। সনৎ এগিয়ে আসে—কই, দাঁড়ালে না যে?

আমার সঙ্গে আসো নি তো। ভাবলাম থেকেই যাবে রাত্রিটা। হাজার হোক শ্বশুরবাড়ি!

চমকে ওঠে সনৎ! গীতা হাসছে বিদ্রূপের হাসি।

সনৎ কথা কইল না। কেমন যেন অসহ্য হয়ে উঠে ওর অমানুষিক এই স্বার্থপরতা দেখে।

গীতার মনের যত পরিচয় পাচ্ছে ততোই শিউরে উঠছে সে ঘৃণায়। এই বিপদেও মানুষকে আপন জনকে যারা ভালবাসতে পারে না, তারা কোন্ শ্রেণীর জীব তা জানে না সনৎ। তার চরম দুর্ভাগ্য তেমনি একজনের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে।

ট্রেন আসছে। সার্চলাইটের আলোয় দেখা যায় একঝাঁক ফড়িং পোকামাকড় উড়ছে আলোর চারপাশে। আলোকরশ্মিকে বাধা দেবার ওদের নিষ্ফল প্রয়াস।

নীতার দেহমনের সমস্ত সুপ্ত শক্তি সাহস, কোন গোপন তল থেকে অফুরান প্রবাহ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মায়ের মত অসহায় কান্নায় সে ভেঙে পড়ে না। বাবার মত নীরবে সহ্য করবার চেষ্টাও করে না। দুঃখ-বিপদের মাঝে দাঁড়িয়ে সেই দুঃখ জয়ের সাধনাই করে।

তবু কোথায় যেন ফুরিয়ে আসছে সেই শক্তি। কিছুদিন থেকে অনুভব করছে একটা অপরিসীম কান্তি বিকালের দিকে তার সারা শরীর জড়িয়ে আসে। গা মাথা ভার ভার ঠেকে। কেমন যেন চুপ করে একটু বিশ্রাম চায় তার দেহমন।

কিন্তু সে উপায় তার নেই। কয়েকদিন পর থেকেই আবার আপিসে গেছে যথারীতি। সেখান থেকে আসে হাসপাতালে। মেয়েদের অনেকেই আপিসের কড়াকড়িটাকে অনেক শিথিল করে এনেছে। দশটার জায়গায় এগারোটায় এসে হাজির হয়। ডেসপ্যাচ সেকশনের প্রতিভা আসে আরো দেরিতে। মুখে পাউডারের সযত্ন প্রসাধন, আর পিছে থাকে হাসির রঙ লাগানো চাহনি। আগে কথা কয় অজানা ভাষায় দুটো চোখ, তার পর অন্য কথা কয় মুখে।

রিটায়ারিং রুমে এই নিয়ে মেয়েদের আলোচনা হয় খুবই।

—তুই যেন ঘড়ির কাঁটার মত আসিস নীতা।

নীতা হাসে—তোর মত আমার দেরি করিয়ে দেবার কেউ যে নেই রে!

প্রতিভার নিত্য নতুন অজুহাত; বিয়ে করবেও নাকি শীগগির একটি অধ্যাপককে। সব প্রায় ঠিকঠাক।

নীতার কথায় অনেকেই মুখ টিপে হাসে।

প্রতিভা বলে—না, তা তো নেই জানলাম। তবে এত আপিস-আপিস কেন রে বাবা। একটু হেসে বলে ওঠে প্রতিভা। কাজ এড়ানোর তথ্যটা এদের জানিয়ে দিতে চায়।

—ছেলেদের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললি, অর্ধেক কাজ তাহলেই হয়ে যাবে।

প্রতিভা কেন, আরও অনেকেই হয়তো তাই করে! নীতা পারে না। নিজের মনের কাছেই এই অভিনয় অসহ্য ঠেকে। কাজে ফাঁকি দেবার ওই পথটা নিতে বিবেকে বাধে তার। তাই ভূতের খাটুনি খেটে মরে।

ছোটবাবু সেদিন তাকে আপিসে আসতে দেখে নিজের থেকেই বলে ওঠেন—বললাম তোমার ভাইয়ের এই অ্যাক্সিডেন্ট, হাসপাতাল-বাড়ি করতে হচ্ছে, আরও দিনকতক ছুটি নিলেই পারো।

নীতা জবাব দেয়—জরুরি কাজ পড়ে আছে অনেক।

—সরকারের কাজ পড়ে থাকবেনা, ঠিকই হবে। এত খাটুনির পর রেস্ট না নিলে তোমার শরীর ভেঙে পড়বে যে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক নীতাকে একটু স্নেহ করেন। অবশ্য আড়ালে অনেকেই এই নিয়ে গুঞ্জরন তোলে!

নীতা কাজ করতে বসেছে। একমনে নোটগুলো পড়ে চলেছে। চিঠিখানার জবাব দিতে হবে, টাইপ হয়ে সাহেবের সই হয়ে যাবে। লিখতে শুরু করেছে।

হঠাৎ কেমন যেন চোখের সামনে ঘরখানা টেবিল চেয়ার লোকজন সব মুছে যায়। একটা কালো অস্পষ্ট যবনিকার উপর ফুটে ওঠে কতগুলো সাদা-কালো ঘূর্ণায়মান ফুটকি, পায়ের নীচেকার মাটি কাঁপছে—কানে জাগে একটা দূরাগত শনশন শব্দ! ..... কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে সেটা, যেন প্রবল ঘূর্ণিপাকে তাকে জড়িয়ে নিয়ে কোন্ শূন্যে উধাও করে দেয়। সারা দেহমনে একটা হিমজড়ানো স্তব্ধতা জাগে। একটা শব্দ! .... আর কিছু মনে পড়ে না।

বসন্তবাবু চীৎকার করে ওঠেন। পাশে টাইপিস্ট মিনা বোস নীতাকে চেয়ার থেকে পড়ে যেতে দেখে ধরে ফেলে। অনেকেই উঠে আসেন।

সারা অফিসে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। অন্য সেকশন থেকে মেয়েরাও এসে পড়ে। ছেলেদের দল আড়ালে আবডালে মন্তব্য করে ঃ

—দেখ, আবার কি!

একটা রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতের সুর তাদের কথায় ফুটে ওঠে।

নীতার জ্ঞান ফিরতে অপ্রস্তুত হয়ে সে-ই। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। তার জন্যই। খুব লজ্জা লাগে।

—উঠবেন না! মিনা বাধা দেয়।

নীতা বলে ওঠে—ও কিছু নয়। মাঝে মাঝে অমন হয়।

ছোটবাবু বলেন—ডাক্তারের কাছে যাও না কেন!

নীতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এত জনের এত চিন্তার সমবেদনার কারণ হয়ে পড়েছে সে।

মিনাই বাধা দেয়—একটু বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি চলে যান।

নীতা ম্লান মুখে জবাব দেয়—ও কিছু নয়! শুধু শুধু তোমাকে বিব্রত করলাম। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা বল দেখি!

উড়িয়ে দিতে চায় ঘটনাটা। আবার কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসে জোর করে ওদের কথা না শুনেই। যেন কিছুই ঘটে নি। স্বাভাবিক করে তোলে পরিবেশটাকে।

চুপ করে শুয়ে আছে মন্টু। বিকালের পড়ন্ত আলোয় দেওদার গাছের পাতাগুলো রেঙে উঠেছে। আবিষ্কার করেছে একটা পা তার বাদ দিতে হয়েছে। খেলা! এত সম্মান হাততালি আর প্রশংসার জগৎ থেকে চির-নির্বাসিত সে।

চমকে উঠেছিল প্রথম এত বড় সর্বনাশে। কিন্তু মন ক্রমশঃ কেমন যেন জড়বৎ হয়ে আসে। এই ভালো—এত কর্মব্যস্ত চঞ্চল জীবন থেকে সে যেন নিষ্কৃতি পেয়েছে। এই চরম আঘাতটাতে নীরবে মেনে নেবার চেষ্টা করে মণ্টু।

বিকালের গিনিগলা রোদমাখা আকাশ আর গাছগুলোর দিকে চেয়ে আছে। দিদিকে আসতে দেখে চাইল। আজ প্রথম সব হারিয়ে মণ্টু দিদিকে দেখে নতুন চোখে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা। চোখের তারায় তবু হাসির আভা।

—কেমন আছিস রে?

মণ্টু হঠাৎ যেন দুর্বল হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে সহজ ভাবেই দিদির দিকে চাইল। দিদি কি এনেছে প্যাকেটে করে সেগুলো হাত বাড়িয়ে নিয়ে তার প্রশ্নে জবাব দেয়—ভালই আছি। আয়।

আজ বসবার মত সামর্থ্য যেন নেই নীতার। অফিসে মাথা ঘুরে যাবার পর থেকেই কেমন দুর্বল বোধ করছে। এতদিন সেই ক্লান্তি আর দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় নি, ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল নীতা। সব কাজকর্ম চলাফেরা করেছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু আর পারছে না। নিঃশেষিত জীবনীশক্তিকে জয় করেছে সেই দুর্বলতা, বলে ওঠে নীতা—বেশিক্ষণ বসবো না, একটু কাজ আছে। সনৎদা আসতে পারে। ওকে বলিস কাল যেন হাসপাতালে আসে বিকালে।

ঘাড় নাড়ে মণ্টু। দিদি পাশে বসে কি কথাবার্তা বলছে। মণ্টুর মনটা উধাও হয়েছে জানলার বাইরের একফালি মুক্ত নীল আকাশে। দু-একটা চিল পাক দেয় কালো বিন্দুর মত। দেওদার পাতা কাঁপছে। কেমন নিঃস্পৃহ উদাসীন চিন্তা।

দিদির কথায় ঘাড় নাড়ে—বলবো।

—কাল মাকে আনবো।

—বেশ! আবার কাঁদাকাটা করবে না তো?

হাসে নীতা—না, না।

মণ্টুর অফিসের দু-চার জন বন্ধুবান্ধবও আসছে। নীতা উঠে পড়লো একটু তাড়াতাড়ি।

কেমন যেন রুটিন বদলে যাচ্ছে। কোনদিন বিশেষ কোন জরুরি কারণ ছাড়া নীতা আপিসও কামাই করে না। টুইশানিও। আজ কেমন শরীর বইছে না। টুইশানিতেও যেতে ইচ্ছে করে না।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আজ বের হল না, আলো নিভিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে বিছানায়। কাপড়-চোপড় ছাড়বার মত উৎসাহটুকুও যেন নীতার নেই। একটা নীরব আতঙ্ক জমাট বেঁধে আছে সারা মনে।

হয়তো এই দুর্বলতা মাথাঘোরা তেমন কিছুই নয়, কদিন খাটাখাটুনি চলেছে, তাই বোধহয় ঘটেছে এটা। আবার আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু। হঠাৎ আবার একরাশ চিন্তা কালো মেঘের মত মনের নির্মল আনন্দাকুল আশাটুকুকে ঢেকে দেয়। কেমন ভয় করে নীতার। মনের মধ্যে একটা জমাট আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

যদি ডাক্তার পরীক্ষা করে অন্য কোন কঠিন অসুখের কথা বলে বসে? ব্লাডপ্রেসার—না হয় টি. বি! বিকালে গা জ্বর জ্বর, বেদনা, মাঝে মাঝে কাশি!

একটা দমচাপা কাশির আবেগ প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করে নীতা। মাধববাবুর কান খুব খাড়া। বাবা পাছে শুনতে পায় সেই ভয়েই নীতা সাবধান হয়ে ওঠে।

কোনমতে কাশির বেগ সামলে নেয়। একটা জমাট আতঙ্ক মনে বাসা বাঁধা। নিজের জন্য নয়, বাবা—মা—মণ্টু! অসহায় পঙ্গু মণ্টু। এদের জন্যই তাকে বাঁচাতে হবে। কাজ করতে হবে!

নাঃ, ও কিছু নয়! শরীরটা অনেক সুস্থ—সনতের কথা মনে পড়ে। তারাজ্বলা আবছা আকাশের দিকে চেয়ে। কি যেন স্বপ্ন দেখতো তারা।

দূরে, বহু দূরে বেড়াতে যাবার স্বপ্ন। নতুন করে ঘর বাঁধা—ভালবাসার আয়োজন।

অনুভূতির স্বাদস্পর্শ নিয়ে তারা বাঁচবে। এঁকেবেঁকে উঠেছে পাহাড়ী পথ। সবুজ বন—পাহাড় ঢেকে রয়েছে বাঁশবন আর বুনো কলাগাছে। বাতাসে কমলালেবু ফুলের উদগ্র সৌরভ। উপরে উঠে চলেছে গাড়িটা—নীচে, বহু নীচে ফেলে আসা পথ দেখা যায় অন্য পাহাড়ে। সরু এক ফালি পথটা এঁকেবেঁকে বন আর পাহাড়ের মধ্যে কোথায় গেছে নীচের দিকে।

চলেছে সে আর সনৎ! একটা হাওয়া-শনশন পাইন বনের সুর জাগে বাতাসে। হাসছে নিজের মনেই নীতা!

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ শোনা যায়, গাড়িখানা এসে থেমেছে তাদের বাড়ির দরজায়। মাধবমাস্টার চমকে ওঠেন। নীতাও বের হয়ে আসছে! তবে কি মণ্টুর কোন খারাপ খবর দিতে এসেছে হাসপাতাল থেকে পুলিশ!

জীবনে ওদের শুধু ভয়। ক্ষয় আর ক্ষতির জমাট কালো আতঙ্ক সব আলো ঢেকে রেখেছে। তাই সকলেই যেন চমকে ওঠে।

মাধববাবুও উঠে আসছেন। কাদম্বিনীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কাঁদতেই বাকি। মা বলে ওঠে—কি হল রে নীতা? আজ তুই দেখে এসেছিলি না মণ্টুকে? এসে চুপ করে শুলি মুখ ভার করে। সত্যি কথা বলতে নেই! ওদিকে কি হাসপাতাল থেকে লোক এসেছে নাকি?

—চুপ কর মা, ব্যাপারটা কি দেখে আসি।

নীতা শশব্যস্ত বের হয়ে গেল।

বাইরে এসেই অবাক হয়ে যায়। শঙ্কর নামছে গাড়ি থেকে। ট্যাক্সি নয় মস্ত ঝকঝকে একটা গাড়ি! কোন গুণমুগ্ধ ভদ্রলোক নিজের গাড়িতেই তাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। দুটো নতুন দামী তানপুরো, হোল্ডঅল, সুটকেশ, একটুকরী ফল নিয়ে নেমেছে শঙ্কর, নীতার দিয়ে চেয়ে আছে—নীতাও দেখছে ওকে অবাক হয়ে।

ক মাসেই ওর চেহারায় এসেছে একটা সুন্দর ব্যক্তিত্বের ছাপ। শ্রীহীন চেহারায় এসেছে সৌন্দর্য। মুখে চোখে ফুটে উঠেছে মিষ্টি হাসির আভা।

—হাঁ করে দেখছিস কি রে!

শঙ্করই নীতার দিকে এগিয়ে আসে।

কাদম্বিনী ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছিল ভাতের ফেনগালার কাজ বন্ধ রেখে। কি সর্বনাশের খবর শুনবে! কিন্তু বাইরে এসে শঙ্করকে দেখে সেও অবাক হয়ে গেছে। গীতার বিয়ের পর থেকে শঙ্কর এ বাড়ির বাইরেই রয়েছে। কয়েক মাস বোম্বে, মাদ্রাজ—ওই দিকের বিভিন্ন শহর ঘুরে অনুষ্ঠান করে এসেছে।

ও যেন এখন অন্য জগতের লোক, অনেক দূরের মানুষ। কয়েকটা মাসের মধ্যেই অনেক কিছু বদলে গেছে। এ বাড়ির আবহাওয়াটুকু।

নীতার দিকে চেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পারছে শঙ্কর। বাড়িতে কেমন একটা শ্রীহীন ভাব ফুটে উঠেছে, সবুজ পাতাগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, ফুলের গাছেও কেমন একটা নিস্তেজ ভাব। নীতার রঙ আরও ময়লা হয়ে গেছে। চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে—চোখের পাতা ম্লান করুণ!

শঙ্কর পরম স্নেহ-মমতা-ভরা দৃষ্টিতে নীতার দিকে চেয়ে থাকে।

—হ্যাঁরে শরীর খারাপ!

—কই নাতো!

কাদম্বিনী জানে শঙ্করের দ্বারা কিছু উপকার হওয়া সম্ভব নয়, তার কাছে কিছু প্রত্যাশাও করে না সে। তবুও এই সময় কিসের আবেদন জানাতে শুরু করে কাদম্বিনী।

নীতা বাধা দিয়ে ওঠে—দূর পথ এসেছে মা, একটু জিরোতে দাও। চল দাদা, পরে সব কথাই শুনবে।

নীতা যেন ওকে জোর করেই সরিয়ে নিয়ে গেল এখান থেকে। কাদম্বিনী থ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমনি করেই চিরকাল যেন নীতা শঙ্করকে মায়েব আঘাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। মাধববাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল কাদম্বিনী। বলে ওঠে তিক্ত সুরে—দেখলে তোমার মেয়ের কাণ্ড! শুনলে কথাগুলো?

মাধববাবু কথা বললেন না। তিনিও ঘরের ভিতর চলে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটার পাতা ওলটাতে থাকেন।

কাদম্বিনীর ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়—এ বাড়ির সবই আলাদা। ভাঙবে তবু মচকাবে না।

শুনেছে কাগজে সেদিন নাম ও ছবি ছাপা হয়েছে শঙ্করের। অনেক নাম যশ কুড়িয়েছে সে বিদেশে। তার সঙ্গে কিছু টাকাও কি না আছে? কাদম্বিনী সেই কথাই বলতে চেয়েছিল—এ সময় টাকা তার দরকার। কিন্তু নীতা তাকে সে সুযোগই দেয় নি।

রাত্রি হয়ে আসছে। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে উপনিবেশের আবহাওয়া। জোনাক জ্বালা অন্ধকার ঝিঁঝিঁপোকার সুরে মুখর। বাতাসে ফুটেছে হাসনুহানার উদগ্র সৌরভ। রাতজাগা পাখি একবার অতর্কিত ডেকেই থেমে গেল। দূরে ইটখোলার মাঠ থেকে দেহাতী কুলির বেতালা সুরের চীৎকার ভেসে আসে।

জোনাকির দল আকাশে ওঠানামা করছে—এলোমেলো, মুঠোমুঠো তারাফুল কে যেন আসমানে ছিটিয়ে দিয়েছে।

এ যেন নীতার জীবন-সংগ্রামের করুণ কাহিনী। এ বাড়ির এই মানুষগুলোর কথা নয়, নীতারই জীবনের কথা। সয়ে সয়ে ও যেন আজ পাথর হয়ে গেছে।

শঙ্কর চুপ করে নীতার কান্নাভেজা কথাগুলো শুনে চলেছে। আবছা আলোয় নাকচোখের ধারালো তির্যক রেখাগুলো পরিস্ফুট। নীতা বলে চলেছে।

মণ্টুর এই অ্যাকসিডেণ্ট! বাবার রোজগার নেই। এ সময় ওদের তুমি দেখবে না?

শঙ্কর পায়চারি করছে। কথাগুলো তার মনেও ঝড় তুলেছে। কিন্তু ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে সে।

বলে ওঠে—তা, কি করতে পারি বল তুই। তুই তো দেখছিস, কিন্তু কি করতে পেরেছিস এতবড় দুর্যোগের মাঝে?

ওর নিষ্ফল প্রয়াস দেখে নিজেই চমকে ওঠে শঙ্কর। বলে চলেছে সে—একা তোর চেষ্টায় সংসারের সব বিপদ বাধা টপকে যাবি?

দৃঢ়কণ্ঠে নীতা বলে—চেষ্টা করে তো দেখতে হবে!

শঙ্করও অনেক ভেবেছে এসব কিন্তু পথ পায় নি। জবাব দেয় নীতার কথায়।

—পাগলামি! এ তোর নিছক পাগলামি। নিজেকে মেরে ফেলে এই দুর্বার ধ্বংসের

জোয়ার ঠেলে এগিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা করবি? তুই এ সংসারের রূপ বদলাতে পারবি না। ওরে, ঘুণ ধরে গেছে এই কাঠামোর মজ্জায়-মজ্জায়। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের সংসার টিকবে না আর। ওরা সবাই মরবে—আজ না হোক, দুদিন পরে। তুইও যদি এই আত্মঘাতী চেষ্টা করিস, তুইও বাদ যাবি না।

শঙ্কর নিষ্ঠুরেরর মত কথাগুলো বলে চলেছে। চমকে ওঠে নীতা ওর মন্তব্যে।

—তাহলে ওদের ফেলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য স্বার্থপরের মত দূরে সরে যাবো!

হাসে শঙ্কর—তাও পারবি না! সুতরাং তোর দুঃখ কোনকালেই ঘুচবে না। গীতাকে দেখেও শিখলি না?

—দাদা! নীতা একটু অবাক হয় ওর কথায়!

নিজের পথ যারা চিনতে পারে তাদের মনে বোধহয় জমাট হৃদয়হীনতা স্বার্থপরতা একটা কোথায় থাকে। বার বার এইটাই যেন দেখছে নীতা।

চুপ করে থাকে।

—রাগ করলি? শঙ্কর প্রশ্ন করে!

শঙ্করের কথায় চটে উঠেছে নীতা মনে মনে। ওরা সবাই স্বার্থপর। আজ শঙ্কর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, নাম-যশও হয়েছে, উপরে উঠে আজ অতীতের কথাও ভুলতে বসেছে। হয়তো ভুলেছে তার সাধনার সিদ্ধির মূলে নীতারই ত্যাগ টুকুকেও। গীতার কথা ভুলে তাকে হয়তো পরিহাস করবারও চেষ্টা করে। আগাগোড়া ভুল বুঝেছে নীতাকে সে। প্রতিবাদ করে ওঠে নীতা।

—নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করি নি দাদা। যদি সেদিন তোমার ওই দর্শন, ওই নীতিতে কাজ করতাম আজ শঙ্কর মুখুজ্জে কোথায় থাকতো সেটা ভেবে দেখেছো?

শঙ্কর ওর সোজা কথায় একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। সামলে নিয়েই বলে ওঠে—আমি তোকে এক্সপ্লয়েট করেছি। ঠকিয়েছি।

নীতা আজ কঠিন হয়ে উঠেছে শঙ্করের এই ব্যবহারে। প্রীতি-শ্রদ্ধার বন্ধন—এর কি কোন দামই নেই? ওর দিকে চেয়ে থাকে নীতা—মনের কোণে জমে ওঠে ঘৃণার একটা ভাব। তাকে ঠকিয়েছে সনৎ, ঠকিয়েছে ওই সাদাসিধে আত্মভোলা লোকটিও। সনতের উপর তার লোভ নেই। তার দুর্বল চিত্ত সে চেনে—হাওয়ার ভর করে চলে তারা, যখন যেদিকে থাকে—তারাও যায় সেইদিকে।

কিন্তু শিল্পী—মানবদরদী যারা, তাদের কাছে এই আত্মত্যাগের এমনি দাম পাবে—কল্পনাও করে নি নীতা।

শঙ্কর বলে ওঠে—টাকা কিছু পেয়েছি। তা তোকেই দিয়ে দিচ্ছি নীতা। আরও যদি দরকার হয় বলবি।

নীতা তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠে—দাম দিচ্ছ? না দয়া করছো?

শঙ্কর কথা বললো না, জিনিসপত্রগুলো গুছাতে থাকে। নীতা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। শঙ্কর এ বাড়িতে থাকতে আর রাজী নয়।

নীতা বলে ওঠে—তুমি কি অন্য কোথাও থাকবে?

—এ বাড়িতে কোনদিনই থাকতে চাই নি নীতা, আজও বাইরে থাকবো।

আবছা আলোয় কখানা নোট এগিয়ে দেয় নীতার দিকে। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীতা—টাকাগুলো নেবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহও দেখালো না, হাতও বাড়ালো না। নীতার চোখে

মুখে একটা নীরব কাঠিন্য ফুটে ওঠে। শঙ্কর তার মনে একটা কঠিন আঘাত দিয়েছে। সব ধারণা বদলাচ্ছে নীতার।

কঠিন স্বরে বলে ওঠে—তোমার ও ভিক্ষা না নিয়েই চালাবার চেষ্টা করবো, দাদা। এতদিন করেছি—এখনও করবো! ও টাকা তোমারই থাক! ওতে কর্তব্যপ্রীতির কোন ছোঁয়াই নেই—দয়া করে ভিক্ষা দিচ্ছ, আর নাইবা নিলাম!

কাদম্বিনী তক্কে তক্কেই ছিল। পায়ে পায়ে কখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; তারা দুজনের কেউই লক্ষ্য করে নি। নীতাকে ওব টাকা ফিরিয়ে দিতে দেখে অবাক হয়ে যায় কাদম্বিনী। এতগুলো টাকা! কাদম্বিনীর সারা মনে একটা লালসার ছায়া ফুটে ওঠে। দারিদ্র্য আর অভাব পদে পদে। এই সময় এতগুলো টাকা বেহাত করা নির্বুদ্ধিতার কাজ। তাই এগিয়ে গিয়ে শঙ্করের হাত থেকে ছোঁ মেরে টাকাগুলো তুলে নেয় কাদম্বিনী।

—দে, আমিই রাখছি। টাকা বলে কথা, ফেলে রাখতে নেই।

শাড়ির খুঁটে পাক দিয়ে বেশ মজবুত করে গিঁট মারতে থাকে। নীতা মায়ের এই ব্যবহারে চমকে ওঠে। বেশ কঠিন স্বরেই ধমক দেয়—মা!

কাদম্বিনী ততক্ষণে চৌকাঠ পার হয়ে গেছে। পিছন ফিরে চাইলও না। নীতা যেন সুযোগ পেলেই তার থেকে ওই টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে শঙ্করকে ফিরিয়ে দেবে। নিরাপদ দূরত্ব থেকে বলে ওঠে কাদম্বিনী—তা বাছা, দিচ্ছে মা বলে, নোব না? হাজার হোক ছেলে। যোগ্য ছেলে। তুই বস বাবা। আমি আবার রান্নাঘরে মাছটা চাপিয়ে এসেছি। অনেকদিন মাছপাতুরি খাস নি -একটু চাপাই গে।

দাঁড়ালো না কাদম্বিনী।

শঙ্কর নীতার দিকে চেয়ে থাকে—স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে নীতা। শঙ্কর যাবার আয়োজন করছে—একটি কথাও আর বললো না নীতা, বাধাও দিল না তাকে।

ওরা যাক। গীতা গেছে। সনৎও চলে গেছে তার জীবন থেকে। দাদাও চলে যাক। ভিন্ন জগতের লোক ওরা; ফিরে যাক যে যার জগতে। পাখি ডাকা সুবর্ণ আভাময় ওদের জগৎ। নীতার জীবনের পথ তার থেকে অনেক দূরে। একাই চলেছে সে। ঝড়-দুর্যোগের মাঝে তারই বুকে দুর্গম বন্ধুর পথ চিরে চিরে।

যতক্ষণ পারে চলবে। তারপর? তারপর আর জানেনা।

চুপ করে আছে নীতা। দাদার ডাকে মুখ তুলে চাইল। দরদভরা কণ্ঠে শঙ্কর যেন অনুনয় করছে—অজানতেই নীতার মনে সবচেয়ে কোমল জায়গাটুকুতেই আঘাত দিয়েছে সে। দুঃখ পায় নিজেই; বল ওঠে শঙ্কর—আমাকে ভুল বুঝিস না নীতা, তোর ভালোর জন্যই বলছিলাম কথাগুলো।

এত দুঃখেও হেসে ফেলে নীতা।

—ভালো! আমার ভালো আর কি দাদা? যমকাকের মত রূপ, নিজে যাকে তিনবেলা খেটে একমুঠো ভাতকাপড়ের যোগাড় করতে হয়, তার আবার ভালো-মন্দ কি?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে নীতা অসহায় কান্নায়। জীবনের এই কঠিন বাস্তব রূপ তাকে নিদারুণভাবে আঘাত করেছে, ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই বেদনায় সারা মন গুমরে ওঠে। এ তো সে চায় নি। সেও বাঁচতে চেয়েছিল—ভালবেসে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। নারীর সব চাওয়া-পাওয়ার আশাই ছিল তার মন জুড়ে।

কিন্তু! সব মুকুল অকালে ঝরে গেছে। ফুল-ফলের সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে কঠিন উষর এই বন্ধ্যা মৃত্তিকায়। তাই এই ঝরঝর অশ্রুবন্যা।

শঙ্কর এগিয়ে আসে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। জীবনে ওর নারীত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে নিদারুণভাবে। সেই ব্যথা ভোলবার জন্যই নিজেকে অহরহ কাজে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও ভুলতে পারে নি নীতা।

শঙ্কর ওর জন্য দুঃখ পায়। কিন্তু নিরুপায় সে। এই জটিলতার আবর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায় না বলেই হয়তো সে সবে থাকতে চায়। নতুন করে নতুন জগতে বাঁচতে চায়। শঙ্কর বলে ওঠে—রাত্রির ট্রেনেই ফিরতে হবে আমাকে। কাল গাড়ি আসবে। ওগুলো পাঠিয়ে দিবি ভবানীপুরে।

কোন ছাত্রের বাড়িতে উঠবার ব্যবস্থা করছে।

বের হয়ে গেল শঙ্কর। রাতের বাতাস বইছে হু হু শব্দে। গাছ-গাছালির মাথায় হাহাকার জাগে।

নীতা বাধা দিল না তাকে। জীবনে কাউকে বাধা দেয় নি নিজে। কোন মতবাদের স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন কথাও জানায় নি। সহ্য করেই চলেছে—সহ্য করাই তার ধর্ম।

তাই শঙ্করও চলে গেল। দাদাও আজ আঘাত দিয়েছে তাকে।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার। মাধববাবু বোধহয় এখনও লিখছেন। তাই মাধববাবুর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। নীতা জানে সেই প্রকাশকের কাছে তাকে যেতে হবে কাল!

নিজের দুঃখটা ভুলে গেছে। মনে মনে স্বপ্ন দেখছে। বাবার বইখানা ছাপা হয়েছে, সমাদর পেয়েছে। সেই আনন্দে বৃদ্ধ মাধববাবুর শীর্ণমুখ হাসিতে ভরে উঠেছে।

বাবা ওকে যেন বলে চলেছে—বুঝলি নীতা; এ আমি জানতাম। এমন বই চলবে না?

বৃদ্ধ আবার বাঁচবার স্বপ্ন দেখছেন। সুন্দর জীবনের আশা তাঁর জীর্ণ চোখে। নীতা সেই হাসির ছোঁয়ায়-হাসছে বাবার দিকে চেয়ে।

নীতার মনে খুশির জোয়ার।

হঠাৎ একটা কাশির আবেগ আসে, সারা শরীরের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে যায়! গাটা কেমন জ্বর-জ্বর করে। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে। পায়ের নীচের থেকে চাদরটা চাপা দেয় তুলে। রাত কত জানে না। অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন রাত্রি, কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই।

দিনের আলোতে আবার জেগে ওঠে সুপ্ত উপনিবেশ।

কাদম্বিনী সংসারের চাকায় আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রেখেছে নিজেকে, কোথাও আসাযাওয়া বিশেষ করে না—করবার সুযোগও তার নেই। সেকেলে মানুষ যাতায়াত করতে ভয় পায়। তবু আজ সে জেদ করেই হাসপাতালে এসেছে মণ্টুকে দেখতে।

শঙ্করও বলেছে হাসপাতালে আসবে। তবু একবার দেখা করে আসবে তার সঙ্গে। তাই কাদম্বিনী নীতাকে অনুনয় করে—আমাকেও নিয়ে চল, বাছাকে একবার দেখে আসি।

মায়ের প্রাণ কাঁদে; নীতা মাকে সাবধান করে দেয়।

—দেখো, যেন কাঁদাকাটা কোরো না মা হাসপাতালে।

—না! কাদম্বিনীর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে; ছেলের এই বিপদে মুহ্যমান হলেও কেমন অসাড় হয়ে গেছে সারা মন।

বিরাট বাড়িগুলো—বাইরে এদিকে-ওদিকে কত লোকজন! রাস্তায় গাড়ির ভিড়, তাই

দেখে কাদম্বিনী অবাক হয়ে গেছে, কেমন যেন ভয় ভয় করে। নীতার হাত ধরে হাসপাতালের সীমানায় ঢুকে এগিয়ে যায় দুরু-দুরু বুকে।

এত লোকজনের যাতায়াতে কলরব ওঠে। সারি সারি রোগীর দলের মাঝে কর্মব্যস্ত নার্সদের দেখে কেমন ঘাবড়ে যায় কাদম্বিনী। মণ্টুও অনেকখানিও সামলে নিয়েছে এখন। মা, আর দিদিকে, সেইই যেন সান্ত্বনা দেয়।

—ডাক্তারবাবু বলছিলেন আমাকে, সার্জারিতে আজকাল অনেক উন্নতি হয়েছে। এমন জুতো বানিয়ে দেবে, পায়ে দিলে তুই বুঝতেই পারবি না দিদি। আর কোম্পানির ডেনিস সাহেবও এসেছিলেন।

—কি বললেন রে সাহেব? কাদম্বিনী যেন ভয় পেয়েছে। বেশ কিছু টাকার চাকরি, পঙ্গু হয়ে গেলে কি আর তাকে চাকরি দেবে। অসহায় বেকার পোষ্য হয়েই থাকতে হবে মণ্টুকে।

মণ্টুও তাই ভাবছিল। নিজের জীবনের এই বোঝা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল সারা মনে। কিন্তু সেই চিন্তার কালো মেঘ সরে গেছে।

বলে ওঠে, আপনি থেকে ছমাস ছুটি মঞ্জুর করেছে। তারপর চাকরি থাকবে। অন্য ডিপার্টমেণ্টে বসে বসে কাজ করতে দেবে। ডাক্তারবাবুরাও বললেন, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। ওসব ঠিক পারবো।

—আচ্ছা। মা যেন তাই করেন বাছা! মা জোড় হাতে নমস্কার করে একটু নিশ্চিন্ত মনে।

কাদম্বিনীর মুখের কালিমা খানিকটা মুছে যায়।

নীতা কথা রইল না। মাসে মাসে এই পঙ্গু অভিশাপগ্রস্ত দেহটা টানবার জন্য কিছু মজুরিই একমাত্র কাম্য তার। সেই আনন্দে পায়ের দুঃখও ভুলেছে মণ্টু। শুধু বেঁচে থাকার আনন্দে ওরা সব ভুলতে চায়। বাঁচাটাই যেন পরম সত্য।

দোষ দিতে পারে না নীতা, সেও বাঁচতে চায়। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায়, চারিদিকে আনন্দমুখর পরিবেশে সে গড়তে চায় তার সংসার—আনন্দময় একটি নীড়। কিন্তু কোথায় যেন বুকের মাঝে একটা কাঁটার মত ব্যথা বাজে। একটি ব্যর্থ স্বপ্নবীণা!

ওপাশে সনৎকে দেখে এগিয়ে যায়। এ যেন অন্য নীতা। এক মুহূর্তেই সে বদলে গেছে। সনৎ বলে ওঠে—কাল হাসপাতালে এসে ফিরে গেলাম।

নীতা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

কাদম্বিনী সনৎকে এখানে আসতে দেখে একটু অবাক হয়। ঠিক মণ্টুকে দেখতে নয় অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসে বোধ হয়।

কাদম্বিনী এগিয়ে আসে ওদের দিকে। নীতা মায়ের দিকে চাইল।

সনৎও কাদম্বিনীকে দেখে একটু যেন দমে গেল। কাদম্বিনীর সন্ধানী চোখে সনতের মুখের এই পরিবর্তনটা দৃষ্টি এড়ায় না। নীতা বলে ওঠে—কাল শরীরটা ভাল ছিল না। সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছি।

—কি হয়েছে? সনতের কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর। এগিয়ে আসে ওর কাছে। এত বলি, দিন কতক ছুটি নিয়ে একবার ডাক্তারকে দেখাও। অনেক খারাপ হয়ে গেছে তোমার শরীর।

কাদম্বিনী মণ্টুকে কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ ওদের দিকে চেয়ে একটু বিস্মিত হয়। নীতার হাতে সনৎ কিছু টাকা দিচ্ছে। ঘটনাটা তার কাছে বিচিত্র ঠেকে। নীতা

মাকে যেন কৈফিয়ৎ দেয়—টাকার কিছু দরকার কিনা। আবার মাস কাবারেই দিয়ে দোব। ধার নিলাম কিছু টাকা ওর কাছ থেকে। ওষুধের দোকানে লাগবে।

কাদম্বিনী কথা বলে না। নিজের কাছে শঙ্করের কিছু টাকা আছে, তা নিতেও সাধে না। কাল শঙ্করের টাকা ফেরত দিল, কিন্তু সনতের কাছে টাকা নিতে এতটুকু বাধে না তার। এটাকে বিশেষ ভালো চোখে দেখে না সে। চুপ করে থাকে কাদম্বিনী।

নীতা হাসপাতাল থেকে বের হয়ে একবার প্রকাশকের দোকানে যাবে বাবার কপিটা দিয়ে আসতে। কাদম্বিনীও সনতের সঙ্গে গীতাকে দেখতে গেল। কদিন থেকে তারও শরীরটা ভাল নেই। বারে বারে মাকে খবর পাঠাচ্ছে এর ওর মুখে।

মণ্টু বলে ওঠে- আর একটু বসবে না মা? এখনও ছটা বাজতে দেরি আছে।

—গীতার ওখানেও যে যেতে হবে বাবা। এতদূর এসে দেখা করে যাবো না?

মণ্টু চুপ করল। বেশ তাহলে এসো আর একদিন।

—হ্যাঁ

কাদম্বিনী ওখান থেকে বের হয়ে সনতের বাড়ির দিকে চলেছে।

নীতা কাজ সেরে স্টেশনে ফিরবে। মাও গীতার বাসা থেকে এসে স্টেশনে পৌছলে, তারা দুজনে বাড়ি যাবে, নীতা ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে চলে।

কাঁধের ব্যাগে বাবার বই-এব প্রুফ-কপিগুলো। সনতের দিকে চেয়ে বলে ওঠে নীতা—মাকে আটটা সাতাশের গাড়িতে স্টেশনে তুলে দেবে।

নীতা গীতার ওখানে যেতে একটু বিব্রত বোধ করে। সেই দুপুরের ঘটনার পর থেকে গীতার ওখানে আর যায়নি। যেতে মন চায় না নীতার। সেই ঘটনা মনে পড়লে নিজের কাছে দুঃসহ অপমান বোধ করে, সম্মানে বাধে তার। এমনিতে অসহায় সে, কিন্তু কোথায় যেন দুর্জয় তার আত্মশক্তিতে একটা নিজের বিশ্বাস আর দৃঢ়তা চাপা আছে—বিন্দুমাত্র ঘা খেয়ে জেগে ওঠে সেই আত্মসম্মানী মেয়েটি। সেখানে আপস করতেও যায় না।

সনৎও তা জানে। তাই আর যেতে অনুরোধও করে নি তাকে।

নীতার কথায় মুখ তুলে চাইল। নীতা বলে ওঠে—কলেজ স্ট্রীটে একটু প্রকাশকেব দোকানে যেতে হবে। দু-চারখানা বইও কিনবো। স্টেশনে মাকে তুমি পৌছে দিও, সামনেই অপেক্ষা করবো আমি। বুক স্টলের পাশেই।

—বেশ।

সনৎ জানে ওকে টলানো যাবে না। তাই চুপ করে সম্মতি দিল মাত্র। নীতা এগিয়ে যায় কলেজ স্ট্রিটের দিকে। কোথায় নীতার মনে একটা কাঠিন্য আছে যেখানে সনৎ ঘা খেয়ে ফিরে আসে বার বার।

প্রকাশক ভদ্রলোক নীতাকে আসতে দেখে খাতির যেন একটু বেশি মাত্রাতেই করে! সমস্ত কপিটা ইতিমধ্যে পড়ে দেখেছে। সস্তায় মন্দ জিনিস সে পাচ্ছে না। তাছাড়া কয়েকটা পরিচিত ইস্কুলে বই ধরাবার প্রতিশ্রুতি এসেছে। মাধববাবুকে অনেকেই চেনেন শিক্ষকরা।

নীতা আশাভরে ওর দিকে চেয়ে আছে, দোকানের আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই পত্র। খদ্দেরদের আনাগোনা চলেছে। কত দূরদূরান্তরে লোক নিয়ে যাচ্ছে বই। চিন্তার ক্রমবিকাশ চলেছে এই ভাবেই।

বুক কাঁপছে, দুরদুর, মাধববাবুর জীর্ণ মুখখানা ভেসে ওঠে। থরে থরে সাজানো রয়েছে যেন বাবার বইগুলো! একটা হাসি ভরা বৃদ্ধের চোখে জীবনের আশাপূবণের তৃপ্তি—আনন্দ!

প্রকাশকই বলেন—বই করেছেন মন্দ নয়। আর কি লিখছেন? লিখতে বলবেন তাঁকে।

—মাধববাবুর একটা সই যে দরকার!

দোকান সরকার একটা কনট্রাক্ট ফর্ম আর ভাউচার এগিয়ে দেন তার দিকে।

প্রকাশক ভদ্রলোক বলে ওঠেন—জানেন তো, একটা ফর্ম্যালিটি আর কি। নতুন গ্রামার-এর কথাটা বলবেন। পুরো কপি রেডি করতে হবে। নিন ভাউচারটা।

—আমার সই করলে হবে? না হয় কালই সই করিয়ে এনে দেবো।—

তাই হবে। নতুন পরিচয় কি না, তবে ওঁর লেখা আমাদের ভাল লেগেছে। বেশ খেটে লিখেছেন। সামান্য কিছু অ্যাডভ্যান্স আমরা নতুন গ্রামার বাবদ এখন দিই। পরে রয়্যালটি থেকে ওটা বাদ যাবে।

নীতা একটু অবাক হয়ে গেছে। এই মুহূর্তেই যেন বাবাকে খরবটা দিতে পারলে বাঁচতো সে। যেন কি এক রাজ্যে জয় করার সংবাদ নিয়ে চলেছে সে!

—কবে নাগাদ ও বই বেরুবে?

আগ্রহ ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে। প্রকাশক ভদ্রলোক ওর আন্তরিকতায় প্রথম দিন থেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন; অনুমানও করেছিলেন বাবার জন্য ওর ভালবাসার পরিমাণ। একটু হেসে জবাব দেন।

—কাল প্রেসে দেব, মাস তিন-চারের মধ্যেই বের হবে আশা করছি। জানেন তো কাগজের অবস্থা; সব যেন কালো বাজারে ঢুকছে। তবু ব্যবসা হবে। কাল ওটা সই করিয়ে আনবেন—দরকার হয় টাকাটা নিয়ে যান। সমর, ক্যাশ থেকে একশো টাকা দিয়ে একটা চালানে সই করিয়ে নাও।

নীতা যেন এই ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না। মনে হয়, সে যেন কি একটা স্বপ্ন দেখছে। মনে হালকা একটা সুর জাগে—বিকালের পড়ন্ত বেলায় আজ মনে হয় শরীরে মনে কোন গ্লানি নেই তার। সম্পূর্ণ সুস্থ আজ সে। দেহে মনে সবদিক থেকে আজ সুন্দর মনে হয়।

দাদার কথা মনে পড়ে। শঙ্করের উপর কেমন যেন বৃথা রাগ করে ওই কড়া কথাগুলো বলেছিল সে। আজ সবাইকে ভাল লাগে। ওদের সকলকে।

বাবার খুশির আনন্দে মন তার হালকা হয়ে গেছে। সবই তাই সহজ ঠেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় স্টেশনের দিকে। কি খেয়ালবশে চার পয়সার চীনাবাদাম কিনে নেয়—একটা একটা করে তাই ছাড়িয়ে চলেছে। বেশ লাগছিল তার।

পায়ে পায়ে মনের খুশি উপছে পড়ে নীতার।

গীতা কিছুদিন থেকেই দেখছে, সনতের মনে কোথায় একটা পরিবর্তন জেগেছে। আপিস থেকে ছুটি নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে, অন্য কোন পথের সন্ধান করছে সে। ভয় হয় চাকরিই ছেড়ে দেবে নাকি। বাইরের ঘরেই কাটায় বেশি সময় বইপত্র নিয়ে। ডেকেও, সাড়া পায়না এমনি তন্ময় হয়ে ডুবে যায় কাজে।

—ডাকছ?

গীতা একটু রাগত স্বরেই বলে ওঠে—কানে শুনতে পাও না?

গীতা বার বার ডেকেও সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

কি লিখছিল সনৎ, একগাদা বইয়ের থেকে কি যেন মহাসমস্যা খুঁজে উদ্ধার করতেই ব্যস্ত। বহু কষ্টে চিন্তাধারার খেই মেলাবার চেষ্টায় তন্ময় হয়ে আছে। এই সময় বাধা পড়তে ওর দিকে চাইল। গীতার ডাকে বিরক্ত হয়ে ওঠে।

—অসময়ে ডাকাডাকি না করলেই পারো! দেখছ কাজ করছি।

হাতের কলম ফেলে দিয়ে বেশ চড়া সুরেই বলে—বল, কি বলছিলে?

গীতার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়—থাক, তোমার শুনে কাজ নেই।

চলে গেল। গীতা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, বললো না।

কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কালো ছায়া সংসারে এসে পড়েছে। ক্রমশঃ গাঢ়তর হচ্ছে, পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে ঝড়ের মেঘ। সেই শান্ত মিষ্টি দিনগুলো গীতার মনে আজ কেমন হাহাকার আনে। সেদিনের সনৎ আজ নিঃশেষে বদলে গেছে, গীতা বেশ বুঝতে পারে সনতের কাছে সে একটা বোঝা হয়ে উঠেছে।

ভাবনাটা গীতার মনে ক্রমশঃ একটা বেদনার সাড়া আনে। নীরব সেই বেদনা। শূন্য ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে চারিদিক।

এমনি দিনে মাকে আসতে দেখে যেন সাহস পায় সে। কাদম্বিনী ওর বাসায় আসেনি। এখন এসে এদিক ওদিক সেদিক—এ ঘর সে ঘর দেখে; ঘরকন্না গেরস্থলির কথাও ওঠে। সনৎ বের হয়ে গেছে দোকানের দিকে, অতিথি সৎকারের আয়োজনেই বোধ হয়।

গীতা মায়ের কথায় মুখ তুলে চাইল—হ্যাঁরে, সনৎ চাকরিতে জয়েন দিয়েছে?

—না! ছুটি নাকি এখনো শেষ হয় নি। কে জানে বাপু, কি ওর মনে আছে। আমার তো ভয় করে মা।

কাদম্বিনী মেয়ের কথার সুরে কি যেন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে গীতার দিকে চেয়ে থাকে। মা দুচোখ মেলে মেয়ের মুখে কিসের সন্ধান করে।

—হ্যাঁ রে, ঠিকমত বনি-বনা—

মেয়ের পক্ষে এটা একটা যেন দুঃসহ লজ্জার কথা। মায়ের কাছেও কোন মেয়ে এত বড় অক্ষমতার কথা স্বীকার করে না। জবাব দেয় গীতা—না, না। তবে কি জানো, বড় একরোখা লোক।

সনৎ ঘরে ফিরেছে। তাকে শুনিয়েই শুনিয়েই কাদম্বিনী বেশ একটু অবাক হয়ে গলা তুলেই জবাব দেয়—অবুঝ হলে চলবে কেন বাছা। বিয়ে-থা করেছে, আজ বাদ কাল পুষ্যিপোত্রও এক-একটি বাড়বে। এখন হুট করে কিছু আর করা ঠিক নয়। চাকরি বাকরি তো করতেই হবে! তুই ভাল করে বুঝিয়ে বলিস বাপু।

গীতা মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। বেশ বিরক্তিভরা কণ্ঠেই বলে ওঠে গীতা—জানি না। যে যা ভাল বোঝে করুক।

গীতা নিজেই মায়ের এঁঠো বাসনগুলোয় জল বোলাতে থাকে। রান্নাঘরে তখনো রাজ্যের কাজ বাকি। দু-বালতি জল দিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে থাকে। এসব ঠিক কাদম্বিনীর ভাল ঠেকে না। কেমন্ ছাড়া ছাড়া ভাব দুজনের মধ্যে।

মায়ের চোখের সামনে কেউ কিছু এড়াতে পারেনি। কাদম্বিনীও ভাবেনি সনতের মনে এমনি ঝড় উঠবে পরে, এতদিন পরও তার জের চলবে।

রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে এসে মা বলে ওঠে—হ্যাঁ রে, একটি ঝি রাখিস না কেন? বলছিস শরীর ভাল নেই।

গীতা বেশ চড়া সুরেই জবাব দেয়—আমার গতরে ঘুন ধরে না মা। গতরই তো দেখেছে আমার। আর কোন গুণ তো নেই, তাই গতর খাটিয়েই খাই পরি। অন্য গুণ—লেখাপড়া-জানা চাকরে যদি হতাম তাহলে অন্য ব্যবস্থা হতো।

মা যেন বুঝতে পারে এগুলো গীতার কথা নয়। সনতের উপর রাগের কথা। তারই নিক্ষিপ্ত বাণগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গীতা এক-একটি করে তাক বুঝে ছুঁড়ে মারছে—শব্দভেদী বাণ।

এ ঘরে সনৎ বুঝতে পারে ওর উদ্দেশ্যে এই সব কথা শোনানো। মনে মনে রাগই হয় তার, বিশেষ করে মায়ের সামনে এগুলো না তুললেই পারতো গীতা। ঝিকে তো গীতা নিজেই জবাব দিয়েছে।

কিন্তু এ নিয়ে কথা তুললেই কথা বাড়বে। তাই চেপে গেল সে।

সনৎ স্টেশনে কাদম্বিনীকে তুলে দিয়ে আসে। বিশেষ কোন কথা হয় না। কাদম্বিনী এখানে এসে সনতের ব্যবহারে খুব যে খুশি হয়নি এটা বেশ বুঝতে পারে সনৎ।

নীতার চোখে মুখে খুশির হাওয়া। বাবার কনট্রাক্ট ফরমটা দেখায় সনৎকে। সনৎও খুশি হয়। কাদম্বিনীও শোনে কথাটা। নীতা বলে চলেছে—দেখো, কাজ করে এলাম একটা। বাবার নতুন বই-এর কনট্রাক্ট।

সনতের মনটা ভাল নেই। বাড়িতে কেমন যেন আবহাওয়াটা বিষিয়ে উঠেছে। তবু ওই কথাগুলো ভাল লাগে, মাস্টারমশায় খুব খুশি হবেন।

গীতার মনের জ্বালায় জ্বলছে ওই বাড়ির আলো বাতাস। ফিরতে যেন মন চায় না ওখানে সনতের। নীতার কথাগুলো শুনছে আনমনে।

মাধববাবুর বই ছাপা হচ্ছে। নীতার দিকে চেয়ে থাকে। তারই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এসব। কোন অমৃতদাত্রী নারী ও।

নিজের জীবনকে শুধু ব্যর্থ করে রেখে দিল। আশপাশের চারিদিকে তারই দেওয়া সুরভি-সৌরভ। যেন অভিশাপগ্রস্ত কোন নারী ও, জীবনের সঞ্জীবনীমন্ত্র সে জানে, শেখাতে পারে, তাই দিয়ে বাঁচবে অন্যজন। কিন্তু তার নিজের জীবনে যে মন্ত্রসাধন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কাদম্বিনী খুশি হয়—কত টাকা দেবে?

টাকাটাই তার কাছে প্রশ্ন, সে চাকরি করেই হোক, আর লিখেই হোক। আর গান গেয়েই হোক। সবকিছুর মূল্য তার কাছে টাকা-আনা-পাই-এ।

হাসে নীতা—বই বিক্রি হলে আরও দেবে। এখন একশো আগাম দিয়েছে! ট্রেনের দিকে এগিয়ে যায় তারা প্ল্যাটফরমের ওদিকে। সনৎ ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

গীতা কিছু দিন আগেও দেখেছিল টাকাটা। একটা কানের গহনা গড়াবার শখ, মাকেও ডিজাইনটা দেখিয়েছে। দোকানে দেবার জন্য টাকাটা খুঁজতে গিয়ে অবাক হয়—এ বাক্স ও সুটকেস এখান-ওখান হাতড়েও পায় না। টাকাটা যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। ঝি-চাকরও কেউ নেই যে সরিয়ে নেবে। তালাচাবিও ঠিক রয়েছে! তবে গেল কোথায় টাকাটা! কি যেন ভাবছে সে।

সনৎ ওদের স্টেশনে তুলে দিয়ে ফিরে আসছে। মনে মনে কোথায় একটা বেদনা অনুভব করে। নিজের কাছেই নিজেকে ছোট অসহায় বোধ করে আজ সনৎ প্রচণ্ড ভাবে। কোন কিছুই করণীয় যেন নেই। একা সে। মাধববাবুর একটার পর একটা টেক্সট বুক আজ ভাল দোকান থেকে ছাপা হচ্ছে। খ্যাতি সম্মানও পাবেন তিনি।

মাধববাবুর মত স্থবির লোকও আজ নিজেকে প্রকাশ করবার পথ পেয়েছেন! আর সে? হেলায় হারিয়েছে মহত্তম জীবনের সব আমন্ত্রণ। কিসের মোহে সে জানে না! নিজেকে ব্যর্থ করেছে সে—নষ্ট করেছে সব সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। এইসব আজ চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছে।

বাড়িতে পা দিয়ে দেখে, ঘরের মেঝেতে গীতা বসে আছে গুম হয়ে, সুটকেশ বাক্স হাঁটকানো, মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে জিনিসপত্র জামা শাড়ি। সনৎ ঘরে পা দিয়ে একটু অবাক হয়।

গীতা কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে ওকে—দেড়শো টাকা ছিল এখানে, কি হল?

সনৎ চমকে ওঠে। নীতাকে টাকা দেবার খবরটা কি তবে কোনরকম জানতে পেরেছে! একটু সামলে নিয়েই বলে—মণ্টুর অসুখ, ওষুধপত্র কিনতে হচ্ছে, তাই নীতাকে দিয়েছি!

দপ্ করে জ্বলে উঠে গীতা—মিথ্যা বলতে একটু লজ্জা হল না? নীতাকে উপহার দিয়েছো বলো! পুরোনো প্রেম কি সহজে ভোলা যায়!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে ওঠে সনতের, এই জঘন্য মন্তব্যে। চুপ করে চেয়ে থাকে; বার বার তাকে এই উপলক্ষ তুলে ছুতোয় নাতায় অপমান করতেও দ্বিধা নেই ওর।

স্ত্রী। একমাত্র এই অধিকারেই ওর মনের সব কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র অনুভূতিকে ও নিঃশেষে গলা টিপে হত্যা করবার দাবি রাখে। ওর যুক্তিসঙ্গত অন্য কোন কারণই পায় নি সে। জবাব দেয় সনৎ, বেশ কঠিন হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর। আজ সেও প্রতিবাদ জানাতে চায়। প্রয়োজন ছিল তাই দিয়েছি। আমার টাকা, খরচ করবার স্বাধীনতা আমার নিশ্চয়ই আছে!

গীতা চটে ওঠে, আরও গলা চড়িয়ে বলে—কথাটা বলতে একটু লজ্জাও বোধ হল না?

—কেন লজ্জার কোন কাজই করিনি।

—কাল একটা বেউশোকে টাকা দিয়ে এসেও ওই কথা বুক ফুলিয়ে জাহির করবে? তাও যদি পাঁচ সাতশো রোজগার করতে।

গীতার জিভ দিয়ে জ্বালাধরা কথা বেরুচ্ছে গলগল করে। চুলগুলো খুলে লুটিয়ে পড়েছে। ফরসা টকটকে রঙ লালচে হয়ে উঠেছে। যেন ফণা মেলে দাঁড়িয়েছে এক কালনাগিনী, চোখে তার হিংসার অগ্নিজ্বালা, জিভে গরলের তীব্রতা। এই দর্পিণী রূপ দেখেনি সনৎ—ওর অন্তরের সমস্ত পুঞ্জীভূত বিষ মুখে চোখে এসে জমেছে। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই পরিবেশ।

—থামবে তুমি! বাধা দেয় সনৎ।

আজ সব কিছুর জন্য সে তৈরি হয়ে উঠেছে। এমনি করে তিলে তিলে সহ্য করবে না সে গীতার সমস্ত অভিযোগ। দরকার হয় আজ অন্য পন্থাই নেবে। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে হোক না কেন, প্রস্তুত সে। অসহ্য হয়ে উঠেছে তার এই প্রহসন।

গীতা ওর কথার সুরে ঘাবড়ে যায়।

সনৎ বলে চলেছে—এমনি অসংযত কথা বললে তার ফলও ভাল হবে না। ঢের সয়েছি। সহ্যের একটি সীমা আছে। সাবধান করে দিচ্ছি। টাকা গেছে, টাকা আবার ফিরে পাবে। কাকে হিংসা কর? কেন? ছিঃ!

সনৎ বের হয়ে গেল। বাইরের ঘরে গিয়ে বসেছে।

কাগজপত্র বই এদিক-ওদিক ছড়ানো। মেঝেতে জমা-করা একগাদা ছেঁড়া কাগজের জঞ্জাল, সিগারেটের কুচি। এসব যেন ইচ্ছে করে ঝাঁট দেয় না গীতা। পড়াশোনায় মন দিতে পারে না; হু-হু জ্বলছে আগুন। সনতের মনে হয় জীবনে এই নীচতার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। একজনকে মনে পড়ে সংসারে জন্য সে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেছে। কিন্তু জানে না যাদের জন্য এত ত্যাগ সে করেছে, কি তাদের পরিচয়। নীতার সম্বন্ধে তারা কি ভাবে। মনের কোণে তাদের নীতার জন্য এতটুকু সম্ভ্রম বোধও নেই।

ওরা জানে ওরা নিজের অন্তরের দিক থেকে নিঃস্ব কাঙাল। তাই পরিপূর্ণ মানুষের সেই দুর্লভ গুণ যার অন্তরে আছে, নিঃশেষে অপরকে ভালবাসার মন্ত্র যে জানে, সেই সম্পদকে—নীতার মনের সেই ঐশ্বর্যকে, হিংসা করে ওরা। তাই গীতার এই হীন ধারনা নীতার সম্বন্ধে।

নিজের চারিপাশে একটা নাগপাশের বন্ধন অনুভব করে সনৎ। আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। পদে পদে অপমানিত করেছে তাকে। যেখানেই মুক্তির পথ খুঁজেছে, পেয়েছে শুধু বাধা আর বাধা। সনৎ আজ বাধার দুস্তর পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধববাবুর মনে আনন্দের জোয়ার। নীতার দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। চুক্তিপত্রে সই করে বৃদ্ধ যেন আজ আনন্দে উপছে পড়ছেন। ঋণী তিনি। নীতার কথা মনে হয় বার বার।

কাদম্বিনী স্বামীর কথায় ফিরে চায়—ওর গুণ তুমি জানো না বড়বৌ! ভগবান সব গুণ ওকে দিয়েছে।

কাদম্বিনী গীতার দুঃখ ভোলে নি। তখনও মনে মনে গজরাচ্ছে। গীতার সংসারে দুঃখের কালো ছায়াটা মুছে যায় নি, তার জন্য সে নীতাকেই দায়ী করেছে। মাধববাবুর কথায় জবাব দেয় কাদম্বিনী—হ্যাঁ, খুব গুণবতী মেয়ে তোমার!

কথাটায় বিদ্রূপের জ্বালা ফুটে ওঠে। মাধববাবুর মনের অবস্থা অন্যরকম। ওদিকে কান দেবার সময় নেই। বলে ওঠেন—প্রেসে দেবার পর যেন প্রুফ পাঠায় নীতা, আর একটু কারেকশন করতে হবে। বলে দিবি ওদের।

—আচ্ছা!

নীতা মায়ের দিকে চেয়ে থাকে, মায়ের মুখচোখ থমথমে ভাব। স্টেশন উঠে অবধি ভাল করে কোন কথাই বলে নি মা; কোথায় যেন কি একটা ঘটেছে মায়ের মনে।

ঠিক অনুমান করতে পারে না। মা কেমন এড়িয়ে চলছে তাকে।

সকাল বেলায় নীতা স্নান খাওয়া সেরে আপিসে বের হচ্ছে। স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়। আপিসের বাবুরা জমেছে স্টেশনে, হাঁ করে চেয়ে আছে কখন ট্রেন আসবে। আছে স্কুল-কলেজের ছাত্র ফেরিওয়ালার দল। গুপী মিস্তিরও অনেক পথ ঘুরে শেষকালে চাকরির সোজা পথে এসেছে এইবার।

আপিস করছে। হাতে টিফিনের কৌটা—ছোট তোয়ালে, বাজার করে ফিরবে সন্ধ্যাবেলায়। উদ্ধত শৌখিন যুবকটির মনে মনে এসেছে পরিবর্তন। সেই উড়ু উড়ু ভাব আর নেই।

নীতাই প্রশ্ন করে—আপিস চলেছো?

—হ্যাঁ!

বদলেছে ওদের জীবন। মাপকাটা ছকের মধ্যে যেমন করেই হোক না এনে ঢুকিয়ে দেবে এই নিয়ম। গুপী মিস্তিরের মত বেপরোয়া মনকেও সংসারের-চাপ দুরস্ত করে ফেলেছে। ওরা মাথা নুইতে বাধ্য হয়েছে।

চারিদিকে সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে সেই ছক বাধা; তার বাইরে মাথা ঠুকেও লাভ নেই। একদিন সনাতন জীবনে ওর অল্পায়ুর দল এসে মাথা নোয়াবে সামান্য নিশ্চিন্ততার ব্যর্থ আশায়।

এগিয়ে চলেছে নীতা। হঠাৎ সনৎকে এ সময় দেখে একটু অবাক হয়। নির্জন ছায়াঘন হাঁটা পথ দিয়ে আসছে সে। চোখে মুখে কি একটা দুশ্চিন্তার জমাট ছায়া, স্নানও করেনি। চুলগুলো উশকোখুশকো; কেমন যেন থমথমে ছায়া ওর মুখে-চোখে। নীতা একটু অবাক হয়ে গেছে ওকে এই সময় এখানে দেখে। প্রশ্ন করে—তুমি! এ সময়? কি ব্যাপার?

সনৎ দাঁড়াল, ওর দিকে চেয়ে আছে ব্যাকুল চাহনিতে। নীতা ঠিক বুঝতে পারে না।

নীতা বলে ওঠে—চল বাড়ির দিকে।

—না! সনৎ জবাব দেয়। মনে ওর একটা ঝড় বইছে। হঠাৎ যেন সেই ঝড় ছাপিয়ে বলে ওঠে সে—আজ আপিস নাইবা গেলে নীতা। একটু দরকার ছিল।

অনুনয়ের সুর ফুটে ওঠে সনতের কথায়। কেমন বিচিত্র ঠেকে এই আহ্বান। গিনিগলা রোদের নিবিড় স্পর্শ লেগেছে মিশকালো আঁশফল গাছের পাতায় পাতায়। ক্লান্ত উদাস সুরে পাখি ডাকছে, কর্মব্যস্ত জীবন থেকে শান্ত মধুর এক স্বপ্নজগতের ক্ষণিক আহ্বান। থমকে দাঁড়ায়! এ যেন অন্য কোন নীতা। ব্যাকুল কামনামদির মন হঠাৎ যেন এরই জন্য কান পেতে ছিল, এত দুঃখ হতাশার মাঝেও।

এমনি উতলা হতে দেখেছে সনৎকে বহুবার—সে আজ স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু ফেলে আসা দূরপথ যেন ছায়াসন্ধান নিয়ে হাতছানিতে তাকে ডাকে বার বার। আজও।

জলার ধারে ঘন-কালো পাতা ভরা রেইনট্রি গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নাড়ছে বাতাসে সবুজ হোগলা বন। কোথায় ডাহুক ডাকছে থেকে থেকে। এখানে ওরা আগে আসতো—বেশ সুন্দর ঠাঁইটা।

কালো আয়ত চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে থাকে নীতা। হারানো দিনের পরে আবার যেন অতর্কিতে ফিরে এসেছে দুজন, সব বাধা ব্যবধান উত্তীর্ণ হয়ে সেই ছায়ামগ্ন তীরভূমিতে। আজও সেখানে পাখি ডাকে, ফিরে আসে ঝরা বকুলের গন্ধমাখা মৌসুমী বাতাস।

নীতা ওর দিকে চেয়ে থাকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। সনৎ বলে চলেছে—জীবনকে যেদিন চিনি নি, সেই দিনই পাশার ছকে বাজি ফেলে বিকিয়ে দিয়েছি তাকে। হঠাৎ যেদিন বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেলাম সেদিন দেখি দেউলিয়া। কোন পুঁজিই আমার নেই।

নীতা ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। সে জানে গীতার কাছে সনৎ পেয়েছে অফুরান আঘাত, ওর জীবনের মূল সুর কোন দিনই তার সুরে মেলে নি, বেসুরো ঠেকেছে বার বার! তাই এই অশান্তি আর ব্যর্থতায় মন ছেয়ে বসেছে। কালো করে দিয়েছে ওদের মনের সব আলো।

সনৎ ব্যাকুল কণ্ঠে আজ ডাক দেয়—নীতা! আজও ফিরে পেতে ইচ্ছে করে সেই জীবন! তার জন্য সমস্ত ত্যাগ সইতে পারবো।

—সনৎ। নীতা চমকে ওঠে। সনৎ থেমে গেছে। নীতা বলে চলেছে—কিন্তু ফেরবার পথ কই সনৎ! তোমার আমার এ পরিচয় কোন দিনই সমাজ স্বীকৃতি দেবে না! লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না কোথাও! তা আর হবার হয়।

—তাই বলে মুখ বুজে এই অভিনয় আত্মবঞ্চনা সহ্য করে যেতে হবে দিনের পর দিন?

সনতের কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর। পুরুষ অধৈর্য হয়ে ওঠে, সে চায় ভাঙন। নারীর স্বভাবে বন্ধনটাই সত্য। তাকে মেনে নিয়ে সে হয় তৃপ্ত।

নীতা জবাব দেয়—অভিনয় নয় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এরই মাঝে খুঁজতে হবে সমাধানের পথ—শান্তির স্পর্শ।

একটা কথা মনে পড়ে বার বার। একটা গানের সুর। শঙ্কর এক দিন কথায় কথায় বলেছিল—দুঃখকে এড়িয়ে শান্তি নয়। দুঃখকে বরণ করে নিয়েই—জয় করার, সহজ ভাবে গ্রহণ করার, নামই শান্তির সন্ধান! কঠিন সে তপস্যা তবু তা সত্য।

নীতা যেন নিজের সেই চরম শান্তিরই সন্ধান করে চলেছে। নীরবে মেনে নিয়েছে তার ভাগ্যের সব নিষ্ঠুর পরিহাস। সনৎ ওই মতে বিশ্বাস করে না! চোখের উপর দেখেছে নীতার এই দুঃখ-দহন। তাই প্রতিবাদ করে।

—তুমিও কি প্রায়শ্চিত্ত করবে? কি তোমার পাপ?

আজ নীতা স্বীকার করে তার দোষ। সেদিন নিজের দাবি জানাতে এগিয়ে যায় নি কেন! গীতা সেই ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়েছে মাত্র। দোষী সে নিজেই। ম্লান হাসিতে ভরে ওঠে ওর মুখ। জবাব দেয় নীতা ম্লান কণ্ঠে।

—দোষ আমার সাধারণ হওয়া। অতি সাধারণ মেয়ে আমি। নিজেকে অভিমানে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। বাকি অক্ষমতাটুকু আমার নয়। ভগবান যদি কেউ থাকে—তারই। আমি কালো কুৎসিত, পুরুষের মন ভোলাবার মত কোন পাথেয়ই আমার নেই।

—নীতা! আজ বাধা দেয় সনৎ। সে দিনের মোহমুক্ত সনৎ। রূপের সংজ্ঞা বদলে গেছে তার কাছে, শুধু চোখের নয়, মনের রূপটাই আসল বলে দেখেছে সনৎ। মনের মাধুরী দিয়ে নীতাকে আজ তাই রূপবতী বলে দেখেছে সে। অন্তরের সেই অসীম স্নিগ্ধশ্যাম রূপ তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। কি যেন সম্পদ আর হারাবার দুঃখ সে সইতে পারে না।

কথায় কথায় বাগানে মধ্যে এসে পড়েছে তারা। সরু পথের দুপাশে সবুজ গাছগাছালি, বাতাসে প্রথম আম্রমুকুলের মধুসৌরভ, গুনগুন সুরে ওড়ে মৌমাছি! ঘেঁটুফুলের উদগ্র সুবাসে মনে কি এক ব্যাকুল মদিরতা আনে। ওর একটা হাত সনতের হাতে, সব বাধা যেন ভাঙতে চায় সনৎ! হু হু ঝড় বইছে গাছের মাথায়। নীল নির্জনে নীতা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে—বুক ঠেলে উঠেছে সেই ব্যর্থ ব্যাকুল নারী—সব হারানোর দুঃখে যে কাঁদে, পাওয়ার স্বপ্নে যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে—একে চেনে না নীতা। এ যেন তার অন্য সত্তা। ঊষর জীবনমরু ক্ষণিকের বর্ষণেও সুধাস্নাত হোক। সব ভুলে যায় সে। ভুলে গিয়ে তৃপ্ত হতে চায়।

হঠাৎ চমকে উঠে নীতা! পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

সনৎ চেয়ে আছে ওর দিকে—পাতার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো ওর থমথমে মুখে আলোছায়ার মায়াজাল রচনা করেছে। বিচিত্র এক রহস্য আর আহ্বানের ভাষায়। নীতা চমকে উঠেছে।

ব্যাকুলকণ্ঠে সে বলে ওঠে—সনৎ অনেক বেলা হয়েছে, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

—আমার কথার জবাব দাওনি নীতা।

স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে নীতা—জবাব অনেক আগেই দিয়েছি সনৎ!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল সে। নীতার মুখে ম্লান হাসির আভা!

সহজ ভাবেই কথাটা বলবার চেষ্টা করে নীতা—সে জীবন অনেকদিন আগেই ফেলে এসেছি সনৎ। কোন দাবিও রাখি নি। নিঃশেষে মুক্তি দিয়েছি তোমাকে সেই দিনই। দুজনের পথ আজ বেঁকে গেছে দুদিকে।

—নীতা!...আবার যদি ফিরে যাই সেই পথে! সনৎ তখনও ডাক দেয় তাকে।

দূরাগত সেই সুর তবু নীতার কানে বাজে না।

বলে ওঠে, নীতা—কোন দিন আর ও কথা মুখে না তুললেই খুশি হবো সনৎ। ও স্বপ্ন আমি কোন দিনই দেখতে আর চাই না।

শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর ভিজে আসে। নীতা নিজের দুর্বলতা চেপে বেশ কঠিন স্বরেই বলে ওঠে—তুমি যাও, ফেরবার ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। নীতা উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে চলে রোদের মাঝে ছাতাটা মেলে।

একা বসে রইল সনৎ স্তব্ধ হয়ে।

পিছন ফিরে চাইল না নীতা, বের হয়ে গেল বাগান থেকে।

প্রায় জনশূন্য পথে দুপুরের রোদ উপছে পড়ছে, কেমন যেন বন্ধ্যা ধরিত্রী কাঁপছে রোদের তাপে; বিশুষ্ক ধরিত্রী—নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ওর বুক থেকে হাজারো রৌদ্রশিখায় বিস্তারিত হচ্ছে। অসহ্য কেমন জ্বালা ওঠে সারা বাতাসে। জ্বলছে সর্বংসহা মৃত্তিকা। শুকিয়ে ফেটে উঠছে মাটি নিষ্করুণ শুষ্কতায়।

বাগানের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল নীতা; এক ঝলক তীব্র রোদ যেন ছাড়াপাওয়া একঝাঁক জানোয়ারের মত লাফ দিয়ে এসে পড়েছে অতর্কিতে তার উপর, ধারালো নখদন্ত বিস্তার করে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, একটা প্রচণ্ড কাশির ঝোঁকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে; কানের কাছে সেই হু-হু শব্দ মাঠ গাছগাছালি কাঁপিয়ে এগিয়ে আসছে প্রবল বেগে—তাকে হারিয়ে ফেলে কোন শূন্যে বাজপাখির শিকার ধরা করে তুলে নিয়ে যেতে চায়—উধাও করে দিতে চায়। ঝাঁ-ঝাঁ করছে কান মাথা। সব বসন্তকে ব্যর্থ প্রত্যাখ্যানে ফিরিয়ে দিল সে। সারা হৃদয়ের এই সেই নীরব কান্না।

কাশছে! জিভের উপর নোনতা আস্বাদ! হঠাৎ চমকে ওঠে নীতা! পরক্ষণেই সোজা হয়ে এগিয়ে যায়। দূরে দেখা যায় স্টেশনের দিকে ফিরে যাচ্ছে সনৎ। ডাকতে গিয়ে থামলো, ওকে ফেরাতে পারে না নীতা। কোনমতেই পারে না। ও চলে যাক, দূরে যাক। বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে সে।

সারা শরীরে একটা দুঃসহ ক্লান্তি ঘনিয়ে আসে।

মাকে কিছু না বলেই নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল নীতা। গীতা চলে যাবার পর গোটা ঘরটাই তার দখলে। পরিষ্কার করবারও সময় নেই। কোনমতে একটা চাদর টেনে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকে বিছানায়। জ্বর-জ্বর বোধ হয়। মাথা তোলবার ক্ষমতাও নেই, যন্ত্রণায় যেন ছিঁড়ে পড়ছে। কাশিটা থেমেছে তবে ক্লান্তিতে তখনও হাঁপাচ্ছে নীতা।

মাধববাবু আবার করবার মত কাজ পেয়েছেন। প্রুফ দেখা, লেখা। অবকাশ সময়টুকু

কাজে ভরে ওঠে। আবার কারেকশন করা নিয়েই দিন কাটে; তারই গল্প হয় নীতার সঙ্গে। বলেন—দেখেছিস, থার্ড চ্যাপ্টারটা কি করেছি। নতুন করে লিখলাম।

নীতা বাবার কথায় সায় দেয়—হ্যাঁ দেখেছি। চমৎকার হয়েছে।

—দেখেছিস তাহলে? হবে না? রীতিমত খেটেছি। বুঝলি, পারফেক্ট করতে হবে তো। পড়ার বই বলে কথা।

কাদম্বিনী যেন ধীরে ধীরে সংসারের হাল ধরতে এগিয়ে আসছে। নীতা রোজগার করতেই সব উৎসাহটুকু নিঃশেষ করে দিয়েছে, মাকে তুলে দেয় টাকা; সংসারের জমা খরচের ব্যাপারে আর থাকতে ইচ্ছা করে না।

আপিস থেকে মণ্টুর সাহেব এসেছেন। মাধববাবুর ঘরে বসেন। তিনি আলাপ পরিচয় করেন—ছোট সাহেব মিঃ রবার্টস।

মাধববাবুর সঙ্গে তিনি ইংরাজীতে আলাপ করে অবাক হন। ইংরাজ হয়ে ইংরাজি কাব্যসাহিত্য তিনি কিছু পড়েছেন, এঁর জ্ঞান তার চেয়ে অনেক বেশি। নীতা চা নিয়ে আসে। সামান্য আয়োজন কিন্তু অভ্যর্থনার ত্রুটি নেই।

মিঃ রবার্টস আশা করেছিলেন সাধারণ একজন মজুরের মতই এদের পরিবেশ হবে, ইতিপূর্বে তাদের অনেককেই দেখেছেন তিনি। কিন্তু এদের বাড়ি এসে দেখেশুনে অবাক হয়ে যান তিনি।

দেশবিভাগের উদ্দেশ্য আর ইংরাজের এই শুভকাজে কতটুকু হাত ছিল, মাধববাবু তাই নিয়েই বেশ আলোচনা করেন উদ্বেগ জড়িত কণ্ঠে। এ্যালেন ক্যামবেলের লেখা নতুন বইটার কথা আলোচনা করেন। ইংরাজের কূটনীতি আর দূরদর্শিতার কথাও ভোলেন নি তাঁরা, আজ একটা জাতির এই চরম দুর্ভাগ্যের জন্য ইংরাজও কম দায়ী নয়।

মিঃ রবার্টস দীর্ঘদিন এদেশে আছেন। তিনিও জানেন এর কতখানি সত্য। তাই প্রতিবাদ করতে পারেন না।

মাধববাবু বলে চলেছেন—তোমরা ইচ্ছা করেই এটা করেছিলে।

রবার্টস হাসছে। নীতা বাবাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে—তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে বাবা।

—যাই মা!

আবার তর্কের খেই ধরে বলতে থাকেন—একটা জাতের মেরুদণ্ড তোমবা ভেঙে দিয়েছো—'ইউ হ্যাড টানর্ড দেম টু এ ক্লাস অব বেগাবস্।' তোমার আমার এতে কোন হাত ছিল না মিঃ রবার্টস, জাতিগত ভাবে কথাটা বলছি।

কাজের কথায় আসেন সাহেব।

—মণ্টুর দুর্ঘটনার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। কোম্পানির তরফ থেকে তাকে চাকরিতে রাখবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

—'সো কাইণ্ড অব ইউ'! কথাটা নীতা বলে ওঠে।

রবার্টস সঙ্কোচ বোধ করেন—না, না, এটা আমাদের কর্তব্য।

কাদম্বিনী দরজার পাশ থেকে কৌতূহলী ভঙ্গীতে উঁকি মেরে দেখছে শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গবকে। তার বিজাতীয় ভাষা বোঝবার ক্ষমতা নেই, তবু কি যেন আশার কথা বলছে, এটা নীতার দেখেই অনুমান করতে পারে।

সাহেব চলে যেতেই বের হয়ে আসে কাদম্বিনী—কি বললেন? হ্যারে?

মাধববাবুই জবাব দেন এক রাশ প্রুফ থেকে মুখ তুলে,—মণ্টুর চাকরি থাকবে। কোম্পানি থেকেই একটা কাঠের পা দয়া করে তৈরি করে দেবে। সেই সঙ্গে হাজার কয়েক টাকা ক্ষতিপূরণও দেবে।

ঠিক খুশি হন নি মাধববাবু। প্রথম দিন থেকেই মণ্টুর ওখানে চাকরি করা—তার হাবভাব চালচলন কোনটাই ভাল চোখে দেখেননি। ছেলেবেলা থেকে—যৌবনকালে পীরগঞ্জে থাকতে ইংরাজ জাতটাকে কোনদিনই ক্ষমার চোখে দেখেন নি তিনি। এর জন্য দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, পুলিশের জুলুমও সয়েছেন। ওদের খাতায় নাম উঠেছে, কারণে-অকারণে জেরাও করেছে পুলিশ তাঁকে।

আজ সেই তাদেরই ডাকে ছেলেকে চাকরি করতে দেখে খুশি হন নি, তৃপ্ত হন নি, ওদের অযাচিত এই করুণার দানে। নীতাকেই কথাটা বলেন—এ ভিক্ষাটুকু না নিলেই ভালো হতো নীতা!

নীতা বাবার বুকের জ্বালার খবর জানে। চুপ করে থাকে।

ফোঁস করে ওঠে কাদম্বিনী—তা নেবে কেন? উপোস দিতে হবে যে?

মাধববাবু চটে ওঠেন—তাই বলে ভিক্ষে নিতে হবে? কাদম্বিনীও কড়া জবাব দিতে যায়, নীতার কথায় থামলো

—তুমি কাজে যাও মা!

কাদম্বিনী তখনকার মত রাগ চেপে রইল।

বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করে নীতা—এ ক্ষতিপূরণ তারা লেবার কোর্টের চাপে দিতে বাধ্য হয়েছে বাবা। ওদের ইউনিয়ন চাপ দিয়েছে—তবেই না এসেছেন উনি। নইলে এত দয়া ওঁদের?

—ও! তাই নাকি?

কথাটা খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। মাধববাবু চুপ করে চাইলেন নীতার দিকে। নীতা বলে চলেছে—হ্যাঁ; সবই বলেছে আমাকে মণ্টু।

কাদম্বিনী মনে মনে খুব অখুশি হয় নি। সুস্থ থাকতে মণ্টুর রোজগার চোখে দেখে নি, দয়া করে মাঝে মাঝে কিছু দিয়েছে কদাচিৎ। এখন একসঙ্গে বেশকিছু টাকা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে এবং বাড়িতে বসে মাস চারেক কয়েকশো টাকা আসবে। তার উপর নীতার ছিটেবেড়ার রোজগার আছে—জমেছে শঙ্করের দেওয়া কিছু টাকা। বাড়ির দু'খানা ঘর ফেলে পাকা দোতলা বানাবার স্বপ্ন দেখে। কোনরকমে কাজ শুরু করতে পারলে শঙ্করের কাছ থেকে আরও কিছু নেবে—আজ কাল নাকি বেশ রোজগার করে সে। নবীন মুদির দোকানে রেডিওতে শোনা যায় তার গান। খুব ভাল গাইয়ে হয়েছে সে এখন।

সেদিন দত্তগিন্নীই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় কাদম্বিনীকে।

—তা এইবার দুপয়সা আসছে দিদি, কোনরকমে ঘরটা তুলে নাও। ছেলের বিয়ে-থা দিতে হবে। এদিকে তো শুনলাম সুখবরটা।

সুখবরই। কাদম্বিনীর মুখে চোখে খুশির আভা। মনের কোণে আলো জাগে।

আবার দিন বদলের আশা করে সে। দুঃখ চিরকাল থাকে না। মুখবুজে সইতে পারলে যুঝতে পারলে দুঃখও একদিন হার মানে।

কাদম্বিনী নতুন জগতের স্বপ্ন দেখছে, নতুন ঘরের। ওদিকে এগিয়ে যায়। আজ বাড়িতে নানা কাজ। সত্যনারায়ণ পুজো দিচ্ছে।

পুজোর আয়োজন পত্র আছে। নীতাকে তাগাদা দেয়—হলো রে নীতা?

—হয়েছে মা, যাচ্ছি।

নীতা ঘরটা সাফ করছে, মন্টু আসবে আজ হাসপাতাল থেকে। তারই মানসিকে আজ বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর আয়োজন করেছে। গীতাকেও আনতে পাঠিয়েছে মা, কলোনির কোন ছেলের মারফত।

চারিদিকে নানা ঝামেলা, একা কাদম্বিনী হিমশিম খেয়ে যায়। মাধববাবুও নিজেই বাজারে গেছেন।

বেশ কিছুদিন পর মাধববাবু আবার যেন ভরসা পেয়েছেন, মানুষের মাঝে বাঁচবার একটা আশার আলোর সন্ধান পেয়েছেন। কাদম্বিনীর কথাটা মনে ধরে মাধববাবুর।

—ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করো না? তাদের দয়াতেই সব দিকই রক্ষা হয়।

চিরকালই ওদিকে খেয়াল করেন নি মাধববাবু। মানবধর্মে বিশ্বাসী একটি সংস্কারমুক্ত মন। স্ত্রীর মনে আঘাত দিতে চান না। হাসেন তিনি চুপ করে। বলে ওঠেন—তাহলে পুজোর বাজার করতে যেতে হবে বলো?

—যাও না!

—দাও, একটু ঘুরেই আসি।

অনেক দিন পর আবার পথে বের হন মাধববাবু।

রোদের আলো পড়েছে গাছগাছালির মাথায়, পথের দু-ধারে বাড়ির চালে লতিয়ে উঠেছে কুমড়োলতার হলদে ফুলের অমলিন হাসি। বাতাসে কেমন চাপা সৌরভ জাগে। পৃথিবী সুন্দর—মানুষের মনে তারই স্পর্শলাগা চাঞ্চল্য!

সনৎ ফিরে গেছে বাড়িতে।

বাড়িতে পা দিয়ে কেমন স্তম্ভিত হয়ে যায়। মনে তখনও জেগে রয়েছে নীতার কথাগুলো। কেমন যেন সঙ্কুচিত বোধ করে নিজেকে। নীতার সেই চাহনি—দৃঢ়স্বরের সতেজ প্রত্যাখান তাকে আজ নতুন পথের সন্ধান এনে দিয়েছে। কি যেন মস্ত একটা ভুল করতে বসেছিল সে। দুস্তর লজ্জা তার মনে তখনও জড়িয়ে রয়েছে। নিজের এক মুহূর্তের ভুলের জন্য আসে অপরিসীম ঘৃণা।

সনৎও বুঝেছে গীতার এ ব্যাপারে এই অভিযোগের মূলে সত্য কিছু না থাকা নেই। তার দুর্বল মন কোনটাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়নি। শুধু আলেয়ার পিছনেই ছুটেছে। আজ সেই কথাটা—ভুলটা, বুঝতে সে পেরেছে।

তার পথ আজ বাঁধা হয়ে গেছে। এ পথ ছেড়ে যাবার উপায় নেই। আজ আপস করেই বাঁচতে হবে তাকে।

বাড়িতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বাইরের ঘরে আলো নেই। সারা বাড়িটা নীরব নিস্তব্ধ। গীতার সঙ্গে ঝগড়া করেই বের হয়েছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। একটা আলো একক জ্বলছে। বারান্দা, রান্নাঘর, আর কোথাও আলো নেই। সব অন্ধকারে—আলো শুধু ওই ঘরটুকুতেই।

ঘরে ঢুকে একটু অবাক হয়। বিছানায় পড়ে আছে গীতা।

কেমন যেন অসহায় মলিন বিবর্ণ পাংশু চেহারা। ওকে দেখে হঠাৎ সনতের মনে একটা বেদনা জাগে। ওকে অবহেলা আর অবজ্ঞা করেই ফেলে রেখেছে দূরে। কোনদিনই কাছে টেনে নেয় নি আপন করে।

অবিচার করেছে গীতার উপর। ওর কাছে এসে দাঁড়াল সনৎ।

একফালি আলো পড়েছে ওর সুগৌর মুখে। চোখ বুজে পড়ে আছে গীতা। আয়ত সুন্দর চোখে নেমেছে ঘন নিবিড় ক্লান্তির ছায়া। মন কেমন করে। একটি মানুষকে যেন বন্দী করে তার উপর নিদারুণ অবহেলা আর ঘৃণার বোঝা চাপিয়ে রেখেছে সনৎ অন্যায় ভাবে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে বসল গীতা।

এ যেন অন্য গীতা। এতকাল নিজের স্বার্থ নিয়ে যে বারবার এগিয়ে এসেছে সনতের পথে বাধা দিতে, এ সেই নারী নয়। ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—শরীর খারাপ? এগিয়ে যায় সনৎ।

তার কণ্ঠেও অনুশোচনার সুর, কথা কইল না গীতা। কম্পিত সলজ্জ দৃষ্টি মেলে একবার চাইবার চেষ্টা করে মাথা নীচু করে। মধুর অনুরাগ আর সফল কামনার ছায়া পড়েছে ওর চোখে—আরক্তিম গণ্ডদেশে।

কি এক মধুর স্বপ্ন দেখে গীতা। তার মনের পরতে বাজে আনন্দসুর—প্রতিষ্ঠার দাবি! আর স্বার্থপরের মত নিজের দাবি জানাতে হবে না। তার আসন স্বীকৃত—দাবি প্রতিষ্ঠিত। তার সংসারে আজ সুর জেগেছে সার্থকতার। মা হতে চলেছে সে!

সব দুঃখ বেদনার মধ্যে গীতা এই মধুর সত্যটিকে অনুভব করে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। চোখ মেলে চাইল সনতের দিকে।

সলজ্জ মধুর চাহনি, ওতে আর ফুটে ওঠে না জ্বালা। শান্ত মধুর সে চাহনি।

সনৎ ওর কথায় চমকে ওঠে। কাছে এগিয়ে এসে ওর হাতখানা তুলে নেয়। ব্যাকুলকণ্ঠে ডাক দেয়—গীতা—!

কথা বললো না গীতা। সমস্ত কামনা একটি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সনতের নিবিড় স্পর্শ ওর সারা দেহে মনে। আকাশ-পাতাল পার্থক্যের ফাঁক বুজে কি একটি মিলনসেতু রচিত হয়েছে দুজনের মনে। সব ভুল নিঃশেষে জীর্ণ পাতার মত মন থেকে ঝরে গেছে।

আজ গীতার কোন অভিযোগ নেই। সনৎও থমকে দাঁড়িয়েছে। আজ বিকেলের সুরটা কোথায় হারিয়ে গেছে। সব কামনা, চাওয়ার ব্যাকুলতা থেমে গেছে তার মনে।

—আগে কেন বলো নি? সনৎ প্রশ্ন করে।

গীতা আজ এগিয়ে দেয় নিজেকে। কণ্ঠে ওর পরিহাসতরল সুর। সনতের দিকে চাইল—ধ্যাৎ! আস্ত বোকা তুমি!

হাসছে গীতা, পরম নিশ্চিন্ত গৌরবময়ী একটি নারী! সনৎ আজ ওর নবজাতক ব্যক্তিত্বের কাছে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কাদম্বিনীর কোন দিকে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। নীতাও সকাল সকাল আপিস থেকে ফিরে মাকে না জানিয়েই বাইরের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সেইখানেই আস্তানা পেতেছে।

শঙ্কর চলে যাবার পর থেকে ও ঘরটা খালি হয়ে গেছে। মণ্টুর পায়ের জন্য নীতাই নিজের ঘরখানা ছেড়ে দেয়।

—ওর কষ্ট হবে, আমি বরং বাইরের ঘরে থাকি।

নিজেই যেন সরে যেতে চায় এই বাড়ির মধ্য থেকে একটু দূরে, বাইরে। কাদম্বিনী একবার প্রশ্ন করে মাত্র—কেন?

—মণ্টু থাকুক এই ঘরে।

এরপর আর ও নিয়ে বিশেষ কথা তোলে নি কাদম্বিনী। কেমন যেন দূরে দূরে সরে থাকতে চায় নীতা এটা মায়েরও দৃষ্টি এড়ায় না।

—কি হয়েছে তোর বল দিকি? কাজকর্মও বিশেষ করিস না!

নীতা চমকে ওঠে, মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে নীতা বিব্রত বোধ করে। পরক্ষণেই সামলে নেয়। আপিসের পরীক্ষা কিনা, পাশ করলে প্রমোশন হবে। তাই একটু নিরিবিলিতে পড়াশুনা করছি। বাড়ির কাজকর্ম তো তুমিই দেখাশোনা করছো মা!

—কি জানি বাছা। কাদম্বিনী বিশেষ কিছু বোঝবার চেষ্টা করে না, করা স্বভাবও নয়, যে যা বলে তাই মেনে নিয়েই খুশি হয়ে থাকতে চায়। জড় চেতনার মানুষ; মনের গভীরে তলিয়ে কোনদিনই কোন কার্যকারণ অনুসন্ধান করা তার স্বভাববিরুদ্ধ।

নীতা বাড়ির ওই ঝামেলায় বড় একটা যায় না। চারিদিকে কলরব উঠেছে। প্রতিবেশীরাও এসেছে, দত্তজা গিন্নী, মধুব মা—আরও অনেকে আসে পূজোর সময়।

নীতার বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা কেমন কনকন করে ওঠে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। বিছানায় পড়ে কোনরকমে সামলাবার চেষ্টা করে সে। বাইরে একটা গাড়ির থামার শব্দে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে আপিসের ছোট সাহেব নিজে গাড়িতে করে মণ্টুকে পৌঁছে দিয়ে গেল। ক্রাচের উপর ভব দিয়ে এগিয়ে আসছে মণ্টু। চেহারাটা ভাল হয়েছে। হাসিমাখা মুখ; ব্লেজারের সেই কোটখানা পরনে; পায়ের দিকটা খালি, মেঝের উপর কাঠের শব্দ ওঠে—ঠক্ ঠক্ ঠক্। নিষ্ঠুর ভাগ্যের কঠিন অভিশাপেব মত কাঠের ক্রাচটা শব্দ তুলেছে—একটানা নিষ্ঠুর শব্দ!

—দিদি!

এগিয়ে এসে এ ঘরে ঢুকলো মণ্টু। নীতা আবছা আলোয় ওর দিকে চেয়ে থাকে।

বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো শুরু হয়েছে। আলো জ্বলছে, সবুজ কলাপাতায় উছলে-পড়া আলো, আকাশ বাতাস ভরে ওঠে উলুধ্বনির শব্দে। ওদের আনন্দ কোলাহল থেকে দূরে পরিত্যক্তের মত দাঁড়িয়ে আছে ভাগ্যহত দুটি ভাইবোন।

একজন যন্ত্রের নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় দলিত, পিষ্ট, অন্যজন জীবনের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে অন্তঃসারহীন। একটা বিকৃত মাংসপিণ্ড ব্যাঙের মতে লাফ দিয়ে চলেছে, সে মণ্টু—সুন্দর একটি ব্যর্থ যৌবন।

একালেব, এ যুগের অভিশাপ ওর সারা দেহ-মনে।

নীতা নিজের মনের দুঃখ হতাশা, জীর্ণ শরীরের বেদনা সব কিছু ভুলে মণ্টুর দিকে চেয়ে থাকে। তার তুলনায় জীবন মণ্টুকে পরিহাস করেছে আরও নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ভাবে।

ওদের উলুধ্বনি, পূজা-মন্ত্রের শব্দ, আনন্দ-উল্লাস, রোশনাই ভেসে আসে। সবকিছুই আজ অর্থহীন বলে বোধহয় নীতার কাছে।

মণ্টুর কল্যাণে আজ পুজো হচ্ছে। এর নাম দেবতার কল্যাণ ভিক্ষা! কথাটা আজ বিশ্বাস করে না নীতা। কি দিয়েছে তাকে জীবন? কি তারা পেয়েছে জীবন দেবতার কাছে? কোন কৃতজ্ঞতা সেখানে তাদের নেই।

বাঁচবার জন্য দৈনন্দিন এই সংগ্রাম মনে হয় নিষ্ঠুর বঞ্চনা আর পরিহাস ভরা, সেই প্রাণপণ সংগ্রাম করে দুমুঠো ভিক্ষান্নের প্রত্যাশায় বসে থাকা—এই যদি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই জীবনকে টিকিয়ে রাখবার জন্য দেবতার কাছে ঘটা করে এই কামনা জানাবাব কোনও সার্থকতা নেই। এর শেষ হওয়াই ভালো।

মণ্টু অবাক হয়—কাঁদছিস বড়দি!

আবছা অন্ধকারে নীতা চমকে ওঠে—কই, না তো! বস। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

—তুই শুয়ে যে! মণ্টু বলে ওঠে।

এ কথার কোন জবাব কাউকে দেয়নি নীতা। দিয়ে লাভ কি! তাই এড়িয়ে যায়। হাসে নীতা—এমনিই।

হঠাৎ মূর্তিমান একটা কলরবের মত ঘরে ঢোকে, আলো হাতে গীতা। ওদের দেখে এগিয়ে আসে। বলে—তোরা এখানে?

ঘরটা আলোয় ভরে ওঠে, গীতার দিকে চেয়ে থাকে নীতা! রূপ যেন তার ধরে না, উপছে-পড়া রূপ। ভাদরের নদীর মত কূলে কূলে সুর তুলে চলেছে। কলাপাতা রঙের শাড়ি খানায় ফুটে ওঠে নিটোল প্রস্ফুট যৌবন। নীতা এই জাগর রূপ দেখে চমকে ওঠে। মায়ের মুখে ও কথাটা শুনেছিল নীতা। গীতা মা হতে চলেছে; নবমাতৃত্বের শ্যাম সজীবতা তার দেহমনে।

চীৎকার করছে গীতা—বা রে, আমি বাড়ি খুঁজে সারা, তোরা দুজনে এই ঘরে। চল্! ওঠ বলছি। অ্যাই দিদি!

হৈ চৈ শুরু করে গীতা। নীতা হাসছে—কি পাগলামি করিস রে?

—পাগলামি! না উঠলে তোর হাত ধরে হিঁচড়ে তুলবো। অ্যাই!

নীতাকে টেনে তুলতে যায়, গায়ে হাত পড়তেই চমকে ওঠে গীতা! সেই আনন্দ-আভা মুছে যায় ওর চোখ থেকে। অবাক হয়ে গেছে গীতা।

—এ কি রে? তোর যে জ্বর! দারুণ জ্বর!

নীতার মুখে সেই হাসির ম্লান আভাটুকু মেলায় নি। বলে ওঠে চাদরটা চাপা দিতে দিতে—কদিন শরীরটা ভাল নেই রে।

গীতার সুরে সমবেদনা ফুটে ওঠে। এ অন্য কোন নারী! আর নীতাও জানে সার্থকতা এসেছে খুশি হয়েছে, পূর্ণ হতে চলেছে গীতা। তাই অনুকম্পা দেখায় রিক্ত নীতাকে।

গীতা অনুযোগ করে--এ কি হাল করেছিস দিদি? শরীরের দিকে নজর দিস নি?

নীতা জবাব দেয়—সময় ছিল কই রে?

—না, তুই বড্ড খাটিস।

নীতা জবাব দেয় না। ওর দিকে চেয়ে থাকে। করুণা করছে আজ গীতাও তাকে। ওদের কাছে তার স্বীকৃতি নেই, শ্রদ্ধা ভালবাসা নেই, করুণা আর দয়া কুড়োবার পর্যায়ে যেন এসে পড়েছে সে। নীতা চাদরখানা চাপা দেয় ভাল করে।

গীতা উঠে পড়ে। ঠাণ্ডা লাগাস না বাপু, দিনকাল ভাল নয়। যাই, ওদিকের সব কাজ বাকি পড়ে আছে। প্রসাদ দিতে হবে রাজ্যের লোককে।

কাদম্বিনী ডাক দেয় বাইরে থেকে—বাছা, ও গীতু! মণ্টু আয়। সধবাদের ডাক্ গীতা—মেয়েকে ডাকতে এসেছে, গীতা বের হয়ে গেল। পিছু পিছু মণ্টুও।

আবার আবছা আঁধার নেমে আসে ঘরে। জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের এক ঝলক আলো শুধু জেগে রয়েছে। হু হু বইছে বাতাস। নীতা চুপ করে শুয়ে থাকে এঘরে।

শুভকাজে ওকে, গীতা কাদম্বিনী কেউ আহ্বান জানাল না। সধবাদের উলুধ্বনি-মাঙ্গলিকে দেবতা বরণ করা হবে। সেই যোগ্যতা নীতার নেই। সে যেন আজ ধীরে ধীরে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে সংসারের নানা কাজে। কর্মব্যস্ত জীবনের দায়িত্বও কমে আসুক। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত

সে। একা এই পৃথিবীতে। কাজের চাপে নানা দায়িত্ব আর দারিদ্রের বোঝায়, জীবনে অন্য কোনদিকে দৃষ্টি দিতে পারে নি নীতা, বন্ধুও কেউ নেই। সমস্ত পৃথিবী যেন তাকে নিষ্ঠুর অঙ্গুলিহেলনে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ওদের মাঝে যেতেও মন চায় না নীতার।

একটা দমকা কাশির বেগে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। জীর্ণ দেহটা কাশির আবেগে কেঁপে ওঠে। কপালে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অসহ্য যন্ত্রণা—বুক-পিঠে কে যেন সূচ দিয়ে বিঁধছে! গলাটা শুকিয়ে আসে।

একলা ঘরে পড়ে অন্ধকারে হাঁপাচ্ছে নীতা। কানে আসে শঙ্খধ্বনি কলরবের শব্দ! জল! একটু জল! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

কোনরকমে বিছানায় শুয়ে শুয়েই হাতড়াতে থাক নীতা। আবছা অন্ধকারে শীর্ণ চোখ দুটো জ্বলছে—অস্বাভাবিক দীপ্তিতে। কঠিন তৃষ্ণায় একবিন্দু পানীয়ের ব্যর্থ সন্ধান করে সে।

মাথা উঁচু করে টিকে আছে শঙ্কর। সংসার থেকে সরে দূরে গিয়ে যেন আত্মরক্ষা করেছে সে। বাংলা কেন—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক হতে চলেছে শঙ্কর। কাগজে কাগজে তার ছবি ছাপা হয়। তার গানের সমালোচনা বোদ্ধাজনের মুখে। নতুন রাগরাগিণীর উপর গবেষণা করে বহু কিছু লুপ্ত সুর উদ্ধার করে তাই পরিবেশন করে বিভিন্ন আসরে, গুণীজন মুগ্ধ চিত্তে তাই শোনেন, স্বীকৃতি দেন ওকে।

বিভিন্ন সম্মেলন থেকে ডাক আসে, প্লেনে পাড়ি জমায় ভারতের প্রধান প্রধান শহরে। আজ সে দুহাতে খ্যাতি প্রতিপত্তি কুড়িয়েছে। পেয়েছে অর্থও। এতদিন পর আলোর মুখ দেখেছে শঙ্কর।

বাড়ি ফিরছে কয়েকদিনের জন্য।

কিন্তু ওই বাড়ির পরিবেশে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। রেললাইন থেকে দেখা যায় বাড়িটা—টিনগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে, অন্যদিকে তাদের নতুন বাড়ি তোলবার আয়োজন চলেছে, ইঁট এসে জমা হচ্ছে। ভিত খোঁড়া হয়ে গেছে।

শঙ্করকে আসতে দেখে অনেকেই যেচে কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করে। নবীন মুদী দোকান থেকে বের হয়ে আসে, অভ্যর্থনা জানায়—আইলা নাকি শঙ্কর বাই! সব খবর ভালো তো? শোনলাম হওয়াই জাহাজে চাপি দিল্লী, বোম্বাই পাড়ি মারতিছ। হঃ, গলা বটে! শোনলাম সেদিন রেডিওতে, যেন মধু ঝরতিছে।

আরও কারা ভিড় করেছে তাকে দেখে। শঙ্কর ওদের এড়িয়ে আসে কোনরকমে। ওই নবীন মুদীর দোকানেই গুপী মিত্তিরের দল তাকে যা-তা ভাবে অপমান করতে ছাড়ে নি। ওই নবীন মুদীও যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে, ব্রেডের জন্য চার আনা বাকি পড়ায় সেও অপমান করতে ছাড়ে নি।

দুনিয়ার রূপ যেন বদলে গেছে। সেদিন মাথা নিচু করে চোরের মত এড়িয়ে বেড়িয়েছে সকলকে। আজ মাথা উঁচু করে চলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে সে। দাম বেড়েছে! নিজেকে চিনতে পেরেছে এত দিনে শঙ্কর।

অনিল ডাক্তার সেই সাবেকী সাইকেলে চড়ে ডাকে যাচ্ছিল। কেরিয়ারে কালো ডাক্তারী ব্যাগটা বাঁধা। মাধববাবু চিকিৎসার ব্যাপারে নগদ টাকা না পাওয়ায় ওই অনিল ডাক্তার ইনজেকশনের সিরিঞ্জে ওষুধ পুরে—আবার না দিয়েই ফিরে এসেছিল।

শঙ্কর সেদিন দাঁড়িয়ে দেখেছিল মাত্র, নীতা হাতের চুড়ি বাঁধা দিয়ে ওর দাম মিটিয়ে দিতে তবে চিকিৎসা করেছিল সে। শঙ্কর সেই দিন থেকে দেখতে পারতো না লোকটাকে! সেই অনিল ডাক্তার ওকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে আসে। আবেগভাবে জড়িয়ে ধরে ওকে। বলে ওঠে—আমাদের গৌরব তুমি! দেখাই দাও শঙ্কর হালার খাঁ সাহেবগার—বাংলাতেও বাঘের বাচ্চা আগে গিয়া!

শঙ্কর ওর দিকে চেয়ে থাকে। অনিল ডাক্তার আপসোস করে—বেশ আছিস শঙ্কর, একখান গান গাইয়া পাঁচশো টাকা লও। আমাগোর? ওষুধ পাইয়াও পয়সা দিবার নাম করে না লোকে। হালার দ্যাশ! .... তোমারে দেইখা খুব খুশি হইচি শঙ্কর, তা কলোনির ক্লাবে একদিন ফ্যাংশান কইরা দাও; ধর গিয়া আলপনা, শ্যামল—তোমাগোর সতীনাথ—ইসে উৎপলা—ধনঞ্জয়—

হাসে শঙ্কর, অনিলের মতলব বুঝে। বলে ওঠে— ও গানতো আমি গাই না দাদা, ক্লাসিক গাই—খেয়াল, ঠুংরী।

—ও! অনিল ডাক্তার হতাশ হয়েছে।

কাগজে ছবি দেখেই খানিকটা অনুমান করেছিল মাত্র। হতাশ হয়ে সাইকেলে উঠে পড়ে চলে গেল ডাক্তার। হাসতে থাকে শঙ্কর।

থুবড়ে-পড়া বাড়িটায় চাঞ্চল্য ফিরে আসে শঙ্করের আসার সঙ্গে সঙ্গেই। কাদম্বিনী ছেলেকে দেখে খুশি হয়। অনেক আশা আজ ওই শঙ্করের উপর তার, বাড়ির হাল বদলাবে —টাকার অভাব নেই আজ শঙ্করের। এ বাড়ির বাতিল মানুষটারও আজ দাম বেড়ে গেছে সব চেয়ে বেশি।

গীতা বাড়িতেই এসেছে, একা সনতের ওখানে ওকে রাখতে চায় নি কাদম্বিনী। প্রথমবার, তাই নিজের কাছেই এনেছে। মণ্টু বাড়ি নেই—একটু একটু হাঁটতে শুরু করেছে। পাড়ায় কোথায় গেছে বেড়াতে। কাদম্বিনীও চায়—বাছা বাইরে বাইরে একটু ঘুরে যদি মনে শান্তি পায় পাক। মাধবমাস্টার তেমনি স্তব্ধ হয়ে রোদপীঠ করে বসে আছেন—সামনে বই-এর প্রুফশীট। কাটছেন আর লিখছেন। বাবাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল শঙ্কর। মাধববাবুর দেহ-মনে এসেছে তৃপ্তির আভা—আবার কাজ করবার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। শঙ্করকে প্রণাম করতে দেখে বলে ওঠেন তিনি—এসো। ভালো আছো?

মাধববাবু আজ ছেলেব দিকে চেয়ে থাকেন মধুর চাহনি মেলে। ওর সাধনায় আজ বিশ্বাস করেন তিনি। শঙ্কর ফাঁকি দেয়নি। দুঃখ অভাবের মধ্যেও নিজেকে গড়ে তুলেছে অক্লান্ত পরিশ্রম আর ধৈর্যে। দুস্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে সে।

মাধববাবু আশীর্বাদ করেন—জয়ী হও। জীবনে সুখী হও!

শঙ্কর আজ মানুষটিকে দেখে একটু খুশি হয়। বৃদ্ধ বলে ওঠেন—এখনও অনেক বাকি, প্রুফটা কালই পাঠাতে হবে, শেষ করে কথা কইব।

—কিসের প্রুফ বাবা! শঙ্কর প্রশ্ন করে।

—নতুন বই ছাপছে আমার। 'রচনা-প্রকাশ'। উচ্চ বাংলা ব্যাকরণও লিখতে বলেছে। ভাবছি হাত দোব এইবার। ক্লাশ নাইন-টেনের বই, খেটে লিখতে হবে। নীতাই যোগাযোগ করেছে।

—তাই নাকি! শঙ্করও খুশি হয়।

কাজের মানুষকে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে দেখে সে খুশি হয়েছে। কাদম্বিনী শঙ্করকে দেখে বের হয়ে আসে।

খুশিতে ফেটে পড়ে কাদম্বিনী। বলে—ওরে গীতু, তোর বড়দা এসেছে। চল বাবা, ভিতরে চল। ইস, ঘেমে নেয়ে উঠেছিস। এই বিকালে, সন্ধ্যার মুখে আসবাব সময় হলো! ওরে, পাখাটা নিয়ে আয় গীতু!

গীতা মায়ের হাঁকডাকে বের হয়ে আসে। বারান্দায় বসেছিল শঙ্কর—গীতার দিয়ে চেয়ে অবাক হয়। ক' মাসেই দেহ-মনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। যৌবনচঞ্চল মেয়েটা পাকা গিন্নী হয়ে উঠছে। সন্তানবতী গীতা আজ সার্থক হয়ে উঠেছে।

বেশ বলে চলেছে গীতা গলগল করে—খুব তো নামডাক, পাঁচশো টাকারগাইয়ে হয়েছো। ভাগ্নে হলে নেকলেস দিতে হবে কিন্তু! মামা হওয়া এমনি নয়।

গীতার স্বভাব এতটুকু বদলায় নি। এতকাল নিজেকে কেন্দ্র করেই, তার স্বার্থকে ঘিরেই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে সে। বাইরে অপরের দিকে চাইবার অবকাশ তার সেদিন ছিল না। আজও ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, পরিধি সামান্য বেড়েছে মাত্র। মূলত সে একই রয়ে গেছে।

এ বাড়ির একপাশে ভিত উঠছে, ইট কাঠ জমা করা। কাদম্বিনী দেখায় শঙ্করকে—একতলা উঠে যাবে, তুই যদি একটু চেষ্টা কবিস বাবা দোতলা উঠতেও দেরি হবে না। পাঁচজনে আসে—বলে, গাইয়ে শঙ্করবাবুর বাড়ি। তোরই তো এমন নামডাক, বাড়িটার ছিরিও বদলাক। মণ্টুর টাকাও পাবো কিছু। বাকি তুই দে!

হাসে শঙ্কর—হবে মা সবই হবে।

দুচোখ দিয়ে কাকে খুঁজছে শঙ্কর।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নীতার এখনও দেখা নেই। এতক্ষণে ফেরা উচিত। এ বাড়িতে সেই সবচেয়ে মূল্যবান। অথচ দেখছে শঙ্কর, তার নাম পর্যন্ত যেন করে না মা! ইচ্ছে করে কথাটা এড়িয়ে যায়। শঙ্করই তোলে কথাটা—নীতাকে দেখছি না!

কাদম্বিনীর সহজ সরল ভাব এক নিমিষেই কেমন বদলে যায়। মুখ হাঁড়ি হয়ে ওঠে তার। জবাব দেয়—কে জানে, কদিন থেকে মেয়ের মেজাজ যেন বিগড়েছে। এদিকে আসে না—ওই বাইরের ঘরেই পড়ে থাকে। বলে, আপিস থেকে ছুটি নিয়ে পরীক্ষার পড়া করছি। গলা নামিয়ে বলে মা—বুঝলি শঙ্কর, মতির গুণেই গতি। হিংসাতেই গেল। গীতার উপরেই যত আক্রোশ। ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না গীতুকে। ও ঘরে গেলে দরজা থেকেই বিদায় করে নীতা। জ্বলেপুড়ে তেমনি দশা হয়েছে!

শঙ্কর কথা বলে না, মায়ের দিকে চেয়ে থাকে। আগেকার অভাবের দিনের সেই নারীমূর্তি এই অতীতের যবনিকা ঠেলে জেগে উঠেছে অতর্কিতে।

কাদম্বিনী মেয়ের উপর ঝাল ঝাড়তে থাকে। শঙ্কর অবাক হয়। চিরকালই নীতাকে কাদম্বিনী যেন অন্য চোখে দেখে। আজও সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়নি।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে। কুমড়োলতার ডগে গাঢ় হলুদ ফুলের হাসি ফুটে ওঠে, নীরব পথটা ধরে এগিয়ে চলেছে চালটার দিকে শঙ্কর। ঘাসে ঘাসে ছেয়ে গেছে পথটা—যাতায়াত বিশেষ নেই। পরিত্যক্ত ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে নীতা—সংসারের বাইরে।

কাশির শব্দ শোনা যায়। নীতা বাইরে দাদার গলার স্বর শুনেছিল। ভেবেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু এলো না। জ্বরটা চেপে এসেছে—চুপ করে নীতা পড়ে আছে একা শূন্য ঘরে। কাশির ধমকে জীর্ণ পাঁজরাগুলো সাঁই সাঁই করে নড়ছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকছে শঙ্কর। একফালি আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘদেহ মূর্তিটা। হ্যারিকেনটা উসকে দিতেই উঠে বসে নীতা। বালিশের তলায় কি একটা বস্তু শশব্যস্তে লুকোতে থাকে ওকে দেখে।

—দাদা!

নীতা ওকে এখানে দেখবে ঠিক ভাবতে পারে নি। একটু বিস্মিত হয়েছে।

হাসছে শঙ্কর, দুষ্টুমির হাসি। পিঠোপিঠি ভাই-বোন—সহজ ভাবেই মিশে এসেছে। নীতাকে কি বলে ওঠে কৌতুকভরে। একটা কি লুকোতে দেখে এগিয়ে আসে শঙ্কর। বলে—ওটা কি রে নীতা? দেখি, দেখি?

খপ করে ধরবার চেষ্টা করে ওর হাতটা। বালিশের নীচের থেকে জিনিসটাকে বের করবার চেষ্টা করে শঙ্কর। নীতা বাধা দেয় আর্তকণ্ঠে।

—না না, দোহাই তোমার বড়দা! অ্যাই বড়দা—

কৌতূহল বেড়ে যায় শঙ্করের, আগেকার মত চাঞ্চল্য ছেলেমানুষি ফিরে আসে। বলে ওঠে শঙ্কর—লক্ষণ যা দেখছি মোটেই সুবিধার নয়।

চমকে ওঠে নীতা, মুখ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে—না—না। অ্যাই!

—কি রে, বুড়ো বয়সে প্রেমপত্র ট্রেমপত্র নয় তো? দেখি, দেখি!

—দাদা! আর্তনাদ করে ওঠে নীতা।

মুখের তোয়ালেটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেছে, বালিশের নীচে গোঁজা প্রান্তটুকু সমেত। শঙ্কর চমকে ওঠে, যেন আর্তনাদ করে বেদনায়।

—এ কি করেছিস নীতা! রক্ত! রক্ত উঠছে তোর কাশির সঙ্গে। গায়ে জ্বর!

ব্যাকুলকণ্ঠে বলে নীতা—চুপ কর তুমি! ওরা জানে না, দূরেই সরে এসেছি।

শঙ্করের মুখ থেকে হাসির আভা নিঃশেষ হয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে নীতার দিয়ে চেয়ে আছে। হাসছে নীতা—মলিন কান্নাভেজা হাসি। বাতাসে ঝরা বকুলের কান্না—পাখি ডেকে থেমে গেল।

নীতা হাসছে, বলে চলেছে—এবার বোধ হয় সব কাজ থেকে ছুটি পাবো রে বড়দা! আমার কাজও ফুরিয়েছে—সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনও।

অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কর। সব দিক থেকে নীতা আজ নিঃস্ব। তার যা কিছু ছিল সবই দিয়েছে সংসারকে। কটি হতভাগা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে নিজের জীবনীশক্তিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করেছে। আজ দিন ফিরেছে, এ বাড়ির মরা গাছে আবার এসেছে পত্রশোভা—ফুলের ইসারা।

কিন্তু নীতার যাবার ডাক পড়েছে অন্য একে জগতে।

সব দিক থেকে নিঃস্ব হয়েও নীতা আজ বিজয়ী হয়েছে। মুখে কোথাও ওর বেদনা নেই, যেন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে সে অসীম আকাশের দিগন্তে।

শঙ্কর বলে ওঠে—খুব খুশি হয়েছিস তুই? না?

হাসছে নীতা, শঙ্করের কাছে তার গোপন কিছুই নেই। জবাব দেয় নীতা—কেন হব না! তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুর বের হয়ে লোকের মনে হাসির কান্নার ঢেউ আনে—তাতে

তুমি কি খুশি হও না? আমার চেষ্টা সফল হয়েছে! ওরা বাঁচবার আশা পেয়েছে - নাই বা আর রইলাম সেখানে আমি।

ওর কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারে না শঙ্কর। নীতার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—সস্তা ভাবপ্রবণতায় বেশ মন ভরানো যায়। তুই একটা ইডিয়ট! কোন দিন জানিস না কি তুই চাস, বেদনা দুঃখ তোর কোনখানে! কোথাও নিজের দাবি জানাতে পারিস নি। তাই একজনকে না পেয়েই—ঘরের ঠিকানা হারিয়ে তুই এই পথে আনন্দের সন্ধান করে নিজেকে জ্বালিয়ে খাঁক করেছিস। আর সান্ত্বনা দিয়েছিস ওই বলে মনকে। কাওআর্ড তুই! ভীরু!

—দাদা! নীতা চমকে উঠেছে শঙ্করের নিষ্ঠুর এই আক্রমণে।

আজ সব মুখোশ তার খুলে পড়েছে—অসহায় দুর্বল সে। এত দিন ধরে একটা প্রতিবাদের শক্ত বোঝাই বয়ে কাটিয়েছে নীতা। এক ধাক্কাতেই খুলে পড়েছে সব আবরণ। সহজ স্বাভাবিক বঞ্চিত নারীর রূপটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। নিজের এই রূপ দেখে চমকে উঠেছে নীতা।

শঙ্কর বলে চলেছে—তোকে বাঁচতে হবে নীতা। আমি অন্তত সেই চেষ্টা করবো। আজ সে ভরসা আমার আছে।

নীতার কাছে এগিয়ে আসে শঙ্কর। মাথায় হাত বোলাতে থাকে। নীতার দু'চোখে অশ্রু। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলে ওঠে নীতা—ভিক্ষে দেবে দয়া করে?

হাসে শঙ্কর—তোর ভিক্ষাও তো আমি নিয়েছি তাহলে?

—ছিঃ বড়দা! ও কথা শোনাও যে আমার পাপ!

—তবে আমার উপর ছেড়ে দে সব কিছু। এতদিন শুধু নিয়েছি দুহাতে,আজ দেবার জন্য আমারও মন চায় রে!

রাত্রি নেমেছে। তারায় ভরা রাত্রি। নিবিড় তমসার মাঝে জীবনের অস্তিত্বের বিজয়কাহিনী ফুটে উঠেছে মহাকালের বুকে; একটা স্তব্ধ প্রশান্তির মাঝে নীতা আজ নিজেকে সঁপে দেয়। শঙ্কর ওর চুলে বিলি কাটছে। বলে চলেছে—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে নীতা। স্যানাটোরিয়ামের সুপার আমার বিশেষ পরিচিত। একটা ব্যবস্থা হবেই।

--পাহাড়ের উপরে?

---হ্যাঁ! দেখবি কি সুন্দর জায়গা! কালই আমি চলে যাবো প্লেনে। ওখানে হোক অন্যত্র হোক, একটা ব্যবস্থা করে আসবোই। ততদিন ডাক্তারে যা বলবে তাই চুপ করে শুনে যাবি, কেমন?

নীতা মাথা নাড়ে— আচ্ছা!

পরক্ষণেই প্রশ্ন করে নীতা—হ্যাঁরে বড়দা, ছেলেবেলার সেই যাদব বাউলকে মনে পড়ে? ইয়া আলখাল্লা—গান গাইতো, পথে পথে ঘুরতো! আমারও মনে হয় তেমনি করে ঘুরি--- কেবল ঘুরি। ঘর ছেড়ে পথে পথে---

—ধ্যাৎ পাগলি! শঙ্কর ধমকে ওঠে।

শঙ্করকে ওঘর থেকে বের হয়ে আসতে দেখে মা একটু অবাক হয়। শঙ্করের মুখ চোখ কেমন থমথমে।

রাত্রি নেমেছে। পুজো পাঠ চুকে গেছে। শঙ্কর কথাটা জানায়। নীতার অসুখের কথা। সারা বাড়িতে আঁধার নেমেছে।

কাদম্বিনী শঙ্করের মুখে কথাটা শুনে চমকে ওঠে, গীতার মুখও এতটুকু হয়ে যায়।

—কি হবে বাবা! দুঃসাধ্য রোগ! শেষ কালে কিনা নীতাকেই ধরলো?

শঙ্কর সাহস দেয়—আজকাল সেরে যায়; ব্যবস্থা করবো আমি কোন স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবার। সে কদিন একটু সেবাযত্ন করো। অন্ততঃ বকাঝকা কেরো না। ওকে শান্তিতে থাকতে দাও। ওর টাকা সংসারে আমিই দেবো।

মাধববাবু কথাটা শোনেন স্তব্ধ হয়ে। সামনে প্রুফ-শীটগুলো তুলে দেখবার উৎসাহ নেই। সারা বাড়িতে একটা স্তব্ধতা নামে,—রাতের আঁধার জড়ানো স্তব্ধতা। আকাশের তারাগুলো কাঁপছে।

শঙ্কর বের হয়ে আসছে,—এতদিন পরে দায়িত্ব নিয়েছে সে। কঠিন দায়িত্ব—কর্তব্য করতেআজ সেও এগিয়ে আসে। হঠাৎ রান্না ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়।

মা কাঁদছে। কুপির ম্লান আলোয় দেখে মায়ের চোখে জল। শঙ্করকে দেখে সামলাবার চেষ্টা করে সে। শঙ্কর এগিয়ে যায়, শত অভাব অভিযোগের মাঝে বাঁচবার জন্য সংগ্রামক্লিষ্ট যে নারীকে এত দিন দেখেছিল এ সে নয়। স্নেহ প্রীতি আর ভালবাসায় গড়া একটি মাতৃমূর্তি—যে সন্তানের বেদনায় কাঁদে বুকফাটা কান্নায়।

কাদম্বিনী মুখে তুলে চাইল। শঙ্কর মাকে বেশ কড়া কথাই বলেছিল একটু আগে। কাদম্বিনী বলে ওঠে—সত্যিই ওকে সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছি শঙ্কর।

শঙ্কর চুপ করে থাকে। তার গুণমুগ্ধ অনেক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোক আছে—আজ দরকার হয় নীতার জন্য তাদের প্রত্যেককেই আবেদন জানাবে, সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে ওকে বাঁচিয়ে তোলাব।

ছুটি! কাজ ফুরানো—প্রয়োজন ফুরানোর ডাক। সকাল বেলাতেই মাকে চা খাবার নিয়ে ঢুকতে দেখে অবাক হয় নীতা। হঠাৎ যেন পৃথিবীর রঙ বদলে গেছে। আকাশে বাতাসে প্রথম দিনের সোনারোদ ফুটেছে। পাখি ডাকা আকাশ। সবুজ পৃথিবী তাকে প্রগাঢ় শান্তির সন্ধান দেয়।

বাইরের দিকে চেয়েছিল নীতা, মেহেদি বেড়ার গায়ে এসেছে হালকা বেগুনী রঙ-এর ফুল—একটা ভ্রমর অকারণেই গুন গুনিয়ে ফেরে ওর চারিপাশে।

কাদম্বিনী ওর কাছে এগিয়ে যায়। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে।

—খেয়ে নে বাছা। আজ শরীরটা কেমন? ডিম দুটো খেতেই হবে তোকে শঙ্কর বলে গেছে, আর ওই আপেলটা।

—মা!

কাদম্বিনী ওর দিকে চেয়ে থাকে ডাগর আয়ত দু'চোখ মেলে। ছলছল জলভরা সেই দৃষ্টি। কাঁদছে যেন মা!

আজ আবার বাঁচতে ইচ্ছা করে এদের মাঝে নতুন করে। গীতাকে বলে ওঠে—চুলগুলো বেঁধে দে দিকি! ও কি লা?

গীতা বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে, কলেজ যাবার সময় যেভাবে সাজতো নীতা তেমনি করে। আয়নায় সেই হারানো অতীতের ছবি ভেসে ওঠে।

সুন্দর জগৎ। মধুময় পরিবেশ।

নীতা সহজভাবে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে—তোমার প্রুফ ঠিক আসছে বাবা? নতুন বইটা কত দূর করলে?

মাধববাবুর সঙ্গে সহজ ভাবেই কথা বলে, যেন কিছুই হয় নি। মাধববাবু ওর দিকে চেয়ে থাকেন অবাক হয়ে, ও যেন এ বাড়ির আর কেউ নেই। সেই ভাবক্লিষ্ট মেয়েটি আর নয়, হালকা খুশিভরা ভরা একটি মেয়ে—জীবনে সব বিপদ দুঃখকে সে সহজ করে নিয়েছে—জয় করেছে দুঃখকে। জীবনের একটা দর্শন একটা অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে।

ওর কথায় জবাব দেন মাধববাবু—এই ধরেছি মা। এই বইটাও ছাপা শেষ হয়ে এল! সেদিন গিয়েছিলাম প্রকাশকের দোকানে! তোর কথাও শুধেছিলেন।

নীতা চুপ করে থাকে, সবার সব কাজই বুঝিয়ে দিয়ে ছুটির আশায় বসে আছে সে।

—বড়দি!

গীতা গরম দুধ নিয়ে এসেছে। নীতা বই পড়ছিল। ওর ডাকে চমকে ওঠে।

—দুধটা খেয়ে নে।

গীতাও আজ ওর সঙ্গে সহজ ভাবেই কথা বলে।

সবাই যেন তার জন্য আজ ব্যস্ত। তাকে ছোট্ট ছেলের মত মানুষ করে তুলতে চায় প্রীতি দিয়ে, স্নেহ দিয়ে। বল ওঠে নীতা—তোদের জন্য কি শান্তি পাবো না গীতা? চিরকালটা জ্বালাবি মুখপুড়ি! ওরে এ যে কালরোগ—তাই কেন সব তাতেই আগবাড়িয়ে আসিস?

গীতা কথা বলে না, নীতা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

তার জীবনের শূন্যতা একজনের পূর্ণতার স্বাদে ভরে ওঠে, তাই নিয়েই তৃপ্ত হতে চায় সে। আজ সত্যই সে মুক্ত—তৃপ্ত।

বাতাস জাগে—শন-শন শব্দ ভরা সেই বাতাস। কোন সুদূরে যেন মন চলে যায়। উদাস শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে মুক্ত আকাশের পানে। পাখির গান ভেসে আসে—কণ্ঠে সুর নিয়ে অসীম নীলিমায় পাখিটা উধাও হয়ে গেল—মিলিয়ে গেল। ফেরারী হয়ে গেল।

সনৎ আপোষ করেছে জীবনের সঙ্গে। বার বার চেষ্টা করেছে ছকবাঁধা জীবন থেকে ছিটকে বের হয়ে যেতে অন্য পথে। কিন্তু বার বারই প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে নিজের সেই মাপবন্দী জগতে। যেন খাঁচায় বদ্ধ বাজপাখি—পিঙ্গল চোখ মেলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে—মুক্তির ব্যর্থ আশায় ডানা ঝাপটায় খাঁচায়। ঠোঁট ডানা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে আঘাতে মুক্তির নিষ্ফল প্রচেষ্টায়। তবু মুক্তি পায় না।

শেষ অবধি আপোষই করেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে। মধ্যবিত্তের চিরন্তন স্বাভাবিক জীবনকে মেনে নিয়েছে সে। সামনে তার নতুন দায়িত্ব। নতুন অতিথির আগমনবার্তা তাকেও বদলে দিয়েছে।

আবার কাজেই যোগ দিয়েছে। ফিরে গেছে আপিসের সেই পরিবেশে, সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে সব কিছু।

আজ রক্তে আর প্রতিবাদের আগুন জ্বলে না। সেকশনে ঢুকতে কানে আসে প্রবোধবাবুর টিপ্পনী। দেওয়ালেরও কান আছে। ইতিমধ্যে কি জানি কেমন করে কথাটা রটে গেছে যে সনৎ এ চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি খুঁজছে—না হয় প্রফেসারি করবে।

অনেকে আবার রটিয়ে দিয়েছে চাকরি নাকি সে পেয়েও গেছে। তাই সেদিন আপিসে ফিরে গিয়ে ওকে সহজ ভাবে কাজ করতে দেখে অনেকেই মুখ তুলে চায়।

নিজেদের মধ্যে দু-একটা ফুসফাস কথাও হয়।

সনৎ কোন দিকে কান দেয় না।

বড়বাবু মাথা নাড়ে—এরই জন্য ছেলেরা আজকাল এত বেশি ফেল করে হে! এইতো দু-লাইন করেক্ট করে ড্রাফট লিখতে পারে না, সে কিনা করবে প্রফেসারি! যত্তো সব!

ইতিমধ্যে কালনেমীর লঙ্কাভাগ পর্বও শুরু হয়ে গেছে। একটা পোষ্ট খালি হবে, তার জন্য বড়বাবু সাহেবের কাছে দরবার শুরু করেছে। প্রবোধবাবুর ভাইপোর জন্য প্রবোধবাবুও চেষ্টা করেছে। এ হেন সময়ে সনৎ আবার ফিরে এল চাকরিতে। দুজনেই মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়।

কানে আসে প্রবোধবাবুর মন্তব্য—ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক না কেন, হে হে বাবাঃ, গর্তেই পড়বে শেষমেষ।

বড়বাবু বিরক্তিভরে বলে— তাইতো দেখছি হে!

প্রবোধবাবু গজরায়—অনার্স গ্রাজুয়েট হয়ে টিকে রইলাম, আর উনি কি না সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ হয়ে যাবেন অন্য লাইনে! হাতি ঘোড়া গেল তল ভেড়া বলে কত জল।

সনতের কানে আসে কথাগুলো, কিন্তু আজ সে প্রতিবাদ করে না। অনাগত ভবিষ্যৎ আর গীতার কথা মনে পড়ে। ছোট্ট ঘরে আসছে নতুন অতিথি, তাকে বরণ করে নেবে।

নীতার কথা মনে পড়ে—দুঃখের মাঝেই দুঃখকে সয়ে তাকে সহজ করে নেবার সাধনাই সবচেয়ে বড় সাধনা।

নীতা সব হারিয়েও বাঁচবার স্বপ্ন দেখে। সনৎ এতদিনে সেই কথাটার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করেছে। জীবনকে সহজ করে নেবার চেষ্টাই করেছে সে। এ হয়তো তার পরাজয়—মাথা নীচু করে হার মানা, তাই কোথায় এটা সত্য বলে মানতে পারে না—সংগ্রামই করেছে সে, প্রতি পদে পদে বাঁচবার জন্য এই সংগ্রাম—এবং জয় করবে সে।

শঙ্কর কিছুদিনের মধ্যেই ছুটোছুটি শুরু করে একটা ব্যবস্থা করে এনেছে। এতদিন নিজের ক্ষমতার উপর তার নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। আজ সেই লুপ্ত শক্তিসামর্থ্য জেগে উঠেছে। আজ সে অনুভব করেছে নিঃশেষ সাধনায় যে সমাজের মানুষকে সুখী করতে পারে—সমাজের মানুষও তাকে ভোলে না। তার জন্য তারাও দুঃখ বোধ করে, সাহায্য করে সর্বতোভাবে।

একজনের প্রতি নিঃশেষ প্রীতি আর ভালবাসা তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। অর্থ! আজ তার টাকার অভাব নেই। প্রতিপত্তি' তাও পেয়েছে সে। কয়েকজন পদস্থ ডাক্তার তার গুণমুগ্ধ। তাদের সাহায্যে তিনদিনের মধ্যে সে সিট যোগাড় করে ফেলে।

শঙ্কর বলে ওঠে—গান শোনাব ডাক্তার সেন, কিন্তু আমার বোনের টি. বি. তার একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। তাকে দেখেননি ডাক্তারবাবু, দেখলে বুঝতেন যাদের কখনও ভোলা যায় না—নীতা তাদেরই দলের।

ডাক্তার সেন শঙ্করের দিকে চেয়ে থাকেন। সদাহাস্যময় ছেলেটির উজ্জ্বল চোখমুখে একটা চিন্তার কালোছায়া। কারণে-অকারণে যে হাসি আর গানের সুরে ভরিয়ে রাখে চারিদিকে—প্রাণের উচ্ছল আনন্দ যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে পাহাড়ী ঝরনার মত—সেই শঙ্কর সম্পূর্ণ বদলে গেছে তার বোনের ভাবনায়।

ডাক্তার সেন প্রশ্ন করেন—বাইরে কোথাও যাবে?

—বাইরে?

—কোন স্যানাটোরিয়ামে?

শঙ্কর তাই খুঁজছে। বাড়িতে নীতার ঠিক চিকিৎসা হবে না। ওই পরিবেশ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় সে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে—গেলে সারবে তো?

—নিশ্চয়ই, আজকাল প্রথম স্টেজে ধরা পড়লে এটা সারানো কষ্টকর কিছুই নয়।

—তাহলে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করুন যত তাড়াতাড়ি হয়। শঙ্কর অধৈর্য হয়ে পড়েছে। এলোমেলো বকে চলেছে সে।

—ওকে সারানো দরকার ডাঃ সেন। এ যে আমারই কর্তব্য।

ডাঃ সেনও কি ভাবছেন ওর দিকে চেয়ে, বলে ওঠেন—লেট আস ট্রাই। আশা করি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে ইমিডিয়েটলি।

ডাঃ সেন ট্রাঙ্ক টেলিফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেন। শঙ্কর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে দূরের সেই খবরের।

একক নির্বাসিত জীবন। একফালি রোদ জানালা দিয়ে এসে লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। গাছে পাতায় সবুজ আভা। পাখি ডাকা কলোনীর খোয়া ঢাকা পথ দিয়ে বিকাল বেলায়, দলে দলে ছেলেমেয়েরা ফিরছে স্কুল থেকে, তাদের কলরবের শব্দ কানে আসে। বৈচিত্র্যময় জগৎ—পাখি ডাকে, ফুল ফোটে—ওরা বেঁচে আছে। দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা সবকিছুর মাঝে বেঁচে থাকে ওরা।

আজ নীতার মনেও বাঁচবার দুর্বার আগ্রহ। একটি সংসার—তেমনি কাকলিভরা কার আধো আধো কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় লতায় লতায় ফুটেছে গাঢ় হলুদ ঝিঙেফুল—সন্ধ্যামালতীর লাল আভা প্রতিবিম্ব তোলে শেষ রশ্মির গাঢ় লালিমায়।

কার পথ চেয়ে বসে থাকা! একটি শান্ত গৃহের স্বপ্নসাধ। নীতা মাঝে মাঝে কেমন স্বপ্ন দেখে।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

সনৎ এসেছে বেশ কিছুদিন পরে। সেই বিকালের ঘটনাটা মনে পড়ে। সেই বিচিত্র ডাক শোনা আনমনা লোকটি কোথায় হারিয়ে গেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে বিস্মিত বেদনাভরা নির্বাক দৃষ্টিতে।

নীতার চেহারায় এসেছে ম্লান একটা আভা, চুলগুলো উশকো-খুশকো, চোখের ঔজ্জ্বল্যই বেড়েছে মাত্র। ওকে দেখে সহজ স্বাভাবিক সুরে অভ্যর্থনা জানায় নীতা—এসো! দাঁড়িয়ে রইলে যে?

সনৎ অপরাধীর মত ঘর ঢুকলো। পাশেই টিনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে প্রশ্ন করে—কেমন আছো?

নীতা হাসিমুখে জবাব দেয়—ভালই।

চেয়ে থাকে ওর দিকে নীতা। যে সনৎ একদিন নিঃশেষে তাকে কাছে পেতে চেয়েছিল এ সেই মানুষটি কিনা তাই ভাবে। তার জীবনের সব আশার মুকুল যাকে কেন্দ্র করে ফুটেছিল আজ সে কাছে এসেছে, কিন্তু নিঃশেষে হারিয়ে গেছে সেই সৌরভ। আজ আর সনৎকে এড়াবার চেষ্টা করতে হবে না, তার জীর্ণ পোকাধরা এই অকেজো দেহ আর পঙ্গু মনের কোন দামই নেই কারও কাছে।

সনৎ বলে ওঠে—সেদিনের ওই সব কথার জন্য লজ্জার শেষ নেই।

নীতা চমকে ওঠে।

বহু দূরে পাখি ডাকছে, বাতাসে ঝরা ফুলের গন্ধ। এক ফালি মেঘ পড়ন্ত সূর্যের শেষ

আভায় রঙের তুফান তুলে কোন অসীমে উধাও হয়ে গেল। দূর থেকে কে ডেকে ফিরে গেল।

মুখ তুলে চাইল নীতা ওর দিকে। দুচোখে তার কামনাব্যাকুল দৃষ্টি, নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ আভা আঁধারতল উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। আজ জীবনের কোন সত্যকেই লুকিয়ে রাখতে চায় না সে।

—কেন?

সনৎ জবাব দিতে পারে না। একবার মুখ তুলে ওর আয়ত দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকে।

নীতা বলে ওঠে—লজ্জার কিছু নেই সনৎ, লজ্জা নয়, দুঃখ আর ব্যর্থতা রয়ে গেল আমারই।

ক্ষণিকের জন্যও আজ মনের সব গোপনতা প্রকাশ করেছে নীতা। যাবার বেলা পিছন ফিরে তার জীবনের সবুজ দিনগুলোকে শেষবারের মত দেখতে চায়, এতটুকু চাওয়া যদি অপরাধ হয়, হোক। নীতা চুপ করে চেয়ে রয়েছে।

সনতের মনে আসে দূরাগত একটা শব্দ—সুর।

—নীতা।

নীতা আজ কোন কিছুই লুকোতে চায়না। বলে ওঠে ভারি গলায়—আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম সনৎ! মেয়েরা সকলেই যা চায় আমিও তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু—

কণ্ঠস্বর যেন ভারী হয়ে আসে। নীতার সব দুঃখ ব্যর্থতা নীরব চোখের পাতায় কান্না হয়ে ভাসে। পাখির ডাক থেমে গেছে, নেমেছে রাত্রির অন্তহীন তমসা। নিকোনো আকাশে ফুটে ওঠে দু-একটা তারাফুল। কথা কইল নীতাই। ওসব চিন্তা আজ আঁধারে হারিয়ে গেছে। নীতা বলে চলেছে।

—আগামী সোমবারই চলে যাচ্ছি শিলং! সেইখানে স্যানেটোরিয়ামে সীট পেয়েছি।

—শিলং পাহাড়ে!

হাসে নীতা—হ্যাঁ!

খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে যেন অন্য কোন নীতা। কথার সুরে সব গ্লানি মুছে গেছে। চোখের সামনে ওর নতুন দেশের স্বপ্ন। পাহাড়—সবুজ পাহাড়ের বুক চিরে রাস্তাটা গেছে, ছোট ছোট মেঘ জমে কালো সবুজ পাহাড়ের কোলে ঝরনার ঝর ঝর শব্দ আর পাইন বনের ঝড়ের সুরে মিশে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে! তারই স্বপ্ন দেখছে নীতা।

—চমৎকার জায়গা শিলং!

হঠাৎ থেমে যায় সে। সনতের দিকে চাইল। সনতের চোখের সামনে অতীতে কর্মব্যস্ত একটি মেয়ের ছবি ভেসে ওঠে, শত কাজের ফাঁকে যে বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছিল। সে আর সনৎ যাবে সেই দেশে কাজ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে! কথাটা মনে পড়ে নীতার।

—তুমি আর আমি কত স্বপ্ন দেখেছিলাম সনৎ, আজ একা চলেছি সেখানে। হয়তো আর কোনদিনই—

চুপ করলো নীতা। জমাট হতাশা আর ব্যর্থতা তার সব সুর যেন রুদ্ধ করে তুলেছে। নীতা এই দুর্বলতা চেপেই রাখতে চায় সকলের কাছে। হঠাৎ ওর দিকে ফিরে বলে ওঠে—রাত্রি হয়ে গেছে তোমাকে আবার ফিরতে হবে। তুমি যাও।

মনের সব চিন্তাধারাকে কঠিন নিষ্পেষণে স্তব্ধ করে দিল নীতা। সনৎ দাঁড়ায়, কি ভেবে বলে—যাবার আগে একদিন আসবো?

যেন অনুরোধ জানাচ্ছে সে। বাইরের দিকে চেয়ে আছে। তারায় তারায় দীপ্ত শিখার

অগ্নিজ্বালা। হু হু শব্দে বইছে বাতাস। আনমনে জবাব দেয় নীতা—আর না আসাই ভালো সনৎ!

মনের মধ্যে যেন একটা ঝড়ের সুর; এলোমেলো কেমন চিন্তা ভাবনাগুলো ভিড় করে আসে! তাদের দাবিয়ে দিয়ে জোরের সঙ্গে বলে নীতা—তুমি আর এসো না সনৎ! এসো না!

চুপ করে বের হয়ে এলো সনৎ। নীতা এড়িয়ে চলতে চায় জীবনের না পাওয়ার ওই করুণ স্মৃতিটুকুকে।

সনৎ আবার মন দিয়েই সেই চাকরি করছে। অধ্যাপকগিরির চাকরিতে, পড়াশোনায় আর প্রবৃত্তি নেই, সব কেমন শান্ত স্থির হয়ে গেছে। প্রাণের স্রোত নেই—দমবন্ধ জলার মত, ক্লান্তি আর প্রাণহীন নিস্তব্ধতার থিকথিকে শেওলা জমেছে খাদ-খন্দে জীবনের প্রবাহে।

একা বসে আছে নীতা। অনুভব করে দুচোখ দিয়ে তার চোখের জল নেমেছে, বুকভরা ব্যর্থতার কান্না চেপে অতীতের ব্যর্থ বসন্তকে বিদায় জানায় সে—শেষ বিদায়।

মন কেমন করে—এতদিন যাকে জেনেশুনেও মনের গোপন থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি নিঃশেষে, আজ অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবেই সে সরে গেল।

ফুল ফোটে—ঝরে। বৃন্তে রেখে যায় ফলের সঙ্কেত। কিন্তু তার জীবন বৃন্তে কীটদষ্ট ফুলের ব্যর্থ পরিণতি। নিঃশেষিত সৌরভ, লুপ্ত হয়ে গেছে তার সব বর্ণ আর গৌরব, এখন শুধু পথপানে চেয়ে থাকা, আর ঝরে যাবার জন্যই এই নীরব প্রতীক্ষা করা।

কান্না আসে! আসুক—চোখ ছেয়ে নামুক ব্যর্থকান্না, বন্ধুর ঊষর মৃত্তিকার বুক তবু ভুলেও শ্যামল হবে না কোনদিন।

পরেশ ফেরিওয়ালা থেকে নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে কিছু মূলধন যোগাড় করে ট্যাক্সি কিনেছিল ইনস্টলমেণ্টে, এখন একটা থেকে দুটো ট্যাক্সির মালিক হয়েছে। কঠিন পরিশ্রমী ছোকরা, গুপী মিস্তিরের মত মিনমিনে হয়ে যায় নি কেরানীগিরি শুরু করে, এখনও সে সজীব সতেজ। মনের কোণে একটা স্মৃতি বার বার সবুজ হয়ে জাগে—সেই স্মৃতি, একটা মুখ—একটু হাসির আভা যেন পথ দেখায়। তাই হয়তো ট্যাক্সি ড্রাইভারের মত জীবনে থেকেও সে সব কিছু নোঙরামির ঊর্ধ্বে রয়েছে আজও।

স্ট্যাণ্ডে আরো দিলদোস্তী ড্রাইভাররা মাঝে মাঝে রসিকতা করে—আজ তো বহুত কামাই করছো দাদা, হোক না—

কে এগিয়ে এসে বোতলটা বাড়িয়ে দেয়।

—এক আধটু চললে আউর? কি একটা ইসারা করে দেখায়, কদর্য ভঙ্গীতে পরেশকে।

ওপাশে ওরা হাসছে। এই পরিবেশে পরেশের তবু পা পিছলায় নি। পরেশ জবাব দেয় ও সব চলে না ভাই।

হতাশ হয় বন্ধুর দল, বলে—বুদ্ধু তুমি। স্রেফ বুদ্ধু সাদা চোখে যে ট্যাক্সি খেপ মারে সে শালা হয় দেবতা নয়তো পাক্কা শয়তান।

ওদের কথায় হাসে পরেশ। কেন জানে না। বার বার একজনের কথা মনে পড়ে। একটি বিয়ের রাত্রি, আলোঝলমল পরিবেশ, শাঁখের শব্দ উলুধ্বনির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সে, সামনে তার নীতা। এত কাছে সে কাউকে দেখে নি।

বলেছিল নীতা—মানুষ হবার চেষ্টা করো পরেশ। ঘর হারিয়ে সব কিছু হারিয়েছি আমরা। ওইটুকু পরিচয় তবু কেন থাকবে না।

—ট্যাক্সি?

কোন বাবু ডাকছে। নিমেষে নিপুণ হাতের এক মোচড়ে গাড়িখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওদিকে ছুটলো পরেশ। মাপমত পায়ের চাপে একটু শব্দ করে গাড়িখানাকে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে দেয়। পিছনে ফিরে যাত্রীর দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়। বলে—শঙ্করদা!

শঙ্কর গাড়ির জন্য দাঁড়িয়েছিল! ওর গাড়িতেই উঠে পড়ে।

—বাড়ি ঘুরে একবার হাওড়া স্টেশনে আসতে হবে।

একটি চলতি গাড়িকে ওভারটেক করে রাস্তার দিকে নজর রেখে বলে ওঠে পরেশ—কি দাদা, আবার দিল্লী বোম্বে যাচ্ছো? খুব আচ্ছা গাইছো শুনলাম।

শঙ্কর কি ভাবছে। স্যানাটোরিয়ামে সীট বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। এবার নীতাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলে হয়তো চিকিৎসার একটা সুরাহা হবে, বেঁচে উঠবে নীতা। পরেশের কথাটা কানে আসতে আনমনে জবাব দেয়—দেখি কতদূর যেতে পারি!

কাদম্বিনীর চোখ ছলছল, মাধববাবু দাঁড়িয়ে আছেন চুপ করে। মণ্টুও। গীতার দিকে চেয়ে থাকে নীতা।

ওরা সবাই রইল; মনে ওদের আশার আলো। বাড়ির দোতলা উঠছে, গীতার হাতে আগামী অতিথির জন্য একটা ছোট জামার ডিজাইন। মাধববাবু ধরা গলায় বলেন—বইটা সামনের মাসে বের হবে নীতা!

নীতা যাবার অয়োজন করছে। আজ বাড়ির সবাইকে কেমন ভালো লাগে। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে চোখে জল আসে। বাবার কথায় সহজভাবে বলবার চেষ্টা করে—এক কপি পাঠিয়ে দিও কিন্তু! কিরে গীতা, খোকা হলে মিষ্টিটা ডাকেই পাঠাবি? ফাঁকি দিবি না কিন্তু! ছোটবাবু তোমার জন্য আনবো একটা সোয়েটার। কি রে, এতবড় ছেলে চোখের জল ফেলে? আরে?

এবাড়ির মায়া কাটিয়ে আজ যেন যাচ্ছে সে।

বাইরে গাড়িতে এসে উঠলো। পরেশ ওকে দেখে চমকে ওঠে। সেই যৌবনোচ্ছল সদাহাস্যময়ী মেয়েটির চোখে আবছা জলধারা।

শঙ্করের সঙ্গে নীতাকে উঠতে দেখে একটু অবাক হয় পরেশ।

—তুমি কোথায় যাবে?

নীতা হাসবার চেষ্টা করে—স্যানাটোরিয়ামে। রোগটা রাজ রোগ কিনা!

চমকে ওঠে পরেশ। তার মুখে এক পোঁচ কালি কে বুলিয়ে দেয়। একটা কল্পনার চরম অপমৃত্যু। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার যে দিয়েছিল নীরব অনুপ্রেরণা—সেই কল্পনা আজ পিছন থেকে মুছে গেল নিঃশেষে, কোন অতি আপনজন আজ চলে গেল দূর বিদেশে, ফিরবে না আর কোনদিন।

পরেশ মুখ বুজে গাড়ি চালাচ্ছে। নীতা শঙ্কর চুপ করে বসে আছে, নীতা সার্সিটা তুলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

শঙ্কর বলে—হাওয়া আসছে, ঠাণ্ডা হাওয়া।

—খোলা থাকবে না?

—না? শঙ্কর ওর দিকের সার্সিটা বন্ধ করে দেয়। কোন কথাই বলে না নীতা, আজ বিনা প্রতিবাদে ওদের হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছে।

—বেশ ভালো লাগে নারে বড়দা, এমনি করে বেড়াতে?

খুশির আবেগে যেন উছলে পড়ছে নীতা। শঙ্কর চুপ করে বসে আছে, পরেশও। নীতা ওদের এই স্তব্ধতায় বিস্মিত হয়। নীতাই বলে ওঠে—বাঃ রে, তোর মুখে কি তালা-চাবি পড়ে গেল, এ্যাই পরেশ? কথাই বলছিস না যে? ও বড় দা—

অন্ধকার আর আলো ভরা রাস্তায় মসৃণ গতিতে ছুটে চলেছে গাড়িটা। সামনের পথের দিকে নজর রেখে পরেশ সাড়া দেয়—এমনিই!

হাসে নীতা—তোরা ভাবছিস এই বুঝি শেষ যাওয়া! মোটেই নয় রে! দেখবি সেরে উঠে ফিরে আসবো তখন চিনতেই পারবি না, টকটকে রঙ এইসা গোটা হবো, হাঁ করে চেয়ে থাকবি।

লোকজন, গাড়ির ভিড় ঠেলে গাড়ি এসে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছে। মালপত্র নামিয়ে নিয়ে চলছে শঙ্কর কুলি ডেকে।

নীতা নেমে দাঁড়াল, পরেশ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে চেয়ে থাকে নীতা; আজ সবকিছুই ভাল লাগে—পরেশকেও।

—চুপ করে আছো যে?

পরেশ যেন সবকিছু ভুলে যায়, লোকজন—কোলাহল। একটি শান্ত সবুজ পরিবেশের ছবি ভেসে ওঠে; অনেক দিনের চেনা-জানা ওই নীতাকে আজ নতুন করে দেখে পরেশ। পরেশ বলে—তুমি চলে যাচ্ছো?

হাসছে নীতা—আবার ফিরে আসবো পরেশ। আবার ভালো হয়ে আসবো।

তাই এসো। ফিরে এসো তুমি।

ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল নীতা।

পরেশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় পরেশের, কি যেন আপনজনাকে আজ হারিয়ে ফেলেছে সে। এত উদ্যম-পরিশ্রম যার জন্য সেই যেন হঠাৎ আনমনে তাকে ডাক দিয়ে দূরে চলে গেল।

এ-এক বিচিত্র অনুভূতি, সারা মনটা শূন্য উদাস হয়ে গেছে। এত প্রচেষ্টা যেন অর্থহীন হয়ে ওঠে।

—ট্যাক্সি! এই ট্যাক্সি!

কারা ডাকছে তাকে। অন্যসময় প্যাসেঞ্জার কোনদিনই ফেরায় নি পরেশ, একটু বিশ্রাম না নিয়েই গাড়ি চালিয়েছে। আজ! .... আজ যেন মন চায় না আর; ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত সে। জবাব দেয়,—যাবেনা এ গাড়ি!

—কেন?

বিরক্ত হয়ে ওঠে পরেশ। যেন নিজের মন বলতে কিছু নেই। একদণ্ডও তার কথা শোনবার অবকাশ মিলবে না। কড়া স্বরেই জবাব দেয়। এই প্রথম এড়িয়ে যায় পরেশ প্যাসেঞ্জারকে,—গাড়ি খারাপ! প্যাসেঞ্জার নেবো না।

চুপ করে গাড়িতে বসে থাকে। ওদের ট্রেন ছাড়ার শব্দ কানে আসে। নীতা চলে গেল। শূন্য গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পরেশ মহানগরীর পথে লক্ষ্য ভ্রষ্টের মত।

একজনকে ছেড়েও ঠিকমত চলছে মাধববাবুর সংসার। নীতার জন্য কাদম্বিনীর মনের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে গীতাই। বাড়িটার রূপ বদলাচ্ছে, দোতলা উঠেছে।

বাড়িতে উঠেছে কলরব কোলাহল, নতুন অতিথির আবির্ভাব ঘটেছে, মাধববাবুর নতুন বই বের হয়েছে, ভালোই চলছে বই। প্রকাশক তাগাদা দেয় নতুন বই-এর জন্য।

ছোট্ট বাচ্ছাটার কলরবে সব ভরে যায়, গীতা হাসে, মণ্টুও আপিস যাতায়াত করে কাঠের জুতো পরে। আবার অনেকটা সুস্থ কর্মক্ষম হয়ে উঠেছে সে।

বাড়ির কাজে বাধা দেয় শঙ্করই। বাইরের ঘরখানা ভেঙ্গে ঘর তোলবার আয়োজন করেছে কাদম্বিনী, টিনের বেড়ার ধারে সবুজ কুমড়োলতা আর কলাগাছের প্রহরা। ওই ঘরে প্রথমে থাকতো শঙ্কর—তারপর নীতাই থাকতো, কত স্মৃতি জড়ানো ওই ঘরটুকু, নীতার চিহ্ন আজও ওর সর্বাঙ্গে মাখানো। ওটা ভাঙ্গতে চায় না শঙ্কর। বাধা দেয় শঙ্কর—ও ফিরে এলে তবে ওটা ভেঙ্গো মা।

—সে কিরে? বিশ্রী লাগবে যে নতুন দোতলা বাড়ির পাশে।

—তোমার অতীতের পরিচয় একটা জায়গাতেও থাকুক মা।

কাদম্বিনী চুপ করে থাকে।

মাধববাবুও বলেন—তাই থাকুক বড়বৌ! নইলে নীতা এসে চিনতে পারবে কেন? আজকের চিঠিতেও লিখবো! ওর ঘর তেমনই আছে। ও ফিরে এলে ওর মনোমতো করে করবো।

শঙ্কর কথা বলে না—বাবার দিকে চাইল। বৃদ্ধ মাধববাবুর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে। বলে ওঠেন—তুই ওদিকে যাবি বলছিলি না?

শঙ্কর আসামে যাবে অনুষ্ঠান করতে, ইচ্ছে আছে গৌহাটি থেকে উঠে যাবে শিলং-এ, দেখে আসবে নীতাকে। মাধববাবুর কথায় সায় দেয়—ভাবছি যাবো।

—নতুন বইখানা নিয়ে যাবি, কত আশা ছিল ওর। আর ওই গীতার বাচ্চাটার ফটো একখানা। প্রতি চিঠিতেই লেখে সে।

শঙ্কর বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে! আবছা মেঘগুলো ক্লান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে, যেন এক বুনো হাতি নেমেছে বন থেকে, আনমনে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক, সাদা একটা পাতলা মেঘ ঢেকে ফেলে সব কিছু, পাইন বনে জাগে মত্ত হাওয়া, লম্বা লম্বা গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে, টিলার এখানে-ওখানে বাতি জ্বলে—আকাশের দিকে উঠে গেছে দু-একটা আলো।

কি যেন স্বপ্ন দেখছে সে' ....খালের ওপরে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের সবুজ পাতা বাতাসে দুলছে; ডাকছে দু'-একটা পাখি।

চমকে ওঠে নীতা! কি এক স্বপ্ন দেখছে সে! কোথায় ফেলে আসা উপনিবেশের সঙ্গীরা, স্কুলের বহু চেনা-অচেনা মুখ—আপিসের সেই দিনগুলো—সনৎ পরেশ কলকাতার কর্মব্যস্ত জীবন সবকিছু যেন মিশিয়ে আছে ওই সুরের পরতে পরতে।

সামনে চিঠি দুখানা খোলা পড়ে আছে। সনৎ লিখেছে—

—মরুতীর হতে সুধাশ্যামল কোন জীবনের স্বপ্ন।

দেখা করতে আসছে শঙ্কর।

বাবা লিখেছেন বাড়ির সংবাদ, দোতালা উঠেছে—গীতার ছেলেটা ভয়ানক দুষ্টু হয়েছে, যেন মাধববাবুর সবকাজ পণ্ড করার জন্যই দিন-রাত মতলব খোঁজে—নতুন বই নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত, মণ্টু সেরে উঠেছে, সবাই তারই পথ চেয়ে আছে কবে ফিরবে সে।

আবার ফিরে যাবে নীতা তাদের মধ্যে। কেমন মিষ্টি একটা সবুজ স্বপ্ন দেখে নীতা। সনতের চিঠিখানা তুলে ধরে, সারা মনে মুখে চোখে ফুটে ওঠে খুশির আভা—জীবনের ইসারা।

জানালার বাইরে পাহাড়ের ঢেউ একটার পর একটা স্তরে স্তরে উঠে গেছে আকাশের দিকে মাথা তুলে। জিরি জিরি পাইন বনে হাঁকে শোঁ-শোঁ হাওয়া।

সুরটা কেঁপে উঠছে। স্যানাটোরিয়ামে বসে শুনছে নীতা, শঙ্কর গাইছে গৌহাটি স্টেশন থেকে; খাসিয়া পাহাড়ের দূর ছায়াঘন বনে লেগেছে রাতের অন্ধকার, অতীতের কত স্মৃতি সৌরভ জড়ানো সুর। বাড়ির কথা মনে পড়ে, মনে হয় শঙ্কর তার সামনেই বসে রয়েছে, জানালার ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে একফালি আলো; কলাগাছের পাতাগুলো বাতাসে দোল খায়। সেই পরিবেশে ওর সুর উঠেছে। আজকের শঙ্করের সুরে মিশে যাচ্ছে অতীতের সেই দিনগুলো।

কিন্তু সে বহুদূরের ঠিকানা। সামনে বাবার চিঠিখানা বহু দূরের স্বপ্ন বয়ে আনে। নীতা হাতে নিয়ে অনুভব করে তারই নিজের হাতে লাগানো গন্ধরাজ ফুলের সৌরভ স্পর্শ।

কে জানে গাছটা কতবড় হয়ে উঠেছে—কত ফুল ফুটেছে।

কেমন যেন ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় আবার সেই জীবনে। সেও বাঁচবে, সনতের চোখে—এক নজরে পরেশের চোখে দেখছে জীবনের সঙ্কেত। তারই অনুণন এই শঙ্করের অসীম-স্পর্শী সুরের মায়ায়।

নার্স টেম্পারেচার নিতে এসেছে, মাথার সামনে টেম্পরেচার চার্টটার দিকে চেয়ে থাকে, লাল গ্রাফটা ওঠা নামা করেছে একটা বিচিত্র ভঙ্গীতে।

—কবে এখান থেকে যেতে হবে নার্স?

—সেরে উঠেছেন তো, কিছুদিন পরই ফিরে যাবেন।

—ফিরে যাবো?

নীতা স্বপ্ন দেখছে, সুরটা তখনও নীরব আকাশে জেগে রয়েছে! ঠুংরির করুণ মূর্চ্ছনা—পিয়া সনে মিলন কি আশ সখিরে!

সুরটা মনের সব কাঠিন্যকে দূর করে দিয়েছে। গৌহাটি থেকে প্রোগ্রাম শেষ করে কালই এসে পড়বে শঙ্কর।

বলে ওঠে নীতা—কালই দাদা আসছে নার্স, ওর সঙ্গে এই বারেই যেতে পারবো না? ব্যাকুল কণ্ঠে যেন আবেদন জানায় নীতা।

নার্স আশ্বাস দেয়—সেরে উঠলে আর কেউ এখানে থাকে না।

রাত্রি কাটে প্রহর গুণে, ঘড়িটা চলেছে যেন ধীর একতালে। কাল সকালে আসছে শঙ্কর, বাড়ির খবর নিয়ে আসবে, কত কথা যেন জমে আছে নীতার মনে। এখানের অনেক খবর।

ঘড়ির দিকে চেয়ে থাকে, ওর মনের চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র স্পর্শ ওতে লাগে নি। ভোরের আলো জেগে ওঠে পাহাড়ের মাথায়, পাইন বনের ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে এক ঝলক আলো।

দরজার পাশ দিয়ে জুতোর শব্দ শুনে ডাক দেয়—নার্স!

নার্স এগিয়ে আসে—এত ঠাণ্ডায় উঠবেন না।

—সকালের গাড়ি আসতে দেরী কতো?

—সবে তো ভোর হয়েছে, অনেক দেরী।

একটু যেন হতাশ হয়েছে নীতা।

—অনেক দেরী, না?

নার্স কম্বলটা ভালকরে মুড়ে দেয় পায়ের দিকে; নীতা ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের পানে, মনের ভিতর কি যেন চাঞ্চল্য জেগেছে। আজ মনে হয় আকাশে বাতাসে কিসের সুর—বাড়ির কথা মনে পড়ে, ...ব্যাকুল হয়ে সে পথ চেয়ে আছে শঙ্করের।

কর্মব্যস্ত শিলং শহরের বুকে সবে জাগরণ শুরু হয়েছে। ইয়ার্ডলি লেকের জলের ধারে দু-চারজন ভ্রমণকারী পায়চারী করছে—সবুজ পাহাড়ের মাথায় দেখা যায় আলোর প্রথম রেখা, শঙ্কর এগিয়ে চলেছে স্যানাটোরিয়ামের দিকে। যেতে দেরী হচ্ছে, চড়াই এর পথ, একটা ট্যাক্সিকে ধরে উঠে পড়ে।

কতদিনের দেখা, শঙ্কর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নীতার দিকে!

—কি দেখছিস বড়দা?

স্যানাটোরিয়ামের সামনে একটা পাইন গাছের দিকে এগিয়ে যায় তারা; ডালিয়াফুলের ঝাড়গুলো এখানে বারোমাসই রঙের মেলা বসায়, জেগে থাকে ওদের বুকে হাজারো ফুলের হাসি। পাইনবনে উঠেছে শনশন হাওয়া; রৌদ্রস্নাত নীল আকাশ আর ছায়াঘন পাহাড়ে শুরু হয়েছে মেঘের আনাগোনা, বাতাসে ভেসে ওঠে ঝর্ণার সুর, শঙ্কর নীতার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—অনেক সেরে উঠেছিস নীতা। ডাঃ সেনও বললেন আর দু-একমাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবি।

নীতা গাছের নীচে ঘাসের ধারে বসেছে শঙ্করের বর্ষাতির উপর। মুখে ওর হাসির আভা। বলে ওঠে নীতা—সত্যি বড়দা আর থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে, কবে বাড়ি ফিরে যাবো।

হঠাৎ যেন ফেলে আসা জগতে মন ছুটে আবার ফিরে যায়; একসঙ্গে একগাদা প্রশ্ন করে বসে নীতা।

—হ্যারে, গীতার সেই বাঁদরটা কেমন হয়েছে রে? কার মতন দেখতে? খুব দুরন্ত বুঝি! দেখবি বাবার কাজকম্মো সব মাটি করে দেবে ওটা। হ্যারে, বই কি হোল বাবার? দেখবি বড়দা—বাবার পরের বইখানাও ভাল চলবে! আমার স্পেকিউলেশন—যাতে হাত দেব তাকে ঠিক গড়ে তুলবোই। আর বাড়িটা?

শঙ্কর ওর কথাগুলো শুনছে একমনে।

নীতা পথের ধার থেকে একটা ডালিয়া ফুল তুলে নিয়েছে, ছিঁড়ে ফেলেছে তার মলিন বিবর্ণ দলগুলো।

শঙ্কর জবাব দেয়—বাড়িটা দোতলা উঠেছে কেবল তোর বাইরের ঘরটা আমিই তুলতে দিই নি।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে নীতা—কেন রে?

শঙ্কর জবাব দেব—তোর ঘর, তুই গেলে দেখে শুনে তোর মনের মত তোলা হবে।

নীতা বলে ওঠে—সত্যি! এখানের ঘরগুলো কি সুন্দর, ছোট্ট ঘর হবে পুবদিকে থাকবে কাঠের জানালা, প্রথম রোদের আলো পড়বে ঘরের মেঝেতে—

হঠাৎ থেমে যায় নীতার কণ্ঠস্বর।

শঙ্কর চমকে ওঠে। ওর দিকে চেয়ে থাকে। একি! বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।

নীতা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে; কোথায় দূর বনে যেন ঝড় উঠেছে, এগিয়ে আসছে বহু চেনা সেই শব্দটা। ঘূর্ণিপাকে যেন তাকে তুলে নিয়ে কোন অসীম শূন্যে উধাও করে দিতে চায়। এতদিন ধরে এড়িয়ে গেছে সেই দুর্বার আহ্বান, ব্যর্থ হয়ে গেছে তার অন্বেষণ; আজ এগিয়ে আসছে অতীতের হারানো সেই শব্দটা, বিপুল আলিঙ্গনে তাকে যেন পিষে ফেলতে চায়, সামনে এসে পড়েছে সেই প্রবল আলোড়নের বেগ! থরথর করে কাঁপছে পাহাড় বনানী।

দম বন্ধ হয়ে আসে—উঠে চলেছে সে, মাঠ সবুজ মাটি—রোদের আলোর অনেক উর্ধ্বে। তারই ভাললাগা পৃথিবী ও ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে যেন জোর করে তুলে নিয়ে যায় তাকে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নীতা—বড়দা। হাঁপাচ্ছে প্রাণপণে সে, প্রতিরোধ করতে চায় ওই দুর্বার ঝড়ের বেগকে।

—না, না। কিন্তু ক্ষীণ সেই প্রতিবাদ। দূরে—বহু দূরে পাহাড় সীমা পার হয়ে দূর ক্রন্দসীর অসীমে উধাও হয়ে যায় সে। সূর্যের রশ্মিরেখার পথ বেয়ে চলেছে নীতা। হালকা হয়ে আসে, স্তব্ধ হয়ে আসে সব কলবর। চোখের পাতায় নামে তন্দ্রা।

শঙ্কর চীৎকার করে ওঠে—নীতা! নীতা!

দূর থেকে একবার যেন চোখ মেলে কোন অপরিচিতের দিকে চাইবার চেষ্টা করে নীতা।

শঙ্কর ছুটে যায় হাসপাতালের দিকে—ডক্টর! নার্স! নার্স!

হু-হু বইছে পাইনের হাওয়া—ঝরনার সুরে মিশে গেছে! পর্বত রাজ্যের কোন শান্তি ভঙ্গ হয়নি! বাতাসে ঝরে পাইন পাতা! ঝড়ো হাওয়ার ঘূর্ণীতে কাঁপতে কাঁপতে পড়ছে পাতাগুলো ঝরনার জলে—একটা—একটার পর একটা।

যেন মহাজীবনের স্রোতে পড়েছে এসে ক্ষুদ্র জীবনের একটি ধারা, সাগ্রহে তাকে বুকে বরণ করে নিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতধারা; উত্তাল ছন্দে দূর অসীমের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কর। সব শেষ হয়ে গেল।

একটি জীবনের ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়া—কলরব, বেঁচে থাকার জন্য আশার-আলোর সংগ্রাম, সব অতল স্তব্ধতায় ডুবে গেল।

পাহাড় ছেয়ে আসে অতর্কিত মেঘে, দিনের খেয়ালী আলো কোন অতলে হারিয়ে গেছে, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নামে পাহাড়ের বুকে—সাদা হালকা জলকণার ঘন যবনিকার আড়ালে পাইন গাছের গুড়িগুলো কালের প্রহরীর মত জেগে থাকে।

শন শন শব্দে নামে বৃষ্টিধারা। একটি সত্তার নিঃশেষ অবলুপ্তি ঘটে অসীম পাহাড়ঘেরা মেঘলোকে।

বৃষ্টি নেমেছে। অঝোর বৃষ্টি।

কয়েকমাস কেটে গেছে। সহজ স্বাভাবিক গতিতেই চলেছে কলোনীর জীবনযাত্রা, মাধববাবুর দোতলা বাড়ি উঠেছে। নীতার ঘরখানার চিহ্নমাত্রও নেই। সেখানে জন্মেছে ঘন সবুজ গাছগাছালি, পাখি ডাকে পত্রাবরণ থেকে। সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আবার এ বাড়ির দিনগুলো। মাধববাবু আবার কাজে মন দিয়েছেন, কিন্তু বাধা তার গীতার ছেলেটা। চশমা কলম থাকে না ঠিক জায়গায়। হাঁকডাক শুরু করেন তিনি।

বাড়িতে হৈ চৈ, লোকজনের সমাগম। গীতার ছেলের অন্নপ্রাশন। শঙ্কর এত করেও এ বাড়িতে থাকতে পারে না। এই পরিবেশ তার বিষিয়ে উঠেছে। মন কেমন করে এখানে এলেই।

কাদম্বিনী দুঃখ করেন—তুই ঘরবাসী হবি না শঙ্কর?

হাসে শঙ্কর—বেশ তো আছি! যাযাবর জীবন, আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই, সময় পাই কই বলো।

আনন্দে কোলাহলে বাড়ি ভরে উঠেছে। গীতা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আসে—যাক, এসেছো তাহলে! মামা যাহোক একখানা!

আজকের এই পূর্ণতার দিনে শঙ্করের একজনকে মনে পড়ে, সে নীতা।

শঙ্করকে চলে যেতে দেখে বাধা দেয়—একি! চলে যাচ্ছো যে?

—একটু কাজ আছে। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে গেল শঙ্কর!

একজনকে নিঃশেষে ভুলে গেছে এরা। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। পায়ে পায়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসে শঙ্কর। কলোনির রাস্তায় দু-একজন লোক চলেছে।

একজনকে মনে পড়ে—সে নীতা। কালো ডাগর চোখ, জীর্ণ মলিন রঙ, আধ ময়লা শাড়ি পরে একটি মেয়ে দুবেলা যাতায়াত করতো কলোনির পথ দিয়ে আপিস আর টুইশানিতে।

আনমনে পথ চলেছে, হঠাৎ দূরে কাকে দেখে চমকে ওঠে—হ্যাঁ ঠিকই! তেমনি কে যেন চলেছে। নীতার মতই দেহ-মনে ওর কি এক হতাশ বেদনা। মলিন বিবর্ণ চাহনি রোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

এগিয়ে যায় শঙ্কর, না—নীতা নয়।

তবে ওদের শ্রেণীরই ও অন্যজন। পথে ঘাটে আপিসে স্কুলে ওদের দেখা মেলে।

জীবনে ওরা স্নেহ প্রেম প্রীতি কিছুই পায় নি—সবাই ঠকিয়েছে ওদের এতটুকু ভালবাসা থেকেও পৃথিবী ওদের বঞ্চিত করেছে। বুকভরা প্রেম ব্যর্থ জ্বালায় জ্বালিয়ে খাঁক করে দেয় ওদের।

নীরবে এগিয়ে চলল শঙ্কর স্টেশনের দিকে।

স্ট্রাপছেঁড়া স্যাণ্ডেলটা টানতে টানতে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে। ট্রেনের ঘণ্টা হয়ে গেছে তার। এ ট্রেন ফেল করলে আপিসে লেট হয়ে যাবে।

নীতার কথা মনে হয় শঙ্করের। সেও ব্যর্থ হয়ে কেঁদে ফিরে গেছে শূন্য হাতে।

———